যোগ্য আলেমা ও যোগ্য নারী হওয়ার সহজ উপায়

আল্লামা আশরাফ আলী থানভী রহ.
মুফতী মুহাম্মদ তকী উসমানী দা.বা

মুফতী মুহাম্মাদ মুয্‌যাম্মিল হক

কুরআন-হাদীস ও গবেষণার আলোকে রচিত, মহিলা মাদরাসার পাঠ্যযোগ্য গ্রন্থ

যোগ্য আলেমা ও যোগ্য নারী
হওয়ার সহজ উপায়

আল্লামা আশরাফ আলী থানভী রহ.
মুফতী মুহাম্মাদ তকী উসমানী দা.বা.

অনুবাদ ও সংযোজন
মুফতী মুহাম্মাদ মুয্‌যাম্মিল হক
বহু গ্রন্থের লেখক, অনুবাদক ও শিক্ষক

প্রকাশনায়
আল-মুয্‌যাম্মিল লাইব্রেরী
(লাইব্রেরী ও প্রকাশনার জগতে অনন্য ও ব্যতিক্রম)
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।
01813- 17 27 68, 01788-32 35 92

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

গ্রন্থের নাম	ঃ	যোগ্য আলেমা ও যোগ্য নারী হওয়ার সহজ উপায়
অনুবাদ ও সংযোজন	ঃ	মুফতী মুহাম্মাদ মুয্যাম্মিল হক
প্রকাশনায়	ঃ	আল-মুয্যাম্মিল লাইব্রেরী ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।
গ্রন্থস্বত্ত্ব	ঃ	প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত।
অঙ্গসজ্জা ও ডিজাইন	ঃ	আল মুয্যাম্মিল ডিজাইন সেন্টার, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা। ০১৮১৩- ১৭২৭৬৮, ০১৭৮৮-৩২৩ ৫৯২
মূল্য	ঃ	২৮০/= টাকা মাত্র

যা পড়া প্রয়োজন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ اَجْمَعِيْنَ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি মানব জাতিকে অগণিত নেয়ামত দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবীজী, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবায়েকেরামদের উপর।

যে শিক্ষা মানুষকে প্রকৃত মানুষ হতে শেখায় ঐ শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। আর ঐ মেরুদণ্ড ব্যতিত কোনো মানুষ বা প্রাণি কখনো উন্নতির শেখরে যেতে পারে না। তাই রাসূল সা.-এর উপর প্রথম ওহী ছিলো "পড়ো"। হাদীসে এসেছে- "প্রত্যেক নারী-পুরুষের উপর দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা আবশ্যক।" এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, পুরুষের উপর যেমন দ্বীনী ইলম শিক্ষা ফরয, তেমনিভাবে নারীদের জন্যও দ্বীনী ইলেম শিক্ষা করা একান্ত জরুরী তথা আবশ্যক।

হযরত উরওয়া বিন যোবায়ের বলেন, ফারায়েজের ইলম, হালাল-হারামের মাসায়েল এবং কুরআনের ইলমের ক্ষেত্রে হযরত আয়েশা রা.-এর চেয়ে বড় আলেম আমি দেখিনি। হযরত উরওয়া আরও বলেন, কবিতা, সাহিত্য, চিকিৎসা এবং ইতিহাস সম্পর্কে আয়েশার রা.-এর চেয়ে বড় জ্ঞানী আমি দেখিনি। সাহাবীরা যখনই কোনো মাসআলার ব্যাপারে সমস্যায় পড়তেন তখনই তারা পর্দার আড়াল থেকে হযরত আয়েশা রা.-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করতেন এবং সঠিক সমাধান পেতেন। এর দ্বারা বোঝা গেল, পর্দার সঙ্গে মহিলাদের জন্য শিক্ষকতা করা বা মহিলাদের কাছে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করার ব্যাপারে ইসলামের কোনো বাধা নেই। আর পর্দার বিধান নারীকে আবদ্ধ করার জন্য নয়, নারীকে শিক্ষা বিমুখ রাখার জন্যও নয় বরং নারীর সম্ভ্রম রক্ষা ও নিরাপত্তার জন্যই আল্লাহ পর্দার বিধান করেছেন।

উক্ত গ্রন্থটিতে **যোগ্য আলেমা হওয়ার সহজ উপায়, যোগ্য নারী হওয়ার সহজ উপায়, যোগ্য হাফেযা ও হাফেয হওয়ার সহজ উপায়** এই তিনটি অংশ আছে। আল্লামা আশরাফ আলী থানভী রহ., মুফতী তাকী উসমানী দা.বা ও বিশ্বের বিভিন্ন আলেমদের গ্রন্থ ও বয়ান থেকে অনুবাদ করা হয়েছে।

বইটি নির্ভূল করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। তবে তা কতটুকু সহজ ও ফলপ্রসূ পাঠক বা পাঠিকা একান্তভাবে অধ্যয়ন করলে বুঝা যাবে। সুতরাং যাদের উদ্দেশ্যে এ গ্রন্থটি লেখা হলো তাদের চাহিদা পূর্ণ হোক, সর্ব শেষে আল্লাহ তা'আলার নিকট এই কামনা করছি।

বিনীত,

মুহাম্মাদ মুয্যাম্মিল হক

আমাদের প্রকাশিত বহু গ্রন্থ থেকে মাত্র কয়েকটি গ্রন্থের নাম

- ❖ যোগ্য আলেম হওয়ার সহজ উপায়
- ❖ পাঁচ ভাষার অভিধান
- ❖ My Spoken English & Grammar
- ❖ জবান ও রাগ নিয়ন্ত্রণের উপায়
- ❖ যোগ্য আলেমা ও যোগ্য নারী হওয়ার সহজ উপায়
- ❖ এসো সহজে আরবী ও ইংরেজী শিখি (তিন ভাষায়)
- ❖ নারী ও পুরুষের পর্দা
- ❖ তাবলীগের ছয় নম্বর (পাঁচ ভাষায়) ও চব্বিশ ঘন্টার আমল
- ❖ এসো সহজে তিন ভাষার ব্যাকরণ শিখি

প্রকাশের পথে কয়েকটি গ্রন্থ

- ❖ গুনাহ্ করার ক্ষতি
- ❖ গুনাহ্ মাফের উপায়
- ❖ ইসলাম ও আধুনিক মুসলিম নারী
- ❖ নারীদের সুন্দর জীবন
- ❖ হুরের বয়ান
- ❖ নামায শিক্ষা
- ❖ টাকা উপার্জনের উপায়
- ❖ আমলে কুরআনী
- ❖ মহিলাদের মুক্তি পথ
- ❖ এসো সহজে বক্তৃতা শিখি
- ❖ কবরের আযাব
- ❖ প্রিয় নবীর প্রিয় সুন্নত
- ❖ জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা
- ❖ ইলেম অনুযায়ী আমল হয় না কেন?
- ❖ গীবতের ভয়াবহ পরিণতি
- ❖ আদব ও শিষ্টাচার
- ❖ বেনামাযীর ভয়াবহ পরিণতি
- ❖ কেন এই জীবন। এছাড়া আরো অনেক.... ইনশাআল্লাহ!

সূচিপত্র

যোগ্য আলেমা হওয়ার সহজ উপায়

যোগ্য আলেমা গঠনে মহিলা মাদরাসার প্রয়োজনীয়তা	৯
ইসলামের দৃষ্টিতে মাদরাসা শিক্ষার গুরুত্ব ও লাভ	১০
কওমী মাদ্‌রাসার প্রয়োজনীয়তা	১৩
কওমী মাদ্‌রাসার অবদান	১৩
উপমহাদেশে মাদরাসা শিক্ষার সূচনা ও বিকাশ	১৪
প্রথম মাদরাসার ইতিহাস	১৫
দ্বীনী শিক্ষার রূহ হলো ইখলাস	১৬
আধুনিক ও মানসম্মত মহিলা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা	১৮
মহিলা মাদরাসা নিয়ে কিছু কথা	১৮
কওমী মহিলা মাদরাসার সিলেবাস (বেফাক)	১৯
মাদরাসার ছাত্রীরা কী পড়েন?	২১
রাসূল সা. এর শিক্ষাদান পদ্ধতি	২২
ইলম অর্জনের সঠিক পদ্ধতি	২৩
রাসূল সা.এর শিক্ষা ও শিক্ষকতার আমল	২৬
শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তিনি পিতার ন্যায় স্নেহশীল ও দয়াশীল হতেন	২৭
শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য অর্জনের প্রতি একাগ্রতা	২৭
সাধনা ও একাগ্রতার সুফল	২৮
রাসূল সা. শিক্ষার্থীদের বুদ্ধি ও মেধা অনুযায়ী শিক্ষা দিতেন	২৮
প্রশ্নের উত্তর যেভাবে লিখবেন	২৯
শিক্ষার্থীদের মেধাশক্তি খোলার জন্য বিভিন্ন প্রশ্ন করা	২৯
প্রশ্নের উত্তর শিক্ষার্থীদের ওপর ছেড়ে দিয়ে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা	৩০
জিজ্ঞেস করতে শৈথিল্য ও অবহেলা করা	৩০
দ্বীন ইসলাম শিক্ষায় জিজ্ঞাসার গুরুত্ব	৩১
জিজ্ঞেস করতে লজ্জা যেন বাঁধা না হয়	৩৩
কাকে জিজ্ঞেস করবে?	৩৪
শিক্ষার্থী ও আলেমগণ জিজ্ঞাসা করা থেকে অমুখাপেক্ষী নয়	৩৫
ভালো শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করা	৩৬
মাদরাসার শিক্ষার্থীদের প্রতি জরুরি উপদেশ	৩৬
শিক্ষার্থীদের প্রতি শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামার নসীহত	৩৯
শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনটি পরামর্শ	৪০

জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করাও নেক আমল	৪১
পরিবারের সবাইকে দ্বীন শিক্ষা দেয়া জরুরী	৪৩
একজন আল্লাহওয়ালা আলেম বা আলেমার প্রতিকৃতি	৪৬
মুফতী ফয়যুল্লাহ রহ.-এর মেয়ে ইলম পিপাসু	৪৭
শিক্ষার্থীদের জীবনের গুরুত্ব	৫১
শিক্ষার্থীদের জীবনের সূচনা	৫২
বর্তমান সময়ের শিক্ষার্থীরা	৫২
স্কুল ও কলেজের শিক্ষা	৫২
সার্টিফিকেট বনাম জ্ঞান ও যোগ্যতা	৫৩
সময় ও জীবনের মূল্য	৫৪
সময় কাজে লাগানোর উপায়	৫৫
আরবী শেখার সহজ উপায়	৫৬
যে কোনো ভাষা সাহিত্য চর্চার জন্য যা একান্ত প্রয়োজন	৫৮
ইংরেজি শেখার সহজ উপায়	৫৯
গণিত শেখার সহজ উপায়	৬০
ইলমের সাথে ইলমের আদব শিক্ষা করা জরুরী	৬১
শ্রেণি কক্ষে শিক্ষক-শিক্ষিকাকে প্রশ্ন করার নিয়ম	৬১
পড়া ভুলে যাওয়ার কারণ ও তার প্রতিকার	৬৪
হাতের লেখা সুন্দর করার সহজ কৌশল	৬৭
নিজের পড়া নিজে যেভাবে হিসাব রাখবেন	৬৭
কম পড়লে বেশি সময় মনে রাখার উপায়	৬৮
পড়া-লেখার প্রতি যেভাবে মনোযোগী হবেন	৬৮
পরীক্ষায় তাড়াতাড়ি লেখার সহজ উপায়	৬৮
ছাত্রীদের মোবাইল ব্যবহারের নিয়ম	৬৯
যেভাবে ক্লাসের প্রস্তুতি নিবেন	৬৯
সর্ব উত্তম শিক্ষা ও আসল গোল্ডেন প্লাস পাওয়ার উপায়	৬৯
লেখা-পড়ায় মন বসানোর পদ্ধতি	৭০
লেখা-পড়া করার সহজ পদ্ধতি	৭০
শিক্ষার্থী নিজের সাথে সর্বদা যা রাখা উচিত	৭২
পড়া ভুলে যাওয়ার কারণ	৭২
দৈনিক পড়া-লেখা করার তালিকা	৭৩
প্রতি সপ্তাহের পড়ার হিসাব	৭৪

পরীক্ষার পূর্বে লেখা-পড়া করার নিয়ম	৭৪
ছাত্রীদের প্রতিদিনের সময়সূচি	৭৫
স্মরণশক্তি বৃদ্ধির সহজ আ'মল	৭৫
পড়া মনে রাখার বৈজ্ঞানিক উপায়	৭৫
মুফতী ফয়েজুল্লাহ রহ.-এর নারীর জন্য কিছু উপদেশ	৭৬
আল্লামা আলী আহমদ বোয়ালভী রহ. এর অমূল্য নসিহত	৭৬
শীর্ষ কয়েকটি কওমী মহিলা মাদরাসার নাম	৭৮

যোগ্য নারী হওয়ার সহজ উপায়

কুরআন ও হাদীসের আলোকে যোগ্য নারী	৮১
যোগ্য নারীর ভূষণ হলো আদব ও শিষ্টাচার	৮৫
ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ আদব হলো সালাম দেয়া	৮৫
নারীর দ্বীনদারী হলো আত্মসচেতন হওয়া	৮৫
নেককার হওয়া স্ত্রী দ্বীনদারীর অর্ধেক নেয়ামত	৮৮
দাম্পত্য জীবনে পরস্পরের কল্যাণভাবনা	৮৯
লজ্জাশীলতা পূর্ণ ঈমানের জন্য জরুরী	৯১
মেয়ের প্রতি মায়ের দশটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ	৯৬
পিতা-মাতা সন্তানের কল্যাণকামনা করা	৯৮
মুসলিম নারী ও বিজ্ঞান	৯৯
মুসলিম নারীর প্রতিভা যুগে যুগে	১০০
জ্ঞানচর্চায় মুসলমান নারীদের অবদান-১ ও ২	১০৩
দ্বীন প্রতিষ্ঠায় মুসলমান নারীর অবদান	১১১
ইসলামী দর্শনে নারী শিক্ষার গুরুত্ব	১১৩
নারী শিক্ষায় ইসলামের নির্দেশনা	১১৭
নারীর যে পরিমাণ ইলেম শিখা জরুরী	১২০
নারীদের জন্যে পৃথকভাবে ইলেম শেখার ব্যবস্থা করা	১২১
প্রচলিত সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী শিক্ষাকে গুরুত্ব দেয়া	১২২
হক্কানি ওলামায়ে কিরামদের ওয়াজ শোনা	১২২
আমলী আলেমদের ইসলামী বিভিন্ন বই পড়া	১২৩
দ্বীনদার আলেম পাত্র-পাত্রীর সাথে ছেলে-মেয়ের বিবাহ দেয়া	১২৩
মুসলমান নারীদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কীর্তি ও অবদান	১২৩
যুদ্ধ-সংগ্রামে নারী সাহাবীগণের আমল	১২৫

ইসলামের দৃষ্টিতে নারীদের উপার্জন	১২৬
যোগ্য নারীর শিক্ষা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়েও হয়	১২৭
যবানের হেফাযত দ্বারা বেহেশত পাওয়া যায়	১৩০
মায়ের শিক্ষা সন্তানের জন্য সারা জীবনের পাথেয়	১৩৩
বিয়ে অর্ধেক দ্বীন	১৩৫
মহিলাগণ কোন ধরনের পুরুষের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারবে	১৩৬
দ্বীনদার স্বামী-স্ত্রী	১৩৯
যেমন হবে বিবাহ ও দাম্পত্য জীবন	১৩৯
প্রাধান্য দ্বীনদারীকেই দিতে হবে	১৪০
পুরুষ নারীর রূপ ও সৌন্দর্যে আকৃষ্ট না হওয়া	১৪১
নারী-পুরুষ পরস্পরে আখেরাতের সহযোগী হবে	১৪১
নবীজীর প্রতি নারী সাহাবীদের ভালোবাসা	১৪৩
নারীরা যেভাবে আল্লাহ ওয়ালা হবেন	১৪৪

যোগ্য হাফেযা ও হাফেয হওয়ার সহজ উপায়

হেফযখানা বিশেষ পরিভাষাসমূহ	১৪৬
হেফজখানার প্রতিদিন যা যা করা প্রয়োজন	১৪৭
হেফজখানার প্রতি সপ্তাহে যা যা করা প্রয়োজন	১৪৭
হেফজখানার প্রতি মাসে যা যা করা প্রয়োজন	১৪৭
শিক্ষার্থীরা যেভাবে হেফজ শুরু করবে	১৪৮
যেকোনো মুসলিম সহজে কুরআন মুখস্থ করতে পারবে	১৪৮
পূর্বের পড়া যেভাবে মনে রাখবেন	১৪৯
কুরআনুল কারিম শিক্ষাদানকারীর আদব	১৪৯
মহিলা বা পুরুষ অল্প বা বেশি সময়ে হেফজ করার উপায়	১৫৪
যেভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা সহজে হাফেজ বা হাফেজা হবেন	১৫৫
মহিলা ও পুরুষ হেফজখানার শিক্ষাথীদের শাস্তির বিধান	১৫৬
শাস্তির বিধান সম্পর্কে সৌদি আরবের ফতোয়া বোর্ডের ফতোয়া	১৫৭
শিক্ষার্থীকে প্রহার করার কয়েকটি শর্ত	১৫৭
হাফেজ ক্বারী আব্দুল হক-এর শিক্ষক বা শিক্ষিকাদের জন্য কয়েকটি উপদেশ	১৫৮
হাফেজ ক্বারী আব্দুল হক-এর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কয়েকটি উপদেশ	১৫৯

যোগ্য আলেমা গঠনে মহিলা মাদরাসার প্রয়োজনীয়তা

প্রবাদ আছে, তোমরা আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদের একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দেবো।

একসময় নারীরা ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার জন্য স্বীকৃত তেমন কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না। নিজের ঘর কিংবা এলাকার মক্তবই ছিল তাদের প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষার উপযুক্ত স্থান। সেই সময়কার নারীরা ধর্মীয় শিক্ষায় যতটা না অগ্রগামী ছিল, তারচেয়ে বেশি পিছিয়ে ছিল জাগতিক শিক্ষার্জন থেকে। জাগতিক শিক্ষার্জন অনেকে ঘৃণার চোখে দেখতো। কারণ, তখনকার মুসলিম নারীরা বেশি শিক্ষিত না হলেও ধর্মভীরু ছিলো। ধর্ম সম্পর্কে মা-দাদী থেকে যতটুকু জেনেছে তা পরিপূর্ণভাবে আমল করেছে। তারা শিক্ষার্জনে স্কুল-কলেজে যাওয়াকে ভিন্ন চোখে দেখতো। নিজের ঘরই ছিল তাদের জন্য নিরাপদ এবং উপযুক্ত স্থান। তাই তখন প্রয়োজন পড়েনি তাদের জন্য আলাদা শিক্ষাঙ্গনের। জাগতিক শিক্ষাকে তারা গুরুত্বই দিতো না। তবে সময়ের বিবর্তনে বদলে গেছে দৃশ্যপট। এখন আধুনিক যুগ। শিক্ষার বিকল্প নেই। শ্লোগান উঠেছে শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। সকলের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক। এখন মানুষ নানামুখী শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে। বসে নেই নারীরাও। পুরুষের সাথে পাল্লা দিয়ে তারাও এগিয়ে যাচ্ছে জ্ঞান অন্বেষণের অনন্য এক উচ্চতায়। তবে সমস্যাটা হচ্ছে ধর্মীয় শিক্ষা নিয়ে। জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে এখন গ্রাম পাড়ি দিয়ে শহরে যেতে হয় না। প্রায় প্রতিটি এলাকা, গ্রাম, মহল্লায় গড়ে উঠেছে জাগতিক শিক্ষার নানামুখী সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। তবে মুসলিম দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না তেমন ধর্মীয় মহিলা শিক্ষালয়। ফলে মুসলিম পরিবারের নারীরাও বাধ্য হয়ে যেতে হচ্ছে জাগতিক শিক্ষা কেন্দ্রগুলোতে। যেখানে নেই প্রকৃত ধর্মীয় শিক্ষা। নেই জীবন-যৌবনের নিরাপত্তা। যেখানে নারীরা পাচ্ছে না প্রকৃত নৈতিক দ্বীনী শিক্ষা। আছে সর্বদা বিপদের আশঙ্কা। সবকিছু বিবেচনা করে যুগের চাহিদা পূরণের জন্য আজ থেকে বিশ বা পঁচিশ বছর পূর্বে বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয় মহিলা মাদরাসা।

মহিলা মাদরাসা প্রতিষ্ঠার শুরুলগ্নে অনেক প্রসিদ্ধ আলেম মহিলা মাদরাসার বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। তাঁদের বিরোধিতার উল্লেখযোগ্য কিছু কারণও ছিল। কিন্তু ধীরে-ধীরে সেই বিরোধিতা কেটে মহিলা মাদরাসার দিকেই ঝুঁকে পড়ে আলেমসমাজ থেকে শুরু করে সাধারণ মুসলমানরাও। কারণ, তারা স্পষ্ট লক্ষ্য করছে যে, স্কুল-কলেজ মহিলাদের জন্য কিছুতেই নিরাপদ নয়। বিশেষ করে তারা জাগতিক শিক্ষা কেন্দ্রে ধর্মীয় শিক্ষার যথেষ্ট অভাব লক্ষ্য করছে। ফলে মহিলা মাদরাসার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা দিনদিন বেড়েই চলেছে। নারীদের দ্বীন শেখাতে মহিলা মাদরাসার অবদান বর্তমান সময়ে অনস্বীকার্য। প্রকৃত দ্বীন

ইসলাম ঘরে-ঘরে পৌঁছে দিতে মহিলা মাদরাসা নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। ইসলাম বিদ্বেষী অপশক্তি ইসলামকে চিরতরে মুছে দিতে জাগতিক শিক্ষার মাধ্যমে যে পায়তারা চালাচ্ছে তা আজ অনেকটা বাধাগ্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে মহিলা মাদরাসা সঠিক পথে এগিয়ে যাওয়ার কারণে। মহিলা মাদরাসায় যেমন সঠিক দ্বীন শিক্ষা দেয়া হয়, তেমন যুগের চাহিদার প্রয়োজনে বাংলা, অংক, ইংরেজি, সমাজ বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়েও গুরুত্ব সহকারে পাঠদান করা হয়। ক্বওমী মহিলা মাদরাসার শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার মানও মাশা-আল্লাহ স্কুল-কলেজের চেয়ে অনেক এগিয়ে।

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম মহিলা কওমী মাদরাসার প্রবর্তক আল্লামা শায়খ আবদুল মালেক হালীম দা.বা। যেটি "হাইলধর মহিলা মাদরাসা" নামে প্রসিদ্ধ। মাওলানা আব্দুল মালিক হালীম দা.বা. "ঈমানদার নারী গঠনে মহিলা মাদরাসা অপরিহার্য" নামক একটি মূল্যবান যুক্তিপূর্ণ পুস্তিকাও রচনা করেন।

উত্তর চট্টলার প্রসিদ্ধ মহিলা দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান **"আল হুদা মহিলা মাদরাসাও"** সুনাম খ্যাতির সাথে এগিয়ে যাচ্ছে।

বেহায়াপনায় লিপ্ত হওয়ার প্রথম উপকরণ হলো নারী-পুরুষ সমানতালে শিক্ষাঙ্গনে যাওয়া। মহিলা মাদরাসার শিক্ষার্থীরা স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের মত বয়ফ্রেন্ড নিয়ে গলায় হাত দিয়ে পার্কে ঘুরে বেড়ায় না। কোচিংয়ের নামে ছেলে-মেয়ে এক জায়গায় অশ্লীল আড্ডা জমায় না। মহিলা মাদরাসা জাতিকে দক্ষ, শিক্ষিতা, নীতিবান ও আদর্শ মা উপহার দিচ্ছে। যা ইসলামের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

ইসলামের দৃষ্টিতে মাদরাসা শিক্ষার গুরুত্ব ও লাভ

সুস্থ সমাজ গঠনের হাতিয়ার হলো শিক্ষা। শিক্ষার মান দন্ডেই পরিমাপ করা হয় কোনো জাতি কতটুকু উন্নত ও সভ্য, তাই সেই শিক্ষার লক্ষ হতে হয় সেই জাতির আদর্শ, মূল্যবোধ ও ইতিহাস ঐতিহ্যের আলোকে। শিক্ষাকে সর্বকৃষ্টভাবে সাজিয়েছেন মহাকবি তাঁর ভাষায় শিক্ষা হলো দেহ, মন ও আত্মার সমন্বিত উন্নতি সাধন। আর দেহ, মন, আত্মার সমন্বিত উন্নতি সাধন শুধুমাত্র, কেবলমাত্র, একমাত্র নৈতিক শিক্ষা তথা ওহী ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তনের মাধ্যমেই সুস্থ সমাজ ও জাতি গঠন করা সম্ভব। যে শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা মহানবী মুহাম্মদ সা. অজ্ঞতার সূচিভেদ্য অন্ধকারে নিমজ্জিত মনুষ্য জাতিকে সোনার মানুষে পরিণত করেছেন তা হচ্ছে হেরা গুহায় আল্লাহ তা'য়ালার কাছ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা পদ্ধতি। ওহীর ভিত্তিতে প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তনের দ্বারা এদেশের শিক্ষার্থী সমাজকে দুর্নীতি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজী, খুন, রাহাজানি, মাদকাসক্তি ইত্যাদি অসামাজিক কার্যকলাপ থেকে মুক্ত করে ফুটন্ত গোলাপের ন্যায় পবিত্র করে গড়ে তোলা সম্ভব।

বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে যদি কুরআন-হাদীসের সংমিশ্রন থাকত তাহলে লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী জনতার নৈতিক ভিত্তি বিশাল পাহাড়ের মত অটল অবিচল হয়ে উঠত। স্নেহ, মায়া-মমতা, উদারতা, ভালোবাসা আর শ্রদ্ধার এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়ে উঠত। কোনো শিক্ষার্থীকে যখন পদার্থ, রসায়ন কিংবা জীববিজ্ঞান পড়ানো হয় আর সেই পড়াকে কুরআন সুন্নাহের আবর্তনে ঢেলে সাজানো হয় তাহলে ঐ শিক্ষার্থীদের সমাজ দেশ এবং জাতি গঠনে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। ভালোভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার আদর্শিক ভিত্তি যদি সঠিক ভাবে নির্ধারিত না হয় তাহলে সে শিক্ষা ব্যবস্থা জাতিকে আগামী দিনের কাঙ্খিত নাগরিক ও নেতৃত্বে সরবরাহ করতে ব্যর্থ হবে। কর্মহীন শিক্ষা যেমন অবাস্তব, ধর্মহীন শিক্ষা তেমনিই অমার্জনীয়। কর্ম শিক্ষা মানুষকে বাঁচাতে শেখায়, কিন্তু ধর্ম শিক্ষা মানুষকে যোগ্য নাগরিক রূপে বাঁচতে ও চিন্তা করতে শেখায়।

মাদরাসা আরবী শব্দ দারসুন থেকে উদ্ভূত যার অর্থ 'পাঠ'। মাদরাসা মূলত মুসলমানদের অধ্যয়ন-গবেষণা প্রতিষ্ঠান। সাধারণ অর্থে মাদরাসা হচ্ছে আরবী ভাষা ও ইসলামি বিষয়ে অধ্যয়নের প্রতিষ্ঠান। মাদরাসার প্রাথমিক স্তর মক্তব, নূরানী বা ফোরকানিয়া মাদরাসা নামে অভিহিত। ফোরকানিয়া শব্দের মূল ফুরকান যার অর্থ বিশিষ্ট। মিথ্যা থেকে সত্যকে সুস্পষ্টভাবে পৃথক করে বলে কুরআনে অন্য নাম আল ফুরকান। প্রাথমিক স্তরের যেসব মাদরাসায় কুরআন পাঠ ও আবৃত্তি শেখানো হয় সেগুলিকে দরসে কুরআন বলে।

'ইলম অন্বেষণ করলে সবকিছু বিসর্জন দিতে হয়।' এ উদ্দেশ্যে মাদরাসা বানালাম এবং মাদরাসাকে মনে হলো গনীমত। দ্বীনের যেটুকু নিঃশ্বাস বাকি আছে তা এই মাদরাসার উসিলায় এবং এটা তখনই হবে যখন সব ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে একমনে পড়ালেখায় লেগে থাকবেন এবং এ সময়টাকে গনীমত মনে করে কাজে লাগাবেন। কবির ভাষায়- 'সবকিছু থেকে চক্ষু বন্ধ করে ইলমের পেছনে লাগেন। চেষ্টা সাধনা করে যান।' যে কোনো বড় আলেমের কথাই বলেন তার শিক্ষা জীবন দেখুন। শিক্ষা জীবনকে তিনি সত্যিকারের ছাত্রের মতই ইলম অন্বেষণে কাটিয়েছেন।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রীদের শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন। হযরত আয়েশা রা. ছিলেন একজন হাদীস বিশারদ। তিনি অনেক বড় সাহাবীদের থেকেও অধিক সংখ্যার হাদীস বর্ণনা করেছেন। মহানবীর কাছে পুরুষ সাহাবীরা যেমন জ্ঞান শিখতেন, তেমনি মহিলা সাহাবীরাও জ্ঞান শিক্ষা করতেন। মহানবী সা. এর কাছে শিক্ষানুরাগী মহিলারা একবার বলছিলেন, আপনি জ্ঞান শিক্ষার কাজে সবসময় পুরুষদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকেন। আমাদের জন্যও একটা দিন ধার্য করুন।

রাসূল সা. সে অনুযায়ী তাদের আলাদা শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। রাসুল সা. উম্মাহতুল মুমিনীনের লেখা শেখার ব্যবস্থা করেছিলেন। হযরত হাফছা রা., হযরত আয়েশা রা. এবং অন্যান্য মহিলা সাহাবীরা লিখতে জানতেন। হযরত আয়েশা রা. সমকালীন শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন তা বোঝা যায় নিম্নোক্ত বর্ণনা থেকে। হযরত উরওয়া বিন যোবায়ের তার খালা সম্পর্কে বলেন, ফারায়েজের ইলম, হালাল-হারামের মাসায়েল এবং কুরআনের ইলমের ক্ষেত্রে হযরত আয়েশা রা.-এর চেয়ে বড় আলেম আমি দেখিনি। হযরত উরওয়া আরও বলেন, কবিতা, সাহিত্য, চিকিৎসা এবং ইতিহাস সম্পর্কে আয়েশার রা. চেয়ে বড় জ্ঞানী আমি দেখিনি।

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তার মর্যাদা ছিল অনেক পুরুষ সাহাবীর ওপরে। হাদীস গ্রন্থগুলোর মধ্যে আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ২২১০, যা সব সাহাবায়েকেরামের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। প্রসিদ্ধ তাবেঈ মসরুক বলেন, আল্লাহর কসম, বড় বড় সাহাবাকে আমি আয়েশা রা.-এর কাছে মিরাছের মাসআলা জিজ্ঞেস করতে শুনেছি। সাহাবীরা যখনই কোনো মাসআলার ব্যাপারে সমস্যায় পড়তেন তখনই তারা পর্দার আড়াল থেকে হযরত আয়েশা রা.-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করতেন এবং সঠিক সমাধান পেতেন। এর দ্বারা বোঝা গেল, পর্দার সঙ্গে মহিলাদের জন্য শিক্ষকতা করা বা মহিলাদের কাছে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করার ব্যাপারে ইসলামের কোনো বাধা নেই। আর পর্দার বিধান নারীকে আবদ্ধ করার জন্য নয়, নারীকে শিক্ষা বিমুখ রাখার জন্যও নয় বরং নারীর সম্ভ্রম রক্ষা ও নিরাপত্তা দানের জন্যই পর্দার বিধান রাখা হয়েছে। শিক্ষাও যেমন নারীর জন্য জরুরি ঠিক পর্দাও নারীর অস্তিত্ব ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য জরুরি।

যেসব মহিলা সাহাবী কবি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাদের মধ্যে রয়েছেন আরওয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব, সুদা বিনতে কুরায়জ, রাসুল সা.-এর দুধ বোন শায়মা, আতেকা বিনতে যায়দ, খানসা প্রমুখ।

হযরত খানসা রা. এর কবিতা রাসুল সা. অত্যন্ত আগ্রহ ভরে শ্রবণ করতেন এবং বলতেন, হে খানসা, আরও কিছু শুনাও। সুতরাং ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই নারী সমাজের জ্ঞান চর্চার ব্যাপারে নারী শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ ছিল এবং এ ধারাবাহিকতা পরবর্তী যুগেও অব্যাহত ছিল। ইবনে আসাকির বলেছেন, ইমাম বুখারী যে সব নারী মুহাদ্দিস থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন তার সংখ্যা ছিল আশির ওপরে।

সারকথা- ইসলাম নারীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনো বাধা প্রদান করে না। সে হিসেবে নারীদের শিক্ষা অর্জন থেকে শুরু করে সবকিছুর অধিকার নিশ্চিত করা ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। কিন্তু সে দায়িত্ব অবশ্যই সতর্কতার সাথে পালন করতে হবে।

কওমী মাদ্‌রাসার প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। শিক্ষা জাতির উন্নতির সোপান। শিক্ষা জাতিকে মূর্খতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোর দিকে পথ নির্দেশ করে। শিক্ষা মানুষকে সুন্দর, পরিমার্জিত ও আদর্শ মানুষ রূপে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। তবে মানব রচিত পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থা কখনো মানব জীবনের সামগ্রিক কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। একমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত কুরআন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাহ ভিত্তিক ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাই দুনিয়া ও আখেরাতের প্রকৃত সফলতা বয়ে আনতে পারে। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর ওপর অত্যাবশ্যকীয় ইসলামী শিক্ষা অর্জন করা ফরজ করে দিয়েছেন। এছাড়াও ইসলামী শিক্ষা হচ্ছে শাশ্বত শিক্ষা। এ শিক্ষাই মানুষকে নৈতিকতার উচ্চাসনে সমাসীন করতে পারে। আর কওমী মাদ্‌রাসা হচ্ছে এই ইসলামী শিক্ষার প্রাণ কেন্দ্র ও সত্যিকার ধারক-বাহক। এজন্য কওমী মাদ্‌রাসা হতে শিক্ষাপ্রাপ্তরা সমগ্র দুনিয়াতে ইসলাম ও মানবতার খিদমতে নিয়োজিত। দেশ ও জাতির স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব এবং ইসলামী মূল্যবোধের হেফাজতের লক্ষ্যে তাঁরা আল্লাহর সাহায্যে এগিয়ে আসেন। তবে হ্যাঁ জাগতিক জীবন পরিচালনার জন্য সাধারণ জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তাও উল্লেখযোগ্য, আর এজন্য কওমী মাদ্‌রাসাও এ ধরণের দ্বীনি প্রতিষ্ঠান হতে কুরআন-হাদীসের সঠিক জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি সাধারণ জ্ঞান অর্জন করে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে কুরআন হাদীস অনুযায়ী জীবন যাত্রা পরিচালনা করা একান্ত কর্তব্য। আর তাই একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, কওমী মাদ্‌রাসা ও কওমী মাদরাসা ভিত্তিক সঠিক ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

কওমী মাদরাসার অবদান

কওমী মাদরাসা সঠিক পথের সংরক্ষক ও প্রহরী; যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে সাহাবায়েকেরাম, সাহাবায়েকেরাম হতে তাবি'ঈন, তাবি'ঈন হতে তাবে তাবি'ঈন ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীন পর্যন্ত পৌঁছেছে। অতঃপর আইম্মায়ে মুজতাহিদীন হতে প্রত্যেক যুগেই এ আমানত উম্মতের নির্বাচিত শ্রদ্ধেয় মনীষীগণের মাধ্যমে পৌঁছেছে, নিঃসন্দেহে তা সামষ্টিকভাবে অক্ষত। এইভাবে দ্বীনের স্থায়ী সংরক্ষণ হয়ে আসছে। আল্লাহ তা'আলা কওমী আলেম-ওলামা দ্বারা বিগত দিনগুলোতে দেশ-জাতি ও দ্বীনের যে খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন- তা দৃষ্টান্তহীন। হেদায়াতের এমন কোনো পথ নেই, যাতে কওমী আলেম দ্বারা পথনির্দেশিকা স্থাপন করা হয়নি। বিশ্ব পরিস্থিতিতে দ্বীনের অপব্যাখ্যা, অপপ্রচার সম্পর্কে মুসলিম জাতিকে সচেতন করে তোলেন কওমী ওলামায়েকেরাম। তারা ধর্মহীনতা, বদদ্বীনী, নাস্তিকতার প্লাবনে ভেসে যাওয়া

মুসলমানদের পুনরুদ্ধারের দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। তাঁরা বর্তমান সময়ে ইসলাম এবং মুসলিম জাতির হেফাযতের গুরু দায়িত্ব পালন করছেন।

এছাড়াও গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে আলেমগণ হাদীস, ফেকাহ, তাফসীরসহ বিভিন্ন শাস্ত্রের সহায়ক বহু গ্রন্থ রচনা করছেন। এর পাশাপাশি যারা তাফসীরের নামে কুরআনের অপব্যাখ্যা ও বিকৃত করে, তাদের দাঁত ভাঙ্গা উত্তরও দেন। মুসলিম উম্মাহকে এ সম্পর্কে সচেতন করেন। আমাদের দেশ ও জাতির স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় তাঁদের আদর্শ লালন করেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে আলেমগণের ভূমিকা স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। হিংস্র ইংরেজ ঔপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম জিহাদের ফতোয়া প্রদান করেন ওলামায়েকেরাম। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের নেতৃত্বেও ছিলেন আলেমগণ।

কওমী ওলামায়েকেরামের কর্ম তৎপরতার কেবলমাত্র শিক্ষা-সংস্কৃতির মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং উপমহাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মুসলিম উম্মাহর মাঝে ব্যাপক জাগরণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সুস্থ চিন্তাধারার বিকাশ, দ্বীনের প্রচার-প্রসার এবং ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ময়দানে যুগান্তকারী বিপ্লব সাধিত হয় কওমী মাদরাসার স্বর্ণ সন্তানদের মাধ্যমে। কওমী মাদ্রাসা ও তার স্বর্ণ সন্তানদের অবদানের মৌলিক দিকগুলো হচ্ছে-

❖ ইসলামী শিক্ষা বিকাশে কওমী ওলামায়েকেরামের বলিষ্ঠ ভূমিকা।
❖ ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণকল্পে আত্মনিয়োগ।
❖ ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় কওমী ওলামায়েকেরামের অবদান।
❖ বিদআত-কুসংস্কার মোকাবেলায় ওলামায়ে কেরামের অবদান।
❖ ওয়াজ নসীহত এবং দাওয়াত ও তাবলীগ, গ্রন্থ সংকলন ও গ্রন্থ রচনা করা।
❖ রাজনৈতিক ময়দানে ইসলামী রাজনীতি বাস্তবায়ন।
❖ তাসাউফ তথা মানবিক আত্মশুদ্ধির ময়দানে কার্যকরী দিক-নির্দেশনা প্রদান।
❖ বিভিন্ন বাতেল ফেরকা বিরোধী কার্যকরী ভূমিকা জোরদার ও আন্দোলনে কওমী ওলামায়েকেরামের অবদান।
❖ দুনিয়াবী সফলতার সাথে সাথে আখেরাতের মহাসফলতার সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।

উপমহাদেশে মাদরাসা শিক্ষার সূচনা ও বিকাশ

ভারতবর্ষে মাদরাসা শিক্ষার সূচনা হয় ৭১১ সালে, মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের পর পরই। সিন্ধু বিজয়ের হাত ধরে ভারতে মাদরাসা শিক্ষা বা ইসলামী শিক্ষার যাত্রা শুরু হলেও প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয় এরও বেশ কিছুকাল পর। মুহাম্মদ ঘুরী ১২০০ শতকের শেষ দিকে ভারতে তুর্কি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ১১৯১ সালে তিনি আজমীরে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর মোগল আমলে ভারতবর্ষে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার বিস্তার ঘটে। ভারতবর্ষে মুসলিম শাসকদের শাসনামলে শিক্ষাব্যবস্থা ও ধর্ম অঙ্গাঙ্গিভাবে

জড়িত ছিল। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত UNESCO-i Studies on Compulsory Education-এ উল্লেখ করা হয়েছে : 'মুসলিম শাসনামলে শিক্ষা ও ধর্মকে অত্যন্ত অঙ্গাঙ্গিভাবে বিবেচনা করা হতো।' সে আমলে মুসলিম পরিবারের শিশুদের হাতে খড়ি হতো কুরআন শিক্ষার মাধ্যমে। ইতিহাসবিদ এ আর মল্লিক লিখেছেন : 'বাংলার মুসলমানদের অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে যখন কোনো সন্তানের বয়স চার বছর চার মাস চার দিন পূর্ণ হতো, তখন তার শিক্ষার সূচনা হতো। একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কুরআনের কিছু অংশ শিশুকে পাঠ করে শোনানো হতো। শিশু তা পুনরাবৃত্তি করত। এ ছিল প্রতিটি মুসলিম পরিবারের অপরিহার্য প্রথা।'

প্রথম মাদরাসার ইতিহাস

মাদরাসা শিক্ষায় প্রথম প্রতিষ্ঠান ছিল সাফা পর্বতের পাদদেশে হযরত যায়েদ ইবনে আরকামের বাড়িতে। যেখানে রসুল সা. ছিলেন শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী ছিলেন তাঁর কয়েকজন অনুসারী নওমুসলিম। হিজরতের পর মদিনায় মসজিদে নববীর পূর্বপাশে স্থাপিত হয় মাদরাসা আহ্‌লে সুফ্‌ফা। শিক্ষক ছিলেন হযরত উবাদা ইবনে সামিত আর শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছিলেন হযরত আবু হুরাইরা, মুয়াজ ইবনে জাবাল, হযরত আবু যর গিফারী রা. প্রমুখ। সেকালের মাদরাসার পাঠ্যসূচিতে ছিল, কুরআন, হাদীস, ফরায়েজ, প্রাথমিক চিকিৎসা, বংশ শাস্ত্র, তাজভীদ শিক্ষা ইত্যাদি। এছাড়া অশ্ব চালনা, যুদ্ধবিদ্যা, হস্তলিপি বিদ্যা, শরীর চর্চা ইত্যাদিও পাঠ্য সূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। নবুয়তের প্রথম দিন থেকে হযরত উমাইয়া বংশের শাসনামলের প্রথম ভাগ পর্যন্ত প্রায় একশ বছর সময়কালকে মাদরাসা শিক্ষার প্রথম পর্যায় বলা হয়।

মৌলিক শিক্ষা ঃ ইসলামের মধ্যযুগে কোনো কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয়কে বলা হত মকতব, যা অন্তত দশম শতাব্দী থেকে বলা হয়ে এসেছে। মাদরাসার মতই মকতবও সাধারণত পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত কোনো মসজিদের সাথে সংযুক্ত থাকত। একাদশ শতাব্দিতে, পারস্যের বিখ্যাত ইসলামী দার্শনিক ও পন্ডিত ইবনে সিনা, তাঁর এক বইয়ে, মকতবসমূহে কর্মরত শিক্ষকদের নির্দেশনা হিসাবে মকতব সম্পর্কে "শিশুদের প্রশিক্ষণ ও লালনপালনের ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা" নামে একটি অধ্যায় লিখেছেন। তিনি লিখেছেন যে শিশুদেরকে ব্যক্তিগত শিক্ষক দিয়ে আলাদা আলাদা শিক্ষা দেয়ার পরিবর্তে শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষা দিলে তারা তুলনামূলক ভালো শিক্ষা লাভ করে। আর এখানে বিষয়টি এমন কেনো সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রতিযোগিতা ও পারস্পরিক অনুসরণ করে শিক্ষা লাভের মূল্যের পাশাপাশি শ্রেণিবদ্ধ আলোচনা ও বিতর্কের বিভিন্ন উপকার

উল্লেখপূর্বক বেশ কিছু কারণ দেখিয়েছেন। ইবনে সিনা মকতবের শিক্ষার দুটি স্তরের পাঠ্যক্রম বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করে মকতবের পাঠ্যসূচীর ব্যাখ্যা দেন।

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ ইবেন সিনা লিখেছেন যে শিশুদেরকে ছয় বছর বয়স থেকেই মকতবে পাঠানো ও চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া উচিত। এসময়ে, তারা যেন কুরআন, হাদীস, ইসলামী দর্শন, ভাষা, সাহিত্য, ইসলামী আচার-ব্যবহার ও ব্যবহারিক (অর্থাৎ, যে কোনো প্রকারের প্রায়োগিক) দক্ষতা আয়ত্ত করে।

মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ ইবনে সিনা মকতব ভিত্তিক শিক্ষার দ্বিতীয় স্তরকে এমন একটি বিশেষ যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্র বলে আখ্যায়িত করেছেন যে সে ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের কর্তব্য হলো, কোনো সামাজিক মর্যাদার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে প্রায়োগিক যোগ্যতা অর্জন করা। তিনি লিখেছেন যে চৌদ্দ-উর্ধ ছেলে-মেয়েদেরকে তাদের নিজ ইচ্ছামত কোনো বিষয় বেছে নিয়ে সেবিষয়ে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করতে দেয়া উচিত যাতে সে আগ্রহবোধ করে, তা হতে পারে ব্যবহারিক দক্ষতা, সাহিত্য, দ্বীনের দাওয়াত, জ্যামিতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, কারুকর্ম অথবা অন্য যে কোনো এমন বিষয় বা বৃত্তি যা অনুযায়ী সে ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তুলতে চায়। তিনি আরো লিখেন যে এটা তাদের পরিবর্তনশীল সময় আর শিক্ষার্থীদের বেড়ে ওঠার বয়স অনুযায়ী তাদের জন্য নমনীয়তা রাখা প্রয়োজন, পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশ ও তাদের বিষয়কে বিবেচনায় রাখা।

দ্বীনী শিক্ষার রূহ হলো ইখলাস

ইখলাসের সাথে সাধারণ কথাবার্তাও অনেক উপকারী হয়। কিন্তু (আল্লাহ না করুন) যদি ইখলাস না থাকে তাহলে ওয়াজও নিরর্থক হয়ে যায়।

আমরা যত কাজ করছি, আল্লাহ তাআলার বরকতে আমাদের দ্বারা যত ইলমী ও দ্বীনী কাজ হচ্ছে তা শিক্ষা-দীক্ষা, লেখালেখি, ফতোয়া বা ইমামতি, যাই হোক- এসবের সম্পর্ক দ্বীনের সাথে। আল্লাহ আমাদেরকে এই মহান কাজের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। অন্যথায় আমরা অন্য যে কোনো ব্যস্ততায় আবদ্ধ হয়ে যেতে পারতাম। নিজের পেট চালানোর জন্য মানুষ কত উপায়ই না গ্রহণ করছে। আমরাও হয়তো কোনো একটা বেছে নিতাম।

প্রতিটি দ্বীনী কাজের একটি রূহ রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত ওই রূহ অর্জিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ওই দ্বীনী কাজ দ্বারা ফায়দা অর্জন করা সম্ভব হয় না; বরং অনেক সময় তা অনেক বড় ফেতনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এজন্যই দুআ করা হয়-

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع "ইলম তো চাই, কিন্তু এমন ইলম নয়, যার কোনো ফায়দা নেই।" তো এ ইলম উপকারী হওয়ার জন্য এবং এই

ইলমকে উপকারী বানানোর জন্য তাতে রূহ থাকতে হবে। ইলমের মধ্যে যখন ওই রূহ আসবে তখন তা উপকারী হবে। মানুষ এর দ্বারা উপকৃত হবে। এর সৌরভ চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। গোটা জগত এর দ্বারা উপকৃত হবে। ওই ব্যক্তির জন্য তা সদকায়ে জারিয়া হবে। আল্লাহর কাছে পৌঁছার পর আল্লাহর সন্তুষ্টি তার অর্জন হবে। আর যদি ওই ইলম (আল্লাহ না করুন) উপকারী না হয়, এতে রূহ না থাকে তাহলে তা একটি প্রাণহীন শরীর হিসেবে গণ্য হবে। যার কোনো রূহ নেই। দেখতে সব কিছুই ঠিক থাকে। কিন্তু তার মধ্যে রূহ নেই। তখন সেটা আর মানুষ থাকে না; বরং তা প্রাণহীন জড় বস্তর মধ্যে গণ্য হয়। (আল্লাহ না করুন) ওই ইলমের মধ্যেও যদি রূহ না থাকে তখন তাও এ রকম মৃত লাশের মতো; বরং মৃত লাশের তো কোনো উপকার করার শক্তি নেই, আবার অপকার করারও শক্তি নেই। কিন্তু ইলম যদি উপকারী না হয়, এতে রূহ না থাকে তাহলে তা শুধু এমন নয় যে, কোনো উপকার করে না; বরং তা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এর দ্বারা ফেতনা সৃষ্টি হয়। এজন্যই আমাদের ইলমের মধ্যে যেন রূহ সৃষ্টি হয়-এর ফিকির করতে হবে।

রূহ কী ঃ যদি এক শব্দে তা বলতে চাই তাহলে সেটা হলো, ইখলাস। ইলম যদি ইখলাসের সাথে শেখা ও শেখানো হয় অর্থাৎ এই ইলম আমি এজন্য শিখছি এবং অন্যের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি যেন আমার আল্লাহ আমার ওপর রাজি হন তাহলে তার রূহ বা প্রাণটা ঠিক থাকবে। এটাই হলো সমস্ত আমলের রূহ।

আর যদি (আল্লাহ না করুন) ইখলাস না থাকে তাহলে এই ইলমের কারণে আমার দ্বারা ফেতনা সষ্টি হবে। যখন এই ইলম ইখলাসের সাথে না হয়, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে না হয়ে মাখলুকের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হয় মানুষের প্রশংসা অর্জনের উদ্দেশ্যে হয়, মানুষের মাঝে নিজের প্রসিদ্ধি অর্জনের উদ্দেশ্যে হয়, মানুষ থেকে দুনিয়াবী লাভের উদ্দেশ্যে হয়-তখন ওই ইলম থেকে ফেতনা জন্ম নেয়। পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়।

ভাবনা আসে, অমুকের প্রসিদ্ধি বেশি হয়েছে আমারও ওই রকম প্রসিদ্ধি অর্জন করতে হবে। মানুষের মাঝে অমুকের গ্রহণ যোগ্যতা বেশি হয়েছে এখন সে এই চেষ্টায় লেগেছে যে, আমি তার থেকেও এগিয়ে যাই। অথবা সে আমার থেকে পেছনে পড়ে যাক। আমার প্রসিদ্ধি বেশি হোক। মানুষ আমাকে বেশি মানুক ইত্যাদি। যখন এসব এসে যায় তখন ইখলাস শেষ হয়ে যায়। এর পরিণতিতে পারস্পরিক দ্বন্দ শুরু হয়।

যে ব্যক্তি দ্বীনের কাজ করছে, যার দ্বারা কোনো না কোনোভাবে দ্বীনের উপকার হচ্ছে তার সম্পর্কে সে ভাবত, এটা তো আমারই কাজ ছিল। সে এই কাজটা করছে। এতে সে আমারই উপকার করছে। এটা তো মেহনত করে আমারই করতে হত। ওই আল্লাহর বান্দা আমার পক্ষ থেকে কাজটা করে দিয়েছেন।

অন্তরে এই অনুভূতি বসে গেলে পারস্পরিক মুহাববত সৃষ্টি হবে। ভাবনাটাই হবে এমন যে, ওই কাজ তো আমার করার দরকার ছিল। এটা তো আমার জন্য আনন্দের ব্যাপার, খুশির ব্যাপার যে, সে আমার কাজ করে দিচ্ছে। আমি তার সাথে লড়তে যাব কেনো? সে কেনো এটা অর্জন করে ফেলল-এজন্য হিংসা করতে যাব কেনো। এটাই হলো ইখলাস ও ইখলাস শূন্যতার মধ্যে পার্থক্য।

মূলকথা : আমাদের ইলমের রূহ হলো ইখলাস। এখন আমাদের কাজ হলো, আমরা যে কাজই করবে, শুধু আল্লাহর জন্যই করবো। মাখলুক থেকে পরিপূর্ণভাবে দৃষ্টি সরিয়ে নেব। আমি যে কাজ করছি, মানুষ আমাকে এ ব্যাপারে ভালো বলছে কি খারাপ বলছে, প্রশংসা করছে কি নিন্দা করছে-এসব কিছু থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিজের দিলকে আল্লাহ মুখী করে নিতে হবে যে, আমার আল্লাহ আমার এই কাজকে পছন্দ করছেন।

আধুনিক ও মানসম্মত মহিলা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা

পূর্ণ ইসলামী বিধি-বিধান চর্চার লক্ষ্যে সঠিক ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষা ছাড়া বর্তমানে মানসম্মত প্রতিষ্ঠান কল্পনা করা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ বিশ্ববিখ্যাত আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা শাখার কথা বলতে পারি। সেখানে মেয়েদের জন্য সম্পূর্ণ আলাদা পরিবেশে ইসলামী ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে (ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারী ও অন্যান্য শিক্ষাসহ) নার্সারি থেকে পি,এইচ,ডি পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে। সেখান থেকে মিশরের মুসলিম নারীরাও শিক্ষা গ্রহণ করে সমাজের সর্বস্তরে সেবা করছে।

মহিলা মাদরাসা নিয়ে কিছু কথা

"একজন শিক্ষিত মা একটি সমাজের দর্পণ।" সুস্থ সুন্দর সমাজ বিনির্মানে নারী শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বলে শেষ করা যাবে না। ইসলাম ধর্মে শিক্ষার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। ইসলাম পৃথিবীতে আবির্ভাব হওয়ার প্রথম শব্দ ছিলো 'ইকরা' অর্থাৎ পড়ো! এই শিক্ষা নারী পুরুষের ভেদাভেদ তৈরি করেনি বরং নারীরা প্রথম যুগেও শিক্ষার এক অনবদ্য নজীর স্থাপন করেছিলো।

বাংলাদেশে নারী শিক্ষার ধারাবাহিকতা এখন চক্রবৃদ্ধি আকারে বেড়েছে। পুরুষের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নারীরাও শিক্ষা অর্জন করছেন এবং পুরুষের সাথে পাল্লা দিচ্ছেন। বাংলাদেশের শিক্ষাধারা তিনভাবে বিভক্ত। যার মধ্যে স্কুল-কলেজ সম্পূর্ণ জেনারেল ধারা বলা চলে। সেখানে সমানহারে মেয়েরা সহশিক্ষা অর্জন করছেন। আলিয়া মাদরাসা শিক্ষাক্রমটি আধা ধর্মীয় এবং আধা জেনারেল শিক্ষা হিসেবে ধরা যায়, যেখানেও নারীরা সহশিক্ষাই অর্জন করছেন। এর বাইরে সম্পূর্ণ ব্যাতিক্রম এবং ভিন্নধারার পূর্ণ ধর্মীয় শিক্ষাক্রম হলো কওমী মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা।

কওমী মাদরাসার পুরুষ শাখার প্রতিষ্ঠা ইতিহাস ১৮০০ সালের দিকে হয়েছে বলে একটি তথ্য জানা থাকলেও নারীদের জন্য ঠিক কবে, কিভাবে এই মাদরাসার প্রতিষ্ঠা হয়েছে তার কোনো নির্দিষ্ট জরিপ নেই। তবে ধারণা করা হয় আশির দশকের শুরুর দিকে বিভিন্ন মতভেদের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে কওমী মাদরাসার নারী শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এক্ষেত্রে পাকিস্তানের মাদরাসা শিক্ষার নারী ধারাকে মূলত অনুসরণ করা হয়েছে বলে অনেকের ধারণা কারণ পাকিস্তানে নারীদের জন্য এই ধর্মীয় শিক্ষার ধারা বেশ সমৃদ্ধ।

বাংলাদেশে মহিলা মাদরাসাগুলোর প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসিম। দেশে একটি "উন্নত ধর্মীয় চিন্তাধারা লালন করে" নিজেদের নৈতিকতার সর্বোচ্চ স্থান নিশ্চিত করতে এবং নৈতিকতায় পরিপূর্ণ ভবিষ্যত প্রজন্ম বিনির্মানে মহিলা মাদরাসা অবশ্যই প্রয়োজন এবং এর উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা চালানো একান্ত কর্তব্য। কারণ সমাজের নারীরাই প্রজন্মের মুখে প্রথম বুলি ফুটিয়ে থাকেন। 'মায়ের হাত ধরেই প্রতিটি প্রজন্ম তাদের গতি পথের প্রথম দিক্ষা পায়। তাই মহিলা মাদরাসা এদেশের জনগোষ্ঠির জন্য খুবই প্রাসঙ্গিক। সে হারে না হলেও দেশে বর্তমানে মহিলা মাদরাসার সংখ্যা অনেক।

কওমী মহিলা মাদরাসার সিলেবাস (বেফাক) ২০১৫-১৬ সাল

তাকমীল (দাওরা)

❖ বুখারী শরীফ (১ম ও ২য় খন্ড) ❖ মুসলিম শরীফ (১ম ও ২য় খন্ড)
❖ তিরমিযী শরীফ (১ম ও ২য় খন্ড) ❖ আবু দাউদ শরীফ ❖ নাসায়ী শরীফ
❖ ইবনে মাজাহ শরীফ ❖ শরহু মা'আনিল আছার (ত্বহাবী)
❖ শামায়েলে তিরমিযী ❖ মুয়াত্তা ইমাম মালিক রহ.
❖ মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ রহ. ❖ তেলাওয়াত ও তাজবীদ ❖ উলুমূল হাদীস

ফজীলত (মেশকাত)

❖ মেশকাত শরীফ (১ম ও ২য় খন্ড) ❖ তাফসীরুল বায়জাবী (১ম পারা)
❖ হিদায়া (৩য় ও ৪র্থ খন্ড) ❖ শরহু নুখবাতিল ফিকার
❖ শরহুল আক্বাইদ নাসাফী এবং ফেরাকে বাতেলা ❖ তাহরীকে দেওবন্দ

ছফফে সানী আশার (হেদায়া ও জালালাইন)

❖ জালালাইন শরীফ (১ম ও ২য় খন্ড) ❖ হিদায়া (১ম ও ২য় খন্ড)
❖ নূরুল আনওয়ার (কিতাবুস সুন্নাহ) ❖ ছুল্লামুল উলূম ❖ আল-ফাউজুল কাবীর
❖ আক্বীদাতুত ত্বহাবী ❖ উলূমুল কুরআন

ছফফে হাদী আশার (শরহে বেকায়া)

❖ শরহুল বিকায়া (১ম ও ২য় খন্ড) ❖ মুখতাসারুল মা'আনী (১ম খন্ড)
❖ নূরুল আনওয়ার (কিতাবুল্লাহ) ❖ মাকামাতুল হারিরী
❖ তরজমাতুল কুরআন (১-১৫ পারা) ❖ আত্তরীক ইলাল ইন্‌শা (৩য় খন্ড)
❖ সিরাজী (মুনাসাখার পূর্ব পর্যন্ত)

ছফফে'আশের (কাফিয়া শরহে জামী)

❖ কাফিয়া ❖ শরহেজামী ❖ উসুলুশশাশী ❖ তরজমাতুল কুরআন (২১-৩০ পারা)
❖ দুরুসুল বালাগাহ ❖ নফহাতুল আরব ❖ শরহুত তাহযীব
❖ মুখতাসারুল কুদুরী (মুআমালাত) ❖ তালখিসুল মিফতাহ্ ❖ কানযুদ দাক্বায়েক
❖ আত্তরীক ইলাল ইন্‌শা (২য় খন্ড) ❖ আলফিয়াতুল হাদীস

ছফফে তাসে (হেদায়েতুন্নাহু)

❖ হেদায়েতুন্নাহু ❖ ইলমুস সীগাহ (খাছীয়াত সহ) ❖ নূরুল ইযাহ
❖ তা'লীমুল মুতাআল্লিম ❖ কাফিয়া (ফে'ল ও হরফ) ❖ মিরকাত
❖ মুখতাসারুল কুদূরী (মুআলামাত পর্যন্ত) ❖ তরজমাতুল কুরআন (১৬-২০ পারা)
❖ তাইসীরুল মানতিক ❖ আততরীক ইলাল ইন্‌শা (১ম খন্ড)
❖ আল কিরাআতুর রাশেদা (১ম ও ২য় খন্ড) ❖ বাংলা, গণিত, ইংরেজী (স্কুলের ৮ম শ্রেণির)

ছফফে সামেন (নাহবেমীর)

❖ নাহবেমীর ❖ শরহু মিয়াতি আমেল ❖ ইলমুছ ছরফ (৩য় ও ৪র্থ খন্ড)
❖ রওজাতুল আদব (প্রথম ৬ বাব) ❖ মালাবুদ্দা মিনহু
❖ সীরাতে খাতামুল আম্বিয়া ❖ গুলিস্তাঁ ফারসী (১ম ও ৮ম বাব)

ছফফে সাবে (মীযান)

❖ মিযানুছছরফ ও মুনশাইব ❖ আরবী ছফওয়াতুল মাছাদির
❖ তারীখুল ইসলাম ❖ আসানে কাওয়ায়েদ ❖ কারীমা ❖ পান্দেনামা
❖ বেহেস্তি জেওর (১ম থেকে ৩য় খন্ড) ❖ জামালুল কুরআন ও তেলাওয়াতুল কুরআন
❖ এসো আরবী শিখি (১ম ও ২য় খন্ড) ❖ বাংলা, গণিত, ইংরেজী (স্কুলের ৬ষ্ঠ শ্রেণির)
❖ হিফজুল কুরআন

ছফফে ছাদেছ (তাইসীর)

❖ তেলাওয়াতুল কুরআন তাজবীদ সহ ❖ তা'লীমুল ইসলাম (৪র্থ খন্ড)
❖ উর্দূ কী তেছরী (এমদাদিয়া লাইব্রেরী) ❖ ফারসী কি পহেলী
❖ তাইসীরুল মুবতাদী ❖ আদর্শ বাংলা পাঠ (পঞ্চম ভাগ) বেফাক বোর্ড
❖ আদর্শ বাংলা ব্যাকরণ, বেফাক বোর্ড ❖ প্রাথমিক গণিত (পঞ্চম ভাগ) বেফাক বোর্ড
❖ ইতিহাস পাঠ (পঞ্চম ভাগ) বেফাক বোর্ড
❖ ভূগোল ও সমাজ পরিচিতি (পঞ্চম ভাগ) বেফাক বোর্ড

ছফফে খামেছ (উর্দূ)

❖ এসো আরবী শিখি (১ম ও ২য় খন্ড) ❖ উর্দূ কায়দা ❖ উর্দূ পহেলী
❖ উর্দূ দুসরী ❖ তা'লীমুল ইসলাম (১ম থেকে ৩য় খন্ড)
❖ তেলাওয়াতুল কুরআন (তাজবীদসহ) নুজহাতুল ক্বারীর অনুস্মরণে
❖ বাংলা ৪র্থ ❖ গণিত ৪র্থ ❖ ইংরেজী ৪র্থ ❖ হিফজুল কুরআন

মাদরাসার ছাত্রীরা কী পড়েন?

১৮৬৬ সালে ভারতের প্রথম কওমী মাদরাসা দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠিত হয়। মহিলা মাদরাসা তারই একটি অংশ। সহশিক্ষার বিহীন মহিলা মাদরাসা ব্যবস্থা চালু করেন। মেয়েদের হাফেজা, আলেমা তৈরি করা হয় এসব প্রতিষ্ঠানে। মহিলা মাদরাসার সিলেবাস কওমী মাদরাসার অনুকরণেই তৈরি নব্বইয়ের দশকে দেশে মহিলা মাদরাসা ব্যবস্থা চালু হয়। অনেক আলেমের মতে রামপুরা জাতীয় মহিলা মাদরাসা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এর সংখ্যা বেড়েছে। একটা সময় মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল কওমী মাদরাসায় এতিম গরিব ছেলে-মেয়েরা পড়ালেখা করবে। এসব মাদরাসার সিলেবাস ছিল এক রকম। শুধু আরবী, উর্দু, ফার্সি পড়ানো হতো। ইংরেজি পড়া ছিল হারাম। বর্তমানে তাদের চিন্তা-চেতনা পরিবর্তন হয়েছে। যুগোপযোগী সিলেবাস তৈরি হয়েছে। কওমী মাদরাসার প্রাণ কেন্দ্র দারুল উলুম দেওবন্দে ইংরেজীর প্রতি অনেক গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। রাজধানীর কুড়িলে রয়েছে মা'হাদু তালীমিল বানাত মহিলা মাদরাসা। মাদরাসার শিক্ষা সচিব জানতে চেয়েছিলাম মহিলা মাদরাসার সিলেবাস ও পাঠদান সম্পর্কে। তিনি বলেন আমাদের মাদরাসার সিলেবাস যুগোপযোগী। কওমী শিক্ষা বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে ফার্সি উর্দু বাদ দিয়ে আরবী, বাংলা, ইংরেজির গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। আমাদের পুরো মাদরাসা মহিলা শিক্ষিকারা নিয়ন্ত্রণ করেন। পুরুষ শিক্ষকরা পর্দার আড়াল থেকে ক্লাস করান। ইসলাম কখনও নারী শিক্ষার বিরোধিতা করেনি। রাসূল সা. সর্বপ্রথম ইসলামের দাওয়াত নিজ ঘরে তার স্ত্রী খাদিজাকে রা. দিয়েছিলেন।

হযরত আয়েশা রা. রাসূল থেকে ২২১০টি হাদীস বর্ণনা করেন। ইসলাম নারীদের সুষ্ঠু নিরাপদ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে বলেছে।

মাদরাসার খরচ কোথা থেকে আসে জানতে চাইলে তিনি বলেন, মাদরাসা মানেই এতিমখানা নয়। মাদরাসা মানেই রাস্তাঘাটে ঘুরে চাঁদা কালেকশন নয়। কওমী মাদরাসা জনগণের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত হয়। আর্থিক অনুদানের একটি ফান্ড থাকবে। গরিব শিক্ষার্থীদের জন্য তার থেকে খরচ করা হবে। সামর্থ্যবান শিক্ষার্থী নিজ টাকায় পড়া-লেখা করবে। দুঃখের বিষয় হলেও সত্য আজকাল অনেক মাদরাসা রাস্তাঘাটে, বাজারে চাঁদা কালেকশন করছে। এতে মাদরাসার প্রতি মানুষের দৃষ্টি ভঙ্গি খারাপ হচ্ছে। ছাত্রীদের কর্মক্ষেত্র কী হবে জানতে চাইলে বলেন, মহিলা মাদরাসার ছাত্রীদের কর্মক্ষেত্র কম। তাদের কর্ম শুধু মহিলা মাদরাসায় শিক্ষকতা করা। দেশে মাদরাসা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের কর্মক্ষেত্রও বাড়ছে।

রাসূল সা. এর শিক্ষাদান পদ্ধতি

রাসূল সা. ছিলেন, একজন আদর্শ শিক্ষক। শিক্ষার্থীদের প্রতি স্নেহ-ভালো-বাসার পাশাপাশি তিনি তাদেরকে আদব শিখাতেন।

আল্লাহ তায়ালা রাসূল সা. সম্পর্কে বলেছেন, "তোমাদের জন্য রয়েছে মুহাম্মাদ সা. এর মাঝে উত্তম আদর্শ।"[১]

রাসূল সা. থেকে শিখতে পারবে আদর্শ রাজনীতি। কীভাবে অধীনস্তদের মন জয় করতে হয়, একজন নেতা তা শিখতে পারবে রাসূল সা. এর সিরাত থেকে। একজন আদর্শ শিক্ষকের নমুনা তিনি। কারণ আল্লাহ তায়ালা তাঁকে শিক্ষক রূপেই দুনিয়াতে প্রেরণ করেছিলেন।

কুরআনে শিক্ষকতার কথা এসেছে- 'তিনি ঐ সত্তা যিনি অশিক্ষিতদের মাঝে প্রেরণ করেছেন একজন রাসূল তাদেরই মধ্য থেকে। যিনি তাদের সামনে কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করবেন, আত্মশুদ্ধি করবেন, কুরআন ও হেকমত শিখাবেন, যদিও তারা ইতোপূর্বে সুস্পষ্ট ভ্রান্তির মাঝে ছিলো।'[২]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা. বলেন, রাসূল সা. একদিন তাঁর কোনো এক কক্ষ থেকে বের হয়ে মসজিদে গেলেন। মসজিদে তখন দু'টি বৈঠক বসেছিলো। এক বৈঠকের লোকজন কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ায় লিপ্ত ছিলো। আর অন্য বৈঠকের লোকজন শেখা-শিখানোয় ব্যস্ত ছিলো। রাসূল সা. বলেন, উভয় বৈঠকের লোকেরা কল্যাণের পথে রয়েছে। যারা তেলাওয়াত ও দোয়ায় আছে আল্লাহ তায়ালা চাইলে তাদেরকে দান করবেন বা করবেন না। এরপর রাসূল সা. বলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করেছেন। এ কথা বলে তিনি শেখা-শিখানোর বৈঠকে বসে গেলেন।'[৩]

নবীজী সা. বলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে এ জন্য প্রেরণ করেনি যে, আমি অন্যকে কষ্টে ফেলবো, অন্যের পদস্খলন কামনা করবো। তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন শিক্ষক এবং সাহায্যকারী হিসেবে।'[৪]

হযরত মুআবিয়া ইবনে হাকাম রা. বলেন, একদিন আমি রাসূল সা. এর সঙ্গে নামায পড়ছিলাম। কোনো একজন হাঁচি দিলো। আমি নামাযে থেকেই হাঁচির উত্তর দিলাম। আমার এই কান্ড দেখে সবাই আমার দিকে তাকাতে লাগলো। তখন আমি সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললাম, তোমাদের কী হয়েছে? আমার দিকে এভাবে তাকাচ্ছো কেনো? এরপর তারা রানের ওপর হাত মেরে আমাকে থামার

---

[১] সূরা আহযাব, আয়াতঃ ২১।
[২] সূরা জুমা, আয়াতঃ ২।
[৩] ইবনে মাজাহ শরীফ, হাদীস নম্বরঃ ২২০।
[৪] মুসলিম শরীফ, কিতাবুত ত্বালাক, হাদীস নম্বরঃ ১৪৭৮।

জন্য ইঙ্গিত করলো। তখন আমি চুপ হয়ে গেলাম। নামায শেষে রাসূল সা. আমাকে ডেকে পাঠালেন। আল্লাহর কসম! আমি আগে পরে কখনো তার চেয়ে উত্তম পদ্ধতিতে শিক্ষাদানকারী কোনো শিক্ষক খোঁজে পাইনি। তিনি আমাকে এ কাজের জন্য মারেননি। ধমক বা গালিও দেননি। তিনি আমাকে শেখালেন, নিশ্চয় এই নামাযে দুনিয়ার কোনো কথা বলা যায় না। নামাযে তাসবিহ, তাকবির ও কুরআন পড়তে হয়।"[১]

ইলম অর্জনের সঠিক পদ্ধতি

দ্বীনী ইলম অর্জনের অবকাশ সবার জন্য উন্মুক্ত। যে কোনো বংশের লোক, যে কোনো শ্রেণি-পেশার মানুষ, যে কোনো অঞ্চলের অধিবাসী কুরআন-সুন্নাহর ইলম অর্জন করতে পারেন। কুরআন-সুন্নাহ এ বিষয়ে উৎসাহিত করা হয়েছে।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন-

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِه طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ

"যে কেউ ইলমের খোঁজে কোনো পথে চলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।"[২]

ইমাম তিরমিযী রহ. এ হাদীসের উপর শিরোনাম দিয়েছেন- 'ফিকহের (দ্বীনের সঠিক বোঝ) মর্যাদা সংক্রান্ত বর্ণনা'।

দ্বীনী ইলম অর্জনের এই সাধারণ সুযোগ ইসলামের এক গুরুত্বপূর্ণ সৌন্দর্য। এই সৌন্দর্য উপলব্ধি করা যাবে যদি এ বিষয়ে অন্যান্য সম্প্রদায়ের ধর্ম-গ্রন্থ ও ধর্মীয় বিধিবিধান সম্পর্কে জানা শোনা থাকে। ইসলাম একদিকে যেমন ইলম অর্জনের সুযোগ সবার জন্য উন্মুক্ত করেছে অন্যদিকে সঠিক উপায়ে ইলম অর্জন না করে দ্বীনী বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়াকে অপরাধ সাব্যস্ত করেছে। ইলম অর্জনের সুযোগ সবার জন্য অবারিত আর সঠিক উপায়ে ইলম অর্জন ছাড়া ইলমী সিদ্ধান্ত দেয়া নিষেধ।

দ্বীনী ইলম অর্জনের সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে, আলিমগণের নিকট থেকে ইলম অর্জন করা। হযরত আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. সাহাবীদের বললেন-

خُذُوا الْعِلْمَ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ "ইলম অর্জন কর তা বিদায় নেয়ার আগে।"

সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন- আল্লাহর নবী! ইলম কীভাবে বিদায় নেবে, আমাদের মাঝে তো রয়েছে আল্লাহর কিতাব? বর্ণনাকারী বলেন, এ কথায় তিনি রাগান্বিত হলেন। এরপর বললেন-

---

[১] মুসলিম শরীফ।

[২] মুসনাদে আহমদ ১৪/৬৬।

ثَكِلَتْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ أَوَلَمْ تَكُنِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمْ شَيْئًا؟ إِنَّ ذَهَابَ الْعِلْمِ أَنْ يَذْهَبَ حَمَلَتُهُ إِنَّ ذَهَابَ الْعِلْمِ أَنْ يَذْهَبَ حَمَلَتُهُ

"তোমাদের মরণ হোক! বনী ইসরাইলের মাঝে কি তাওরাত ও ইঞ্জীল ছিল না, কিন্তু এতে তো তাদের কোনোই উপকার হলো না! ইলমের প্রস্থানের অর্থ তার বাহকগণের প্রস্থান।"[১]

হাদীসের শুরুতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন 'ইলম গ্রহণ কর তা বিদায় নেয়ার আগে।' এরপর 'ইলম বিদায় নেয়ার' অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেছেন, ইলম বিদায় নেয়ার অর্থ আলেমগণের বিদায় নেয়া। তাহলে এ হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইলমের বাহক তথা আলিমগণের নিকট থেকে ইলম গ্রহণ করতে বলেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ শিক্ষার প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই তাঁর সাহাবীগণের কণ্ঠে। হযরত আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

مَا لِي أَرَى عُلَمَاءَكُمْ يَذْهَبُونَ وَجُهَّالَكُمْ لَا يَتَعَلَّمُونَ؟ تعلموا قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، فَإِنَّ رَفْعَ الْعِلْمِ ذَهَابُ الْعُلَمَاءِ

"হায়! তোমাদের আলিমগণ বিদায় নিচ্ছেন কিন্তু তোমাদের বে-ইলম শ্রেণি ইলম অর্জন করছে না। ইলম উঠিয়ে নেয়ার আগেই ইলম অর্জন কর। ইলম উঠিয়ে নেয়ার অর্থ আলিমদের প্রস্থান।"[২]

হাদীসের একটি শিক্ষা- এ হাদীস থেকে দ্বিতীয় যে বিষয়টি জানা যাচ্ছে, তা হলো, শুধু গ্রন্থ নির্ভুল ইলমের জামিন নয় এবং শুধু গ্রন্থ-নির্ভরতা ইলম অর্জনের সঠিক উপায় নয়। এমনকি তা আসমানী কিতাব হলেও না। এ ক্ষেত্রে রাসূল সা. এক জ্বলন্ত বাস্তবতা- তাওরাত ও ইঞ্জিলের উদাহরণ দিয়েছেন। বনী ইসরাইলের মাঝে তো তাওরাত ও ইঞ্জিল ছিল। কিন্তু যোগ্য বাহকগণের বিদায় নেয়ার পর তাদের সুযোগ্য উত্তরসূরীর অভাবে শুধু তাওরাত-ইঞ্জিলের আসমানী ইলম থেকেই ঐ জাতি বঞ্চিত হয়নি স্বয়ং তাওরাত-ইঞ্জিলের মূল পাঠই হারিয়ে গেছে এবং এর মর্ম ও শিক্ষাও চরম বিকৃতির শিকার হয়েছে। এমনই হয়। কিতাবের যথার্থ শিক্ষা গ্রহণে যদি মানব-মস্তিষ্ক ব্যর্থ হয় এবং কিতাবের আলোয় তার হৃদয় ও কর্ম সংকুচিত না হয় তখন ঐ পাঠক নিজের চিন্তা ও রুচির আলোকে কিতাব 'সংশোধনে' প্রয়াসী হয়ে ওঠে। এভাবে আরো বিভিন্নভাবে বিকৃতির সূত্রপাত ঘটে। আর বলাই বাহুল্য যে, কিতাবের সঠিক মর্ম ও শিক্ষা অনুধাবন ও গ্রহণের জন্য এমন প্রাজ্ঞ ও আদর্শ শিক্ষকের প্রয়োজন যিনি হবেন সব অর্থে ঐ কিতাবের

---

[১] মুসনাদে আহমদ ৫/২৬৬; আদদারেমী ১/৮৬, হাদীস ২৪৫।
[২] আদ দারেমী ২৫১।

বাহক। নতুবা কিতাব জ্ঞান ও আলোর সূত্র হওয়া সত্ত্বেও গ্রহণের উপায় সঠিক না হওয়ার কারণে কিতাবের পাঠক কিতাবের আলো থেকে বঞ্চিত হবে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, শুধু ব্যক্তিগত অধ্যয়ন ইলম অর্জনের সঠিক পদ্ধতি নয়।

হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন- মানুষের উপর এমন এক যুগের আগমন ঘটবে যখন অনেক হবে পাঠকের সংখ্যা আরো হ্রাস পাবে ফকীহের সংখ্যা আর ইলম তুলে নেয়া হবে ও রক্তপাত ছড়ে পড়বে।[১]

ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেছেন-

مَنْ تَفَقَّهَ مِنَ الْكُتُبِ ضَيَّعَ الْأَحْكَامَ

"যে (শুধু) বইপত্র থেকে ফিকহ অর্জন করে সে (শরীয়তের) বিধান ধ্বংস করে।"[২]

এক জ্ঞানী ব্যক্তির বাস্তবসম্মত উক্তি- 'শুধু বই-পত্র উস্তাযে পরিণত হওয়া এক মহাবিপদ।' কিছু সাধারণ মানুষ নিজেদের একজনকে নেতা বানিয়ে দ্বীনী-ব্যাখ্যা ও বিধি-বিধানের মজলিস প্রতিষ্ঠার করা ভুল।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন-

إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

"আল্লাহ তা'য়ালা ইলেমকে এমন ভাবে তুলে নিবেন না যে বান্দাদের (অন্তর) থেকে তা তুলে নিলেন; বরং ইলমকে তুলে নিবেন আলেমদের তুলে নেয়ার মাধ্যমে। অবশেষে যখন আলেম থাকবে না তখন লোকেরা বেইলেম লোকদের নেতা বানাবে আর তারা ইলম ছাড়া ফতোয়া দিবে। ফলে নিজেরা গোমরাহ হবে, অন্যদের গোমরাহ করবে।"[৩]

আজকাল কিছু সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত ও নানা পেশায় নিয়োজিত লোকদের মাঝে এ প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। তারা নিজেরা নিজেরা দ্বীনী বিধান নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করেছেন এবং নিজের খুশি মতো নতুন নতুন সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন। এক শ্রেণির তরুণের মধ্যেও এ প্রবণতা আছে। বলাবাহুল্য, এ কর্মপন্থাও উপরোক্ত হাদীসে উল্লেখিত ঐ নিন্দিত কর্মপন্থার মধ্যে পড়ে। এ জাতীয় 'গবেষণা'র পরিণাম ইলম নয়, গোমরাহী। এভাবে দ্বীনী-ইলম অর্জন করা যায় না।

---

[১] মুসদরাক হাকীম ৪/৪৫৭, হাদীস ৮৪১২।
[২] আলমাজমু' শরহুল মুহায্যাব ১/৩৮।
[৩] বুখারী, হাদীস ১০০; মুসলিম শরীফ, হাদীস ১৩।

ইমাম আবু হানীফা রহ. কে জানানো হলো যে, 'অমুক মসজিদে কিছু লোক একত্র হয়ে ফিকহ্ বিষয়ে আলোচনা করে।' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন- তাদের কোনো মাথা (শিক্ষক) আছে কি? বলা হলো- জ্বী না। তিনি বললেন,'এরা কখনো ফিকহ অর্জনে সমর্থ হবে না।' এখানে 'শিক্ষক' মানে সত্যিই যিনি শিক্ষক হওয়ার উপযুক্ত। দ্বীনের ব্যাখ্যা ও বিধান জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত লোকের নিকট থেকে গ্রহণ করা ভুল।

এক সাহাবী রাসূল সা.-কে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূল সা. বললেন, যখন আমানত বিনষ্ট করা হবে তখন কেয়ামতের অপেক্ষা কর। প্রশ্নকারী জিজ্ঞাসা করলেন, আমানত কীভাবে বিনষ্ট করা হয়? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- যখন অযোগ্য লোকের উপর কর্মের ভার অর্পণ করা হবে তখন কেয়ামতের অপেক্ষা কর।[১]

এক বিষয়ের পন্ডিত অন্য বিষয়ে অযোগ্য। একজন চিকিৎসক চিকিৎসা-বিদ্যায় যোগ্য হলেও প্রকৌশল শাস্ত্রে অযোগ্য। একজন প্রকৌশলী প্রকৌশল-বিষয়ে যোগ্য হলেও চিকিৎসা-শাস্ত্রে অযোগ্য। সুতরাং বিশেষ কোনো শাস্ত্রে পারদর্শী ব্যক্তির কাছে অন্য শাস্ত্রের সমাধান চাওয়া অযোগ্য লোকের উপর কর্মের ভার অর্পণ করার মধ্যেই পড়ে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কারো নিকট থেকে বাইআত নিতেন তখন এই অঙ্গিকারও নিতেন যে, আমরা দায়িত্বশীল (ও যোগ্য) লোকের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিবাদ করবো না।[২]

দ্বীনের বিষয়ের সিদ্ধান্ত দ্বীনী বিষয়ে পারদর্শী ব্যক্তিদের উপর না ছেড়ে সাধারণ লোকদের অনুপ্রবেশ এই নিন্দিত বিবাদের শামিল।

রাসূল সা.এর শিক্ষা ও শিক্ষকতার আমল

রাসূল সা. ছিলেন একজন শিক্ষক। তবে কোন্ ধরনের শিক্ষক? বিষয়টি বুঝতে হলে আমাদের দেখতে হবে রাসূল সা. এর আগমনের পূর্বে ও পরে আরবের অবস্থা। তিনি মাত্র তেইশ বছর সময় পেয়েছিলেন। এই অল্প সময়েই তাঁর হাতে সোয়া লক্ষ ছাত্র গড়ে ওঠে। বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন হয়েছে। তা সত্ত্বেও বর্তমান বিশ্বেও এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া দুষ্কর। তাঁর শিক্ষা পেয়ে আরবের অসভ্য সমাজে যে বিপ্লব ঘটেছিলো, এর আগে বা পরের কোনো শিক্ষক বা আন্দোলনের নেতা দ্বারা তা সম্ভব হয়নি। সামাজিকতা, শিক্ষাদীক্ষা, রাজনীতি, যুদ্ধনীতিসহ সব দিক থেকে তাঁর শিক্ষার্থীরা ছিলো অগ্রসর। মূর্খতা দূর করার প্রতি উৎসাহ ও শিক্ষায়

---

[১] বুখারী, হাদীস ৫৯।

[২] বুখারী, হাদীস ৭০৫৬; মুসলিম শরীফ, হাদীস ১৭০৯/৪১।

অবহেলার প্রতি ভীতি প্রদর্শন রাসুল সা. এর শিক্ষাদান পদ্ধতি বর্তমানের ন্যায় প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক ছিলো না। বরং সমাজের প্রতিটি ঘর ছিলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। নিজেরা যা শিখতো অন্যদের তা শিখাতো। যা জানতো অন্যদের তা জানাতো। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবজা রা. বলেন, একদিন রাসূল সা. আমাদের নিয়ে আলোচনায় বসলেন। আল্লাহ্ তায়ালার প্রশংসার পর তিনি মুসলমানদের একটি দলের প্রশংসা করলেন। তারপর তিনি বলতে শুরু করলেন, মানুষের কী হয়েছে যে, তারা প্রতিবেশীকে শিক্ষা দিচ্ছে না! তাদেরকে উপদেশের দ্বারা সংশোধন করছে না![১]

শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তিনি পিতার ন্যায় স্নেহশীল ও দয়াশীল হতেন

রাসূল সা.-এর শিক্ষকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিলো, তিনি শিক্ষার্থীদের সামনে বিনয়ী হতেন। তাদের প্রতি স্নেহশীল থাকতেন। তা বোঝানোর জন্যই রাসূল সা. বলেছেন, আমি হচ্ছি তোমাদের সামনে পুত্রের জন্য পিতার ন্যায়। তাই আমি তোমাদের শেখাবো।[২]

এখানে পিতার সঙ্গে শিক্ষকের তুলনা সম্মানের দিক থেকে তিনি করেননি। বরং করেছেন দয়া ও স্নেহের দিক থেকে।

শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য অর্জনের প্রতি একাগ্রতা

দ্বীনী ইলমের উদ্দেশ্য কখনো শুধু পড়া নয়, বরং দ্বীনী প্রজ্ঞা তথা 'তাফাক্কুহ ফিদ্দীন' অর্জন করা। কুরআনের দাবী হলো, সর্বদা এমন জামাত থাকতে হবে যারা 'তাফাক্কুহ ফিদ্দীন' অর্জনের জন্য নিজেদের জীবনকে ওয়াকফ করে দেবে।

ইসলামে জিহাদের অনেক গুরুত্ব। জিহাদের সওয়াবের কোনো সীমা নেই। দ্বীনী প্রজ্ঞাসম্পন্ন আলেমে দ্বীন সকলেই এ ব্যাপারে একমত এবং অভিজ্ঞতাও একথার সাক্ষ্য দেয় যে, জিহাদ ও ইলম দ্বীনের দুটি ভিন্ন ভিন্ন চূড়া এবং দুটো কখনোই একসাথে আঞ্জাম দেয়া সম্ভব নয়। ইলম তো কেবল তখনই অর্জিত হতে পারে যখন এর সাথে অন্য কোনো ব্যস্ততা না থাকে। শিক্ষার্থীদের অন্তর জুড়ে থাকবে শুধু ইলমের প্রতি আগ্রহ ও ভালোবাসা। যখন সে নিজের সময়, শক্তি-সামর্থ্য, মেধা ও শ্রম পূর্ণরূপে ইলমের পেছনে ব্যয় করবে তখন হয়ত তার অল্প পরিমাণ ইলম অর্জিত হবে। 'তালিমুল মুতাআল্লিম' কিতাবে আছে- " তুমি যতক্ষণ না ইলমের জন্য তোমার সর্বস্ব দেবে, ইলম ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে কিছুই দেবে না।"

---

[১] তারগিব ও তারহিব

[২] সুনানে তিরমিজি

এই যখন অবস্থা, তখন তুমি যদি তোমার প্রতিটি সময় অন্যান্য কাজে খরচ করে ফেল তাহলে তুমি তো ইলমের ছায়াও দেখতে পাবে না। আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের বিধানাবলী শেখা ও বোঝাই আপনাদের কাজ।

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ

"প্রত্যেক বড় জামাত থেকে একদল লোক কেনো বের হয় না দ্বীনী প্রজ্ঞা অর্জনের জন্য?"

সাধনা ও একাগ্রতার সুফল

শাইখুল হিন্দ রহ. এসকল কাজ করেছেন শিক্ষাজীবন সমাপ্ত হওয়ার পর। শিক্ষা জীবনে শিক্ষার হক আদায় করেছেন। তখন জানতেনও না, রাজনীতি কী? আ বাইরের দুনিয়ায় কী কী ঘটছে? তাছাড়া শাইখুল হিন্দ রহ. হযরত মাওলানা কাসিম নানুতবী রহ.-এর নিকট সফরে সর্বাস্থায় ছিলেন। নানুতবী রহ.-এর মৃত্যুর পর হযরত মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ.-এর খেদমতে দু'বছর অতিবাহিত করেন। এ সব কাজ শেষ করার পর তিনি রাজনীতির ময়দানে অবতীর্ণ হন। তো ভাই! আল্লাহ তাআলা এই দ্বীন এবং এই ইলমের মধ্যে এই যোগ্যতা রেখেছেন, যারা নিজেদেরকে ইলম চর্চায় মশগুল রাখবে, আল্লাহ তাদের জন্য রাস্তা খুলে দেবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

"যারা পরিশ্রম করে আমার পথে, আমি অবশ্যই তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবো।"

তাই তো শাইখুল হিন্দ রহ.-কে ইমাম বানানো হয়েছে। অথচ শাইখুল হিন্দ রহ. সারা জীবনে ইতিপূর্বে কখনো রাজনীতি করেন নি। বলতে পারবেন না রাজনীতি কাকে বলে? গোটা জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন মাদরাসায় এবং খানকায়। কিন্তু যখন জিহাদের সময় এল, জিহাদের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করলেন এবং মানুষের সাথে মেলামেশা শুরু করলেন। তখন আল্লাহ তার জন্য রাজত্ব খুলে দিলেন।

রাসূল সা. শিক্ষার্থীদের বুদ্ধি ও মেধা অনুযায়ী শিক্ষা দিতেন

রাসূল সা. শিক্ষার্থীদের প্রত্যেকের বোঝ ও বুদ্ধির প্রতি খুব খেয়াল করতেন এবং সে অনুযায়ী তিনি শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিতেন। তিনি ছোটদের মন-মেজাজের প্রতি সদা সতর্ক থাকতেন। তাদের সামনে ওই বিষয়ের আলোচনা ওঠাতেন না, যা সর্বোচ্চ স্তরের শিক্ষার্থীদের সামনে আলোচনার যোগ্য। শিক্ষার্থীদের অবস্থা বিবেচনা করে তাঁর শিক্ষা দেয়ার চেষ্টা প্রসঙ্গে এসেছে, 'মজলিসে এক যুবক রাসূল সা.-কে প্রশ্ন করেন, রোজা রেখে স্ত্রীকে চুমু দেয়া যাবে? রাসূল তাকে নিষেধ করেন। ওই মজলিসেই এক বৃদ্ধ তাঁকে একই প্রশ্ন করেন। তখন তিনি

বলেন, হ্যাঁ, রোজা রেখে স্ত্রীকে চুমু দেয়া যাবে। তখন তারা পরস্পর চোখাচোখি শুরু করে। তখন রাসূল সা. বলেন, আমি তাকে অনুমতি দিয়েছি। কারণ, সে বৃদ্ধ। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। আর তুমি যুবক। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না।'[১]

সাহাবায়েকেরাম রাসূল সা. এর কাছে এসে উপদেশ নিতেন। রাসূল সা. প্রত্যেককে আলাদা আলাদা উপদেশ দিতেন। যেমন- একজন সাহাবী এসে নবী সা. এর কাছে জিহাদের বাইয়াত হতে চান। রাসূল সা. তাকে বলেন, তোমার পিতা-মাতা আছে? যদি থেকে থাকেন তাহলে গিয়ে তাদের সেবা করো।'

প্রশ্নের উত্তর যেভাবে লিখবেন

অতীতের ভুলের কথা, ফাঁকির কথা সম্পূর্ণ ভুলে যাওয়া। অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। অতীতের ভুলের পুরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সেদিকে সতর্ক থাকা। কিন্তু অতীতের ভুলের জন্যে অনুশোচনা না করা উচিত। প্রশ্ন পত্রের সাথে তোমার লেখা উত্তর যেন সামঞ্জস্যহীন না হয়। প্রশ্নের সাথে উত্তরের মিল থাকলেই পরীক্ষক তোমার যথার্থ মূল্যায়ন করবেন। এ বিষয়টা মনে রেখে উত্তর লেখা প্রয়োজন। ঠিক এভাবেই অতীতের সমস্ত ক্ষতি, সমস্ত ভুল, সমস্ত ফাঁকি, সমস্ত ভ্রান্তিকে পরিবর্তন করো তোমার সাফল্যের দ্বারা।

শিক্ষার্থীদের মেধাশক্তি খোলার জন্য বিভিন্ন প্রশ্ন করা

কখনো কখনো রাসূল সা. নিজে জানা সত্ত্বেও বাচ্চাদের সামনে নানা বিষয়ে প্রশ্ন ওঠাতেন। আর তাদের থেকে উত্তর জানতে চাইতেন। উদ্দেশ্য হতো তাদের ভেতর জানার কৌতূহল জাগানো। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বলেন, একদিন আমরা রাসূল সা. এর সামনে বসা ছিলাম। খেজুরের ভেতরের একটা অংশ নিয়ে আসা হলো, যা খাওয়া যায়। রাসূল সা. তা খেতে আরম্ভ করলেন এবং সবার সামনে প্রশ্ন করলেন, একটা সবুজ গাছ আছে, যার বরকত মুসলমানের ন্যায়। যে গাছের পাতা কখনো শুকায় না এবং ঝরেও পড়ে না। সর্বদা ফল দেয়। তোমরা বলো তো ওই গাছ কোনটি? তখন প্রত্যেকে বিভিন্ন উত্তর দেয়া শুরু করলো। ইবনে ওমর বলেন, আমার মনে হচ্ছিলো ওই গাছ হচ্ছে খেজুর গাছ। তাই আমি বলতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু সেখানে অনেক বয়স্ক লোকও ছিলো। আর আমি ছিলাম বাচ্চা।' সর্বশেষ ইবনে ওমরের ধারণাই সঠিক হলো। কেউ বলতে না পারায় রাসুল সা. নিজেই বলে দিলেন সেটা হচ্ছে খেজুর গাছ।'[২]

---

[১] মুসনাদে আহমদ
[২] বুখারী শরীফ।

প্রশ্নের উত্তর শিক্ষার্থীদের ওপর ছেড়ে দিয়ে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা

রাসূল সা. এর কাছে যত প্রশ্ন আসতো তিনি নিজে সব ক'টির উত্তর দিতেন না। কোনো কোনোটির উত্তর দেয়ার দায়িত্ব শিক্ষার্থীদের ওপর ছেড়ে দিতেন। উদ্দেশ্য ছিলো তাদেরকে দিয়ে বিষয়টির অনুশীলন করানো। যেমন এক সাহাবী এসে নবী সা. এর নিকট স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। সেখানে হযরত আবু বকর রা. উপস্থিত ছিলেন। হযরত আবু বকর রা. উত্তর দেয়ার জন্য অনুমতি চাইলেন। রাসূল সা. তাকে অনুমতি দিলেন। ব্যাখ্যা দেয়ার পর আবু বকর রা. রাসূল সা.-কে বলেন, হে রাসূল! আমার ব্যাখ্যা ঠিক হয়েছে? রাসূল সা. বলেন, 'কিছু ঠিক হয়েছে আর কিছু ভুল।'[১]

এ রকমভাবে রাসূল সা. এর কাছে যেসব মামলা আসতো, কখনো কখনো তিনি শিক্ষার্থীদের দ্বারা সিদ্ধান্ত করাতেন। উদ্দেশ্য থাকতো তাদেরকে এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেয়া।

জিজ্ঞেস করতে শৈথিল্য ও অবহেলা করা

আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত, অর্থ-সম্পদ সংক্রান্ত লেনদেন, পারস্পরিক ব্যবহার ও চরিত্র- এই যাবতীয় বিষয়েই রয়েছে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা, কিন্তু তা জানে ক'জন? যারা জানে না তাদেরই বা ক'জন এ সম্পর্কে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করে? হয়ত একটা ভুল বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করছে, সেই বিশ্বাসের উপর তার বছরের পর বছর কেটে যাচ্ছে, তাও কাউকে জিজ্ঞেস করে না বিশ্বাসটি সঠিক কি না। সেই বিশ্বাসটি শিরক ও কুফর পর্যায়েরও হতে পারে। একটু বিবেক-বুদ্ধি খাটালে সে সম্পর্কে অন্তরে খটকা লাগারই কথা। তা সত্ত্বেও দেখা যায় সেই বিশ্বাস নিয়ে কবরে যাচ্ছে, জীবনে একটিবারও কারো কাছে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার গুরুত্ব বোধ মনে করে না। নামাযীদের কথা বলি, নামায কতটুকু শুদ্ধ পড়ছে তাও কখনো যাচাই করে দেখে না। মসজিদে এসে দেখে ইমাম সাহেব রুকু থেকে উঠে সেজদায় যেতে উদ্যত। এক নামাযী নিজে-নিজে রুকু দিয়ে জামাতে শামিল হয়ে গেল এবং ইমামের সাথে একত্রে সালাম ফিরে নামায শেষ করল। আপনি তার পাশেই নামায পড়েছেন। রুকু আপনিও পাননি। ফলে সালামের পর আপনি আরেক রাকআত নিজে-নিজে পড়ে নিলেন। ওই লোক পাশেই তা দেখছে। কিন্তু একটি বার জিজ্ঞেস করছে না, তার নামায হলো কি না। এরকম ভাবে যাকাত, বাবা-মা ইন্তিকাল হয়ে গেল, মীরাছ বণ্টন করা ইত্যাদি। তাই কোনো প্রকৃত আলেমকে জিজ্ঞেস করে না তাদের চলাটা ঠিক হচ্ছে কি না। ফলে অজ্ঞানতার গভীর অন্ধকারেই তারা পড়ে থাকে। ভুল-

---

[১] বুখারী শরীফ।

ভ্রান্তি ও কুসংস্কারের ভেতর দিনাতিপাত করে আর মনে করে বেশ ধর্মজীবন যাপন করছে। এরাও তো কুরআন মাজীদের এই ইরশাদের মধ্যে পড়ে যায়-

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا .

"বলো, আমি কি তোমাদের সংবাদ দেব কর্মে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্তদের? তারা সেই সব লোক, পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা নষ্ট হয়ে যায়, অথচ তারা মনে করে যে, তারা উত্তম কাজ করছে।"[১]

এ ক্ষতি থেকে তাদের উদ্ধারের উপায় দ্বীন ও শরীআত সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান আহরণ করা আর সে লক্ষ্যে দ্বীন শিক্ষার এই অন্যতম প্রধান মাধ্যম (উলামায়ে কিরামের কাছে জিজ্ঞেস করা'কে) অবলম্বন করা।

এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামও স্বতঃস্ফূর্ত ভূমিকা রাখতে পারেন। তারা আপন-আপন স্থান থেকে মানুষের ভেতর এই বোধ চাপিয়ে দিতে পারেন যে, দ্বীন শেখার জন্য আলেমদের কাছে প্রশ্ন তাদের করতেই হবে। ভুলের উপর থাকা চলবে না। প্রকৃত মুমিন ও মুসলিম হতে হলে দ্বীনের শুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করতেই হবে আর তার এক প্রকৃষ্ট মাধ্যম হচ্ছে প্রশ্ন করা।

দ্বীন ইসলাম শিক্ষায় জিজ্ঞাসার গুরুত্ব

ইসলামী প্রকাশনা শিল্পের ক্রমবিস্তার আমাদের মনে বেশ আশার সঞ্চার করছে। অনেকেই দ্বীনী বই-পুস্তক কিনছে। দ্বীন সম্পর্কে জানার আগ্রহ বাড়ছে। নতুন-নতুন পাঠক সৃষ্টি হচ্ছে। অংকের হিসাবে বলা যায় একটা বড় পাঠকমহল গড়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে নানা-আংগিকে দ্বীনের আলোচনাও চলছে। ওয়াজ-মাহফিলের পরিমাণ বাড়ছে। তাবলীগ জামাতের মাধ্যমেও প্রচুর দ্বীনী কাজ হচ্ছে। মসজিদসমূহে জুমুআর দিন বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার পরিমাণ আগের তুলনায় অনেক বাড়ছে। জুমুআ ছাড়াও বিভিন্ন উপলক্ষে দ্বীনী আলোচনা হচ্ছে। ঘরোয়া পরিবেশেও আলোচনা হচ্ছে। হক্কানী পীর মাশায়েখের সংখ্যাও এখন আগের তুলনায় অনেক বেশি। পীর-মুরীদির ধারায়ও দ্বীনের আলোচনা হচ্ছে এবং এভাবেও লোকজন দ্বীন শিখছে। নিঃসন্দেহে এসব এ যুগের এক লক্ষণীয় দিক। দ্বীনের প্রচার-প্রসার ও দ্বীনী শিক্ষার বিস্তারে এ সবগুলোরই ভূমিকা সাধুবাদ পাওয়ার উপযুক্ত।

এসব মাধ্যমে যারা দ্বীন শিখছে তারা সমাজের কত শতাংশ? যারা এখনও পর্যন্ত এর আওতায় আসেনি, তারা কত শতাংশ? নিশ্চয়ই পার্থক্যটা অনেক বড়।

---

[১] সূরা কাহ্ফ : ১০৩ ও ১০৪।

সমাজের সিংহভাগ মানুষই এমন, যারা এসব মাধ্যমের কোনোও একটির ধরা ছোঁয়াকে কবুল করেনি। তারাও মুসলিম। অন্তত পক্ষে নিজেদের সেই পরিচয়ই দিয়ে থাকে। সেই পরিচয়ের কারণে হয়ত বা জুমুআর নামায পড়ে। ঈদের মাঠে আসে। জানাযায় অংশ গ্রহণ করে এবং এরকম আরও কিছু ইসলামী লক্ষণীয় আলামত আলগোছে ধরে রেখেছে। তারা ইসলাম সম্পর্কে বলা যায় কিছুই জানে না। আকীদা-বিশ্বাসের কোনো খবর নেই। মুমিন হতে হলে কী বিশ্বাস রাখতে হয় সে নিয়ে তাদের চিন্তা নেই। কি-কি কারণে ঈমান নষ্ট হয়ে যায় তা তাদের ভাবনায়ই আসে না।

এই সর্ববিস্তৃত অজ্ঞতার কারণ কী? কারণ তো এই যে, অজ্ঞতা এক কঠিন ব্যাধি। এ ব্যাধি নিরাময়েরও ওষুধ আছে। কিন্তু যারা এতে আক্রান্ত তারা নিজেদের রোগী মনে করছে না। তারা যে রোগী সেই বোধ তাদের নেই। আর বোধ নেই বলে নিরাময়ের কথা ভাবছে না এবং ওষুধ সেবনের চিন্তা করছে না।

ওষুধ সেবনের চিন্তা করত, যদি নিজেদের রোগী ভাবতে পারত। তাই এখন বড় দরকার তাদের মধ্যে রোগ সচেতনতা সৃষ্টি করার। অজ্ঞতা যে তাদের কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে, তাদের ঈমান-আমল ধ্বংস করছে, তাদের মানবিকতা ধ্বংস করছে এবং মানুষ হিসেবে তাদের জন্ম গ্রহণ ব্যর্থ করে দিচ্ছে- সেই চেতনা ও অনুভূতি তাদের মধ্যে জাগ্রত করা ছাড়া এই মহাব্যধির চিকিৎসা সম্ভব নয়।

এর পাশাপাশি দরকার ওষুধ সরবরাহ করা এবং তা সেবনে তাদের উদ্বুদ্ধ করা। তা অজ্ঞতা নামক ব্যাধি নিরাময়ের কী উপায়? উপায় মূলত তিনটি-

❖ উলামায়ে কিরামের কাছে দ্বীন ও শরীআত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা;

❖ দ্বীনী রচনাবলী পাঠ করা। ❖ উলামা-মাশায়েখের সাহচর্য গ্রহণ করা।

এ বিষয়ে কুরআন মাজীদে নির্দেশ দেয়া হয়েছে-

فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"তোমাদের জানা না থাকলে জ্ঞানীজনকে জিজ্ঞেস কর।"[১]

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ "অজ্ঞতার দাওয়াই তো জিজ্ঞেস করা।"[২]

কিন্তু এ দাওয়াই আজ চরমভাবে অবহেলিত। অধিকাংশ মানুষই এটি ব্যবহার করে না আবার যারা ব্যবহার করে তাদেরও অধিকাংশ ভুল ব্যবহার করে। অর্থাৎ এ ব্যাপারে দু'রকম প্রান্তিকতাই বিদ্যমান। হয় এর প্রতি শৈথিল্য করা হয়, নয়ত করা হয় সীমালংঘন।

---

[১] সূরা নাহল : ৪৩; সূরা আম্বিয়া : ৭

[২] মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৩০৫৫; আবু দাউদ, হাদীস ৩৩৬।

জিজ্ঞেস করতে লজ্জা যেন বাঁধা না হয়

অনেকেই জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করে। এ লজ্জা পরিত্যাজ্য। যে লজ্জা মানুষকে দ্বীন শেখা হতে বঞ্চিত রাখে প্রকৃত পক্ষে তা লজ্জাই নয়। তা ভীরুতা, পলায়নপরতা ও জড়ত্ব। একে যে প্রশ্রয় দেয় সে চির অজ্ঞ হয়েই থাকে। নিঃসন্দেহে লজ্জাশীলতা এক প্রশংসনীয় গুণ এবং তা ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গও বটে, কিন্তু যে লজ্জা মানুষকে অজ্ঞ করে রাখে, তা অতি নিন্দনীয়। তা ঘৃণাভরে ঝেড়ে ফেলা উচিত। লজ্জা নারীর ভূষণ' বলে একটা কথা আছে, যদিও প্রকৃতপক্ষে তা নর-নারী নির্বিশেষে প্রত্যেক মুমিনের ভূষণ, সেই লজ্জাকে দ্বীন শেখার ক্ষেত্রে নয়। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বলেন-

نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّيْنِ.

"আনসারী নারীগণ কতই না ভালো। দ্বীনের জ্ঞানার্জনে লজ্জা তাদের বাধা দিতে পারেনি।"[১]

এ প্রশংসার কারণ তারা একান্ত নারী সংক্রান্ত বিষয়েও নবীজীর কাছে মাসয়ালা জিজ্ঞেস করতেন। তিনিও পরম মমত্বের সাথে তাদের তা বুঝে দিতেন। সাধারণভাবে সাহাবায়েকিরামের নীতি এটাই ছিল যে, তারা দ্বীনী বিষয়ে নবীজীকে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করতেন না। তাঁর মৃত্যুর পর তারা পরস্পর একে অন্যকে জিজ্ঞেস করতেন। বহু মাসয়ালায় তারা উম্মাহা তুল-মুমিনীনের শরণাপন্ন হয়েছেন। হযরত আয়েশা রা.-এর কাছে তো তারা অনেক বিষয়েই জিজ্ঞেস করেছেন, এমন কি যাকে লজ্জার মনে করা হয়ে থাকে এমন বিষয়েও। বস্তুত এটাই নিয়ম। আমার যে বিষয় জানা নেই তা যে ব্যক্তি জানে তার কাছে জিজ্ঞেস করতে সংকুচবোধ কেনো করবো? অজ্ঞতা তো কিছু গৌরবের বিষয় নয় যে, লজ্জাকে প্রশ্রয় দিয়ে তা ধরে রাখতে হবে! জ্ঞানস্পৃহা তো মানুষের স্বভাবগত। অবাঞ্ছিত লজ্জাকেই পরিষ্কার করতে হবে, জ্ঞানাহরণ থেকে পিছে থাকার সুযোগ নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি দ্বীন ও শরীআত সম্পর্কে ভালো জানে অসংকুচে তার কাছে নিজ অজানা বিষয়ে জিজ্ঞেস করা চাই।

কাকে জিজ্ঞেস করবে?

হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করতে হবে যথার্থ জ্ঞানীজনকেই। এ ব্যাপারেও মারাত্মক শিথিলতা লক্ষ করা যায়। ব্যস টুপি-দাড়ি থাকলেই তাকে মৌলভী সাহেব মনে করা হয়। এটা যেন মৌলভী হওয়ার নিদর্শন। ইসলামে মৌলভী সাহেবের জন্য তো আলাদা কোনো পোশাক ও পৃথক কোনো বেশ-ভূষা নেই। নেক বান্দাদের

---

[১] মুসলিম শরীফ, হাদীস ৩২২, ৩৩২; আবু দাউদ, হাদীস ৬৪২।

পছন্দের পোশাক ধর্মের পছন্দনীয় হওয়া উচিত। উলামা-মাশায়েখ যে লেবাস ব্যবহার করেন, তা যদি কেউ ভালোবাসে সে ধন্যবাদার্হ। কিন্তু তাই বলে সে আলেম হয়ে যায় না। তাকে আলেম মনে করা উচিত না। কিন্তু সমাজ তাই মনে করছে। টুপি-দাড়ি থাকলেই তাকে হুজুর ডাকছে এবং তার কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করছে। একটু খোঁজ খবর নেয়ার প্রয়োজন বোধ করছে না যে, আসলেই সে আলেম কি না। আবার সেই লোকও কম যায় না। প্রশ্ন করা হচ্ছে দেখে নিজের প্রকৃত অবস্থান যেন ভুলে যায়। মনে মনে নিজেকে আলেমের মসনদে বসে উত্তর দিয়ে দেয়। এ জাতীয় লোকদের অনেক উত্তর আমার সরাসরি নিজ কানেই শোনা আছে। তা রীতিমত ভয়ংকর, দুঃখজনক ও কলঙ্কজনক।

এটা তো হাতুড়ে ডাক্তার দ্বারা জটিল রোগের চিকিৎসা করানোর চেয়ে কম আত্মঘাতী নয়। এরচেয়ে বড় ক্ষতি আর কী হতে পারে! ইদানীং অবশ্য হাতুড়ে ডাক্তার দেখানোর প্রবণতা অনেক কমে গেছে। কিন্তু বে-এলেম আবেদের কাছে জিজ্ঞাসার প্রবণতায় কম পরিলক্ষিত হয় না। সত্যিকারের আবেদ হলেও না হয় কথা ছিল। জিজ্ঞেস করা হয় কেবলই বাহ্যিক পোশাক দেখে। দ্বীনী বিষয় যাকে তাকে জিজ্ঞেস করা উচিত নয়।

আল্লাহ বলেছেন - "তোমার জানা না থাকলে জ্ঞানীজনকে জিজ্ঞেস কর।"[১]

সুতরাং দ্বীন সম্পর্কে যার ভালো জানা আছে জিজ্ঞেস তাকেই করতে হবে।

এক্ষেত্রে কেবল সনদ ও সার্টিফিকেট থাকাই যথেষ্ট নয়। চর্চায় নিয়োজিত আছে কি না তাও লক্ষ রাখা উচিত। সেই সঙ্গে তাকওয়া-পরহেযগারীও। জিজ্ঞেস যখন দ্বীন সম্পর্কে তখন দ্বীনদার আলেমকেই সন্ধান করা উচিত। আমি যা জানতে চাই তার উপর আমার আখেরাতের মুক্তি নির্ভর করে। আমি তার কাছে চাই মুক্তির পথ জানতে, কিন্তু অজ্ঞতাবশত সে যে পথ দেখাল তা মুক্তির নয়; বরং ধ্বংসের পথ। তাই সতর্কতা জরুরি। জিজ্ঞেসও অবশ্যই করতে হবে এবং সে জন্য উপযুক্ত লোকেরও সন্ধান করতে হবে। সন্ধান করলে পাওয়াও অবশ্যই যাবে। হয়ত খানিকটা সময় দিতে হবে। একটু পথ চলতে হবে, কিন্তু উদ্দেশ্য যখন নিজ দ্বীনের হেফাজত ও আখেরাতের মুক্তি, তখন এতটুকু কষ্ট তো করতেই হবে। আল্লামা ইবনে সীরীন রহ. বলেছেন -এই ইলম তো দ্বীন, সুতরাং লক্ষ করে দেখ, কার নিকট থেকে নিজ দ্বীন নিচ্ছ।[২]

---

[১] সূরা নাহল : ৪৩।

[২] মুসলিম শরীফ; দারেমী, বর্ণনা ৩৯৯; মারিফাতুস সুনানি ওয়াল আছার, বর্ণনা ১৫৩।

শিক্ষার্থী ও আলেমগণ জিজ্ঞাসা করা থেকে অমুখাপেক্ষী নয়

জিজ্ঞাসাকে জ্ঞানাহরণের মাধ্যম বলেছেন তা সর্বাপেক্ষা বেশি বানানো উচিত ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকার। সত্যিকারের উলামাও প্রকৃতপক্ষে তলাবাই। ছাত্র-ছাত্রী অর্থ যখন জ্ঞানের সন্ধানী, তখন জিজ্ঞাসা অর্থাৎ জানার ইচ্ছা তো তার মজ্জাগতই থাকবে। তার শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, প্রতিটি লোমকূপে উঠবে অদম্য কৌতূহলের আকুলতা। সেই আকুলতা নিবারণের জন্য সে জিজ্ঞাসার আশ্রয় নেবে। জিজ্ঞাসা' শব্দটিকে সচেতনভাবেই ব্যবহার করছি। প্রশ্ন অপেক্ষা এ শব্দটিই আলোচ্য বিষয়ের পক্ষে বেশি ব্যঞ্জনাময়। আমার বড় ভালোবাসার শব্দ এটি। এর ঝঙ্কার বাজুক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অন্তরে। আজ এর বড় অভাব দেখি। এক শিক্ষার্থী যেন আরেক শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করে। এরূপ লজ্জাশ্রয়ী শিক্ষার্থী রাজ্য কিভাবে বিচরণ করতে পারে। জিজ্ঞাসায় সপ্রতিভা থাকাই তো হওয়া উচিত শিক্ষার্থীর শান। এই শান যে অবলম্বন করতে পারবে সম্ভাবনা ও সামর্থ্যের উচ্চতায় সে না পৌঁছে যায় না। খুব সম্ভব ইমাম আবূ হানীফা রহ. আসহাবিহী- সম্পর্কে কোথাও পড়েছিলাম, তাঁর জ্ঞানের সাগর হয়ে ওঠার উপায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, আমি যা জানি না, সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে কখনও লজ্জাবোধ করিনি। একই রকম জিজ্ঞাসার উত্তরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেছিলেন, জিজ্ঞাসা প্রিয় রসনা ও বোঝ অন্তঃকরণের কারণেই যা কিছু শিখেছি। আমি যত বড় আলেম দেখেছি তাদের সকলকেই এ ব্যাপারে স্বচ্ছন্দ ও অনাড়ষ্ঠ পেয়েছি। আর নিঃসন্দেহে তাদের বড় হয়ে ওঠার পেছনে এ গুণের অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে। সুতরাং জ্ঞানের রাজ্যে যারা অবাধ বিচরণ করতে চায়, তাদের এ গুণ অর্জন করতেই হবে। দ্বীনের স্বচ্ছ ও গভীর জ্ঞানার্জন যাদের লক্ষ্য তাদের এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শনের কোনো অবকাশ নেই। এর মাধ্যমে তারা পারে অন্যের সাধনালব্ধ জ্ঞানের অংশীদার হতে। অন্যের কাছে প্রশ্ন করা ও মতবিনিময়ের দ্বারা বিষয়ের আগাপাছতলা পরিস্ফুট হয়, দৃষ্টি প্রসারিত হয় এবং অচিন্তিত দিকের দ্বারোন্মোচন হয়। এত বড় উপকারী জিনিসকে অবহেলা করা যায়, না করা উচিত? তা ছাড়া প্রশ্ন করা যায় আপন মনেও। অন্যের কাছে জিজ্ঞাসার আগে নিজে নিজে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সকল দিকে দৃষ্টি দিলে আপন মনে প্রশ্ন তুলে তার উত্তর খুঁজতে থাকলে বিষয়টির প্রসার ও গভীরতার সন্ধান পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীর চাহিদা'-এর সেটাই তো প্রথম যাত্রা। অগ্রযাত্রাকে সচল রাখার পক্ষে যে প্রাণশক্তি দরকার এ কৌতূহল দ্বারাই তা অর্জিত হতে পারে।

ভালো শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করা

কখনো কখনো রাসূল সা. সাহাবাদের পরীক্ষা নিতেন। কোনো একটি বিষয়ে প্রশ্ন করে মেধা ও জ্ঞান যাচাই করতেন। কেউ সঠিক উত্তর দিলে তিনি তার প্রশংসা করতেন, বুকে হাত মেরে 'শাবাশ!' বলতেন। এর দ্বারা তিনি তার সঠিক উত্তরের সম্মাননা দিতেন। এবং বুঝাতেন যে, সঠিক উত্তর দ্বারা সে রাসূল সা. এর ভালোবাসার পাত্রে পরিণত হয়েছে। যেমন হযরত উবাই ইবনে কা'বকে রাসূল সা. জিজ্ঞেস করেন, আল কুরআনে কোন আয়াতটি সবচেয়ে ফজিলতপূর্ণ? প্রথমে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল ভালো জানেন। রাসূল সা. আবার তাকে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বলেন 'আয়াতুল কুরসি'। তখন রাসূল সা. তার বুকে হাত রেখে বলেন, 'শাবাশ!'। আল্লাহ তায়ালা তোমার জন্য ইলম অর্জন সহজ করুন।'[১]

কখনো কখনো রাগ করা ঃ রাসূল সা. যেমন স্নেহশীল ও দয়ালু ছিলেন তেমনি তিনি কখনো শিক্ষার্থীদের প্রতি রাগ করতেন। যেমন একবার তিনি বের হয়ে দেখেন সাহাবারা তাকদির নিয়ে তর্ক করছে। তখন তিনি খুব রাগান্বিত হয়ে বলেন, তোমাদেরকে এজন্য দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে?

সারকথা- রাসূল সা. ছিলেন, একজন আদর্শ শিক্ষক। শিক্ষার্থীদের প্রতি স্নেহ-ভালোবাসার পাশাপাশি তিনি তাদেরকে আদব শিখাতেন। এ জন্য কখনো রাগ করতেন। তাঁর শিক্ষা হতো ব্যাপক বিষয়ে। আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির বিষয়গুলোও তাঁর শিক্ষাদানে ছিলো।

মাদরাসার শিক্ষার্থীদের প্রতি জরুরি উপদেশ

আল্লামা আশরাফ আলী থানভী রহ. লিখেছেন- যদি কোনো শিক্ষার্থী তিনটি কাজ পাবন্দির সাথে করে তাহলে তার কিতাব সহজে বুঝে আসবে। ইবারত যদি হুবহু মনে নাও থাকে তবুও তার কিতাব বোঝার মত যোগ্যতা তৈরি হবে।

আপনি কিতাব পড়লেন, বুঝে পড়লেন, কিন্তু পরে তা মনে থাকল না, ভুলে গেলেন। এই ভোলা কিন্তু ভোলা নয়। পঠিত বিষয় মানুষের মনের কুণে পড়ে থাকে। সময়মত তা মনে পড়ে যায়। প্রয়োজনের সময় তা মনে এসে যায়। অনেক তালিবে ইলম চিন্তায় থাকে, আমি পড়ি কিন্তু মনে থাকে না, ভুলে যাই। হযরত সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন, এই ভুলে যাওয়াতে সমস্যা নেই। সময়মত তা মনে পড়বে। শর্ত হলো, তিনটি কাজ গুরুত্বের সাথে করতে হবে।

---

[১] মুসলিম শরীফ।

প্রথম কাজ মুতালাআ করা - আগামীকাল দরসে যে সবক পড়া হবে তা দরসে যাওয়ার আগেই একবার দেখে যাবে। এই কাজটিকে আমরা 'মুতালাআ' বলি। 'মুতালাআ' করার এই সুন্দর নিয়ম এখন প্রায় শেষই হয়ে যাচ্ছে।

'মুতালাআ' করার সময় কী হয়? : 'মুতালাআ'র সময় মালুমাত আর মাজহুলাতের মাঝে ইমতিয়ায হয়। এটি মুতালাআর একটি বড় ফায়েদা। যেমন আপনি হেদায়া কিতাব পড়ছেন, বলা যায়, হেদায়া, কুদূরীর শরাহ। কুদূরী তো আপনি পড়েছেন। কুদূরীর যে মাসআলা আপনার পড়া আছে তা তো পড়া আছেই। এখন নতুন যে কথা হেদায়ায় আসছে, নতুন যে ইবারত ও দলীল আসছে তা আপনার বোঝা বাকি। তো মুতালাআর সময় প্রথমেই ধরা পড়বে যে, এই অংশ আমার জানা আর এই অংশ আমার জানা নেই। কিতাবের এই অংশ আমি বুঝেছি আর এই অংশ আমি বুঝিনি। মালুমাত আর মাজহুলাতে মাঝে পার্থক্য। এটা মুতালার ফায়দা হয়।

প্রত্যেক বিষয় এমনকি প্রত্যেক কিতাব অধ্যয়ন করার পদ্ধতি কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন হয়। নাহু-সরফের কিতাবের অধ্যয়ন পদ্ধতি ভিন্ন হবে। ইবতেদায়ী মারহালার কিতাবের অধ্যয়ন এক ধরনের হবে আর উপরের স্তরের অধ্যয়ন আরেক ধরনের হবে। অধ্যয়নের সময় আপনাকে দুটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রথম বিষয় হলো, ইবারত শুদ্ধ করে পড়া; আপনি এ'রাব কী দিচ্ছেন এবং কেনো দিচ্ছেন? ফে'ল দিয়ে বাক্য শুরু করেছেন তো ফায়েল কোথায়? এটা আপনাকে ঠিক করতে হবে। যদি جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয় তাহলে এই اِسْمٌ টি مُبْتَدَأٌ, তো এর خَبَرٌ কোথায়। যদি এক সপ্তাহ কেউ এভাবে মেহনত করে তাহলে তার এবারত ঠিক হয়ে যাবে।

হযরত মাওলানা সিদ্দিক আহমদ বান্দূবী রহ. বলেছেন, নাহু-সরফে যদি অনেক বেশি দক্ষতা না-ও থাকে তবুও পদ্ধতিমত মেহনত করলে পনের দিনে এবারত শুদ্ধ করা সম্ভব। এক লাইন এবারত নিন। প্রথম كَلِمَةٌ টি فِعْلٌ। তো চিন্তা করুন এটি ثُلَاثِي না رُبَاعِي مُجَرَّد না مُزِيْد فِيْه? এটি সাত প্রকারের কোন্ প্রকার- صَحِيْحٌ/مَهْمُوْزٌ/مُعْتَلٌّ নাকি مُضَاعَفٌ? কোনটি? এখানে কোনো تَعْلِيْلٌ হয়েছে না হয়নি? বেশি নয়, এভাবে দুই-তিন শব্দ নিয়ে চিন্তা করুন। এটি صَرْفِي اِعْتِبَار (ছরফদের দৃষ্টিকোণ থেকে) এ চিন্তা করা হলো। এখন, نَحْوِي اِعْتِبَار (নাহভদের দৃষ্টিকোণ থেকে) চিন্তা করুন যে, إِعْرَاب কী পড়া হবে?

কেনো পড়া হবে? এটি কি فِعْل না فَاعِل নাمفعول ? مَجْهُوْل فِعْل হলে نَائِب

الْفَاعِل কোথায়? كَانَ এসে থাকলে তা কী আমল করছে।

নছব প্রদানকারী হরফ এসে থাকলে তা কীভাবে আমল করছে। এভাবে চিন্তা করে পড়ুন। কাজটি বেশি কঠিন নয়। যদি প্রতিদিন দশ মিনিট সময় দেয়া হয় তাহলে এক সপ্তাহে এসকল বিষয় চিন্তা করা সম্ভব। এভাবে মেহনত করতে থাকলে আপনার এবারত পড়া ঠিক হয়ে যাবে।

এবারত শুদ্ধ পড়ার পর করণীয় হলো, বিষয়ের দিক থেকে চিন্তা করা যে, কিতাবের আলোচ্য অংশের এইটুকু আমি বুঝেছি আর সামনের অংশ আমার জন্য নতুন। এর কিছু তো আমি বুঝেছি, কিছু বুঝিনি। তো যতটুকু আপনার পক্ষে বোঝা সম্ভব, আপনি তা বোঝার চেষ্টা করুন।

দ্বিতীয় কাজ : দরসে উপস্থিত থাকা - প্রথম কাজ হলো, অধ্যয়ন করা। দ্বিতীয় বিষয় হলো, দরসে উপস্থিতি। পূর্ণ মনোযোগের সাথে দরসে উপস্থিত থাকা। এমন যেন না হয় যে, আমি এখানে বসে আছি আর আমার মন পড়ে আছে অন্য কোথাও। এই যে মোবাইল, এটা এত মারাত্মক যে, যখন মোবাইল দেখে কেবল সেই সময়টুকু নষ্ট হয় এমন নয়; বরং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এর প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে। হযরত থানভী রহ. বলেন, কোনো কোনো কবীরা গুনাহ অন্যসব কবীরা গুনাহ থেকে মারাত্মক হয়। এই যে চোখের গুনাহ, এটা কিন্তু মারাত্মক, অথচ কখনো তা ছোটও হয়ে থাকে। কখনও চোখের গুনাহ ছোট গুনাহ হয় কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া হয় মারাত্মক। বারবার তার কথা মনে পড়তে থাকে। হৃদয়-মনকে তা আচ্ছন্ন করে ফেলে, কলুষিত করে ফেলে। রাতে মোবাইলে কিছু দেখেছিল এখন পাঠে বসে সে কথা মনে পড়ছে। পাঠে মনোযোগ দিতে পারছে না। মোবাইলের প্রতিক্রিয়া দীর্ঘস্থায়ী। এটি বিষতুল্য। আপনার উস্তায আপনাকে কতক্ষণ দেখে রাখবে? আপনার বাবা আপনাকে কতক্ষণ দেখে রাখবে? শেষে আপনার নিজেরই ক্ষতি। মোবাইল থেকে বেঁচে থাকুন।

দ্বিতীয় বিষয় হলো- দিল-দেমাগ হাজির রেখে পড়তে বসা। দরসে উপস্থিত থাকা। সবক মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং বুঝবে। বুঝে না এলে উস্তাযকে প্রশ্ন করবে। কিন্তু তা করতে হবে আদবের সাথে। যদি তিনি না বলে অন্য প্রসঙ্গে চলে যান কিংবা তখন না বলতে চান তাহলে আদব হলো, তখন না জিজ্ঞাসা করে অন্য সময় জিজ্ঞাসা করবে। পরের দিন জিজ্ঞাসা করবে। দ্বিতীয়ত উস্তাযকে পেরেশান করার জন্য জিজ্ঞাসা করবেন না। যেমন, উস্তায একটি কথা বলল, আর তালিবে ইলম বলে উঠল, হাশিয়াতে বা শরহাতে এমন লেখা আছে। এটি এক ধরনের বেআদবি। এর দ্বারা আপনি ইলম থেকে মাহরূম হয়ে যাবেন।

উস্তাযও মানুষ। মানুষ হিসেবে তার ভুল হতেই পারে। কিন্তু সে কারণে আপনি তার সাথে বেআদবি করতে পারেন না। বলতে হলে আপনি আদবের সাথে বলুন, বিনয়ের সাথে বলুন যে, হযরত এ কথাটি বুঝে আসছে না। যদি মনে করেন যে, উস্তাযের এ বিষয়টি মুতায়ালায় আসেনি এখন জিজ্ঞাসা না করে, পরে একাকী তাঁর কাছে গিয়ে আদব ও তাওয়াযুর প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রেখে বলুন, হযরত আপনি তো এমন বলেছেন আর অমুক কিতাবে বা শরহে এমন লিখেছে। এমন তো নয় যে, আমি ভুল বুঝেছি। সর্বদা ভদ্রতার প্রতি লক্ষ্য রাখা চাই।

কোনো কোনো মেধাবী শিক্ষার্থী উস্তাযের সামনে বড়াই করে, নিজের যোগ্যতা যাহির করে। খবরদার মেধা দিয়ে, যোগ্যতা দিয়ে, কিছু অধ্যয়নের দ্বারা দিয়ে কিছু হবে না। যোগ্যতার কারণে যদি উস্তাযকে খাটো চোখে দেখে তাহলে এটাই মাহরূমের জন্য যথেষ্ট।

শিক্ষার্থীদের প্রতি শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামার নসীহত

দ্বীনী মাদরাসার সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীদের আরবী ভাষার ব্যাপারে গুরুত্বশীল হতে হবে। গুরুত্বের সাথে আরবী ভাষা শিখতে হবে। আরবী বিষয়গুলো আরবীতেই পাঠদান করতে হবে। শায়েখ কিছু কিতাব ও উচ্চ মারহালার শিক্ষার্থীদের পাঠদানের পদ্ধতি জানতে চাইলেন। যখন বলা হলো যে, তা বাংলায় পড়ানো হয়। তখন শায়েখ হাফিযাহুল্লাহ বললেন,'এটা হয় কীভাবে?' এরপর তিনি বললেন, 'আমি সবসময় হিন্দুস্তান এবং বাংলাদেশের আলেমদের বলি, যেন উচ্চ মারহালার আরবী বিষয়গুলো আরবীতেই পড়ানো হয়। তাদরীস যেন আরবীতে হয়। বেশি বেশি করে যেন আরবী পরিভাষা ব্যবহার করা হয়। কেনোনা মূল ইলম হচ্ছে আরবী; কুরআন আরবী, হাদীস আরবী; ইংরেজি, বাংলা বা উর্দূতে নয়। আমি এই ভাষাগুলোকে ছোট করে দেখছি না। নিজ নিজ ভাষায় আলেমদের অবশ্যই যোগ্যতা অর্জন করতে হবে, দক্ষ হতে হবে। তবে কুরআন-হাদীসের ভাষা, মাছাদের মারাজে' বা মূল তথ্যসূত্রের ভাষা যেহেতু আরবী, তাই আরবী ভাষাটা ভালোভাবে শিখতে হবে। এই ভাষায় যেন ভাবটা প্রকাশ করা যায়, আরবী কেউ বললে তা সহজে বুঝা যায় এবং দরস প্রদানের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুটি আরবীতে প্রকাশ করা যায়- কমসেকম এতটুকু যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। তিনি উচ্চস্তরে কী কী কিতাব রয়েছে তা শুনতে চান। এরপর যখন জানতে পারেন- এগুলোর বাংলা অনুবাদ রয়েছে, তখন তিনি বলেন, এটা বিরাট ভুল। এর মাধ্যমে এসকল কিতাব পড়ানোর পদ্ধতি মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়। এর মাধ্যমে এসকল কিতাবের রং ও চাহিদা হারিয়ে যায়। তাই এজাতীয় কিতাবের অনুবাদ না হওয়াই উত্তম।

আরবী কিতাবগুলো যথাসম্ভব আরবীতেই পাঠদানের আহ্বান জানাচ্ছি। আরবী ভাষায় বলা ও লেখায় পারদর্শী কিছু আলেম তৈরি হোক- সেই প্রত্যাশা করছি।

তালিবুল ইলম হাদীসের কিতাব পড়বে অথচ একটি হাদীসও হিফয করবে না- এটা বড় দুঃখজনক। তিনি বলেন, হিফযুল হাদীস ওয়ালআছার খুবই জরুরি। উলামায়ে কেরামের উচিত প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের الأربعون النووية (নবীজীর চল্লিশ হাদীস) কিতাবটি হিফয করানো। এরপর রিয়াদুস সালেহীন মুখস্থ করাবে। তিনি বলেন, একজন তালিবুল ইলমকে অন্তত পক্ষে রিয়াদুস সালেহীন মুখস্থ করা উচিত। এরপর যারা বেশি মেধার অধিকারী তাদেরকে বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ এবং সিহাহ্ সত্তাহ হিফয করতে দেয়া উচিত। উলামায়েকেরাম যেন এ ব্যাপারে উদ্যোগী হন। প্রত্যেক মাদরাসায় যেন কয়েকজন উস্তায দায়িত্ব নিয়ে এ খেদমতের তদারকি করেন এবং তালিবুল ইলমদেরকে হিফযুল হাদীসের জন্য উৎসাহ প্রদান করেন। গুরুত্বের সাথে হিফযুল হাদীসের বিষয়টি বাস্তবায়নের জন্য আলেমদের আহ্বান জানাচ্ছি।

ফিকহ পড়ার জন্যও হাদীসের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। উলূমুল হাদীসের বিষয়গুলোর ব্যাপারে ধারণা থাকা অপরিহার্য।

দাওরায়ে হাদীসের সমস্ত কিতাবগুলো পড়ানো হয় ফিকহী নিয়মে।

বর্তমান সময়ে যে অবস্থা চলছে, সহীহ-যঈফ বলে বলে মানুষকে যেভাবে বিভক্ত করা হচ্ছে, এমতাবস্থায় উলূমুল হাদীস বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রতিটি তালিবুল ইলমের জন্য অত্যন্ত অপরিহার্য বিষয়। রাবির অবস্থা, বিবরণ, হাদীসের মান, হাদীসের কিতাব বিষয়ে সার্বিক ধারণা প্রত্যেকেরই থাকতে হবে।

সকল তালিবুল ইলমকে দ্বীনের গভীরতা অর্জনে আরবী ভাষা শিখতে হবে।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনটি পরামর্শ

প্রথমত, নিজের মর্যাদা ও উদ্দেশ্যকে ভালোভাবে জানুন। এখনও যদি নিয়ত ও উদ্দেশ্যের ব্যাপারে আপনার চিন্তা সুস্পষ্ট না হয় তাহলে এখনই তা শুদ্ধ করে নিন। একাকী বসে ভাবুন, আপনি এখানে কেনো এসেছেন? আপনি কে? আপনি যে ইলম শিখছেন-এর মর্যাদা কী? এটাই আপনাদের সর্বোত্তম। স্বাগ্রহে এবং মনোযোগের সঙ্গে পড়ুন। এটাই ইলমে দীনের কদর ও হক। এছাড়া না কেউ কিছু অর্জন করেছে, না করতে পারবে। না কিছু লাভ করতে সক্ষম হয়েছে, না হবে। যে ইলম আপনি অর্জন করছেন, সে অনুযায়ী আমল করুন। জীবনকে সে মতে পরিচালনা করুন। তাকওয়া অর্জন করুন। তাকওয়ার সঙ্গে ইলম হলো আলো। আর তাকওয়া ছাড়া ইলম হলো অন্ধকার-মহাবিপদ।

জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করাও নেক আমল

যারা মাদরাসায় পড়াশুনা করেন তারা তালিবে ইলম। তালিবে ইলম মানে ইলম অন্বেষণকারী। ইসলামের পরিভাষায় ইলম বলা হয় ইলমে ওহীকে।

ওহীর ইলম : ওহীর মাধ্যমে যে জ্ঞান মানুষ পেয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে। তাকে ইলমে ওহী বলা হয়। তালিবে ইলম সে, যে ঐ ইলম অন্বেষণ করে; ঐ ইলম নিয়ে মেহনত করে। আর একটা হলো জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান। এই জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে যারা মেহনত করে, এটা শিখতে চায়, শেখে তারাও তালিবে ইলম। এক প্রকারের তালিবে ইলম। কিন্তু পরিভাষার বিষয় আছে। যেহেতু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট আসল ইলম হলো ওহীর ইলম, কুরআন সুন্নাহর ইলম তাই ইলম বললে ওটাকেই বুঝায় এবং তালিবে ইলম বললে- যারা কুরআন-সুন্নাহর ইলম শেখে থাকে তাদেরকে বুঝায়। কিন্তু এর অর্থ এই নয়, যারা জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জন করে তাদের এই কাজটা কোনো কাজ নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে এমন ধারণা করা একেবারেই ভুল। বরং জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান যারা চর্চা করে, যদি নিয়ত সঠিত এবং পদ্ধতি সঠিক হয় তাহলে তাদের চর্চা করাও নেক আমল হবে।

জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্বেষণ এবং এ নিয়ে চর্চা করা, মেহনত করা এটাও নেক আমল-আমলে সালেহ। শর্ত কী? নিয়ত হতে হবে শুদ্ধ এবং পদ্ধতি হতে হবে সঠিক। শুদ্ধ নিয়ত এবং সঠিক পদ্ধতি যদি হয় তাহলে ওটাও নেক আমল। আর যদি নিয়ত শুদ্ধ না হয়, তাহলে যে নিয়তে জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান আপনি অর্জন করেছেন তাই পাবেন।

কী নিয়ত? আমরা যারা স্কুল, কলেজ, ভার্সিটিতে পড়াশুনা করছি, কেনো করছি? আমাদের নিয়তটা কী? কী নিয়ত হলে সহীহ নিয়ত হবে, কী নিয়ত হলে স্থুল নিয়ত হবে, কী নিয়ত হলে একবারেই ভুল এবং নাজায়েয নিয়ত হবে- এটা জানতে হবে। নিয়ত তিন ধরনের হতে পারে।

যথা- ❖ স্থুল নিয়ত ❖ ভুল নিয়ত ❖ শুদ্ধ বা সঠিক নিয়ত।

স্থুল নিয়ত কী? স্থুল নিয়তই মনে হয় মানুষের মাঝে বেশি; আমি জানি না। স্থুল নিয়ত হলো, পড়াশুনা না করলে ভবিষ্যতে করবে কী? ভবিষ্যতের একটা ব্যবস্থার জন্য, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানোর জন্য, সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য পড়াশোনা করতে হবে। ছেলে যদি পড়াশুনা করতে না চায় তাকে উদ্বুদ্ধ করা হয় এই কথা বলে- করবি কী? কী করে খাবে তুমি ভবিষ্যতে?

ঠিক এই ভাষায় হয়ত বলে না, কিন্তু এ ভাষাও ব্যবহৃত হয়। বাকি বিষয়টা মাথায় থাকে। নিজের পায়ে নিজেকে দাঁড়াতে হবে। ভবিষ্যতে কিছু একটা করতে হবে। তাহলে তোমাকে শিখতে হবে। এটা হলো একবারেই স্থুল নিয়ত।

যখন থেকে কাল শুরু হবে (মউতের পর) সেটা আগামীকাল।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ.

"আল্লাহকে ভয় কর। তোমাদের প্রত্যেকে যেন ভাবে- আগামীকালের জন্য কী পাঠিয়েছে। আগামীকালের জন্য কী প্রস্তুতি নিয়েছে।"[১]

আগামীকাল আমরা কোথায় থাকবো? আখেরাতে। তো আখেরাতের জন্য কোনো সঞ্চয় কি আছে আমাদের? ওখানে পাঠিয়েছি কিছু? আল্লাহ বলছেন, প্রত্যেককেই এটা ভাবতে হবে, আগামীকালের জন্য আমি কী প্রস্তুতি নিয়েছি, কী পাঠিয়েছি। আগামীকাল- মৃত্যুর পর থেকেই আগামীকাল। এর আগ পর্যন্ত পুরোটা আজ।

তো মুমিনের ভবিষ্যত তো মৃত্যুর পর থেকে। আমি কীভাবে ভবিষ্যত-চিন্তা করছি; মৃত্যুর পরের জীবনকে বাদ দিয়ে ভবিষ্যত চিন্তা করছি? এটা তো একেবারেই সংকীর্ণতা হয়ে গেল। এজন্য ওটা স্থূল নিয়ত। ঐ নিয়তে কোনো গভীরতা নেই।

ভুল নিয়ত কী? ভুল নিয়ত হলো - আরে জ্ঞান তো এটাই; আর কোনো জ্ঞান আছে নাকি! জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান যে শিখবে সেই তো জ্ঞানী। এর বাহিরে তো কোনো জ্ঞান নেই!! যারা অন্য কিছু শিখে তারা তো জ্ঞানী না। দেখেন না পত্র-পত্রিকায়? আমার অবশ্য প্রায় দশ বছরের মত হয়ে গেছে পত্রিকা পড়ার সুযোগ হয় না; পড়ি না- ঠিক এ ভাষায় বললাম না। পড়ার সুযোগ হয় না। আগে যে সময় পড়তাম, ঐ সময় দেখতাম আলেমদের মধ্যে দুই ভাগ করা হয়; বুদ্ধিজীবিরা দুই ভাগ করে- শিক্ষিত আলেম আর অশিক্ষিত আলেম। জ্ঞানী আলেম আর মূর্খ আলেম। এর মানে কী? এর মানে এই যে, মাদরাসার যে ইলম এটা ইলমই না!! এটা কোনো জ্ঞানের হিসেবেই আসে না। জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিখলেই সে জ্ঞানী হবে, নচেৎ জ্ঞানী হবে না। সেজন্য মূর্খতা থেকে বাঁচতে হলে কী করতে হবে? এই পড়া-শুনা করতে হবে। এই নিয়তে যদি কেউ জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাস্তা অবলম্বন করে, এটা হবে ভুল নিয়ত। 'ভুল নিয়ত' হালকা ভাষায় বললাম; এটা আসলে বেঈমানী নিয়ত। কুফরি নিয়ত।

শুদ্ধ বা সঠিক নিয়ত কী? শুদ্ধ নিয়ত হলো, আমরা আল্লাহর বান্দা, আল্লাহর সৃষ্টি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আখেরাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু থাকতে দিয়েছেন দুনিয়াতে। এই জগতে থেকে আমরা আখেরাতের প্রস্তুতি নিব। এই জগৎটা তো কোনো অর্থহীন বিষয় নয়। এই জগতে থাকতে দিয়েছেন

---

[১] সূরা হাশর : ১৭।

কেনো? আখেরাতের পাথেয় গ্রহণ কর। কুরআন ও হাদীসে এই মর্মটা এসেছে যে, আখেরাতের প্রস্তুতি তোমরা এই দুনিয়া থেকেই গ্রহণ করো। এই জগতে থাকতে হলে মানুষের দুই ধরনের জ্ঞানের দরকার।

❖ ওহীর মাধ্যমে যে হেদায়েত আল্লাহ দান করেছেন; হালাল, হারাম, জায়েয, নাজায়েয, ঈমান, আমল যাবতীয়। একজন মুমিন মুসলিম তার ঈমানী জিন্দেগী, কীভাবে গড়বে, গড়ে তুলতে হবে তাই ইলেম।

❖ মানুষের দুনিয়াবী যত প্রয়োজন আছে তার জ্ঞান। এই দু'ধরনের জ্ঞানের সমন্বয়ে একজন মানুষ জগতে বাস করতে পারে।

পরিবারের সবাইকে দ্বীন শিক্ষা দেয়া জরুরী

অনেকেই সন্তানকে মাদরাসায় পড়ানোর আগ্রহ পোষণ করেন। আলেম বানানোর স্বপ্ন লালন করেন। এক্ষেত্রে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, চাকুরিজীবী, ব্যবসায়ী, দিনমজুর সম্ভবত কোনো শ্রেণিই বাদ নেই। এমন লোকও দেখেছি, যার একটিমাত্র ছেলে এবং কষ্টে সৃষ্টি তার জীবন কাটে। তারপরও ছেলেকে মাদরাসায় পড়াচ্ছেন। তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করছেন। একজন মুসলিমের এমনটিই হওয়া উচিত। সন্তানকে দ্বীনী মাদরাসায় পড়ানো, আলেম বানানো মুমিনের শ্রেষ্ঠ স্বপ্নগুলোর অন্যতম। এ স্বপ্ন সবার হৃদয়ে উদিত হোক। মাদরাসার উদ্যান ইলম পিপাসীদের পদচারণায় মুখরিত হোক। ইতিবাচক নানাদিকের পাশাপাশি একজন নগণ্য শিক্ষার্থী হিসেবে বিভিন্ন শিক্ষার্থী, তাদের অভিভাবক, পরিবার-পরিজনের সাথে কথা বলে, বিভিন্ন অবস্থা দেখে কিছু শূন্যতাও অনুভূত হয়েছে নিজেরও কিছু অভিজ্ঞতা আছে। কোনো কোনো পরিবারে কয়েক সন্তানের মধ্যে এক সন্তানকে মাদরাসায় পড়ানো হয়। পড়ানো তো দরকার সবাইকেই, কিন্তু কোনো কারণে তা সম্ভব না হলে করণীয় হচ্ছে, প্রয়োজনীয় দ্বীন শিক্ষা সবাইকে দেয়া। এটা মুসলিমেরই জরুরি।

সে যে পেশাই অবলম্বন করুক। যেমন ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস, কুরআন তেলাওয়াত, অযু, নামায, যাকাত, রোযা, হজ্বের প্রয়োজনীয় মাসায়েল, হালাল-হারামের মৌলিক বিষয়সমূহ, ইসলামী আদব-আখলাক, দ্বীনের বোধ ও চেতনা, দ্বীনের প্রতি ভালোবাসা প্রভৃতি বিষয়। এ শিক্ষা এজন্য জরুরি যে, এতে সে ধীরে ধীরে দ্বীনমনস্ক ও ইসলামী বোধসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারবে। ঈমান ও তাকওয়ার চেতনায় উজ্জীবিত হবে। জীবনাচরণে ন্যায় ও সততার পরিচয় দিতে সক্ষম হবে। দায়িত্ববান ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারবে। এই শিক্ষা সাধারণ শিক্ষায় শক্তি সঞ্চার করবে, আলো ছড়াবে। এর সুফল বয়ে আনতে সহায়তা করবে। প্রয়োজনীয় দ্বীনী ইলম ও বোধ সবসময় জরুরি। বর্তমানে অনেক বেশি জরুরি। এখন বিপথগামীতার উপায়-উপকরণ ও হাতছানি

অতীতের চেয়ে বেশি। ওসব উপকরণ এখন বাইরের জগৎ পেরিয়ে চার দেয়ালের ভেতরেও প্রবেশ পড়েছে। এজন্য অনেকেই পরামর্শ দিচ্ছেন অভিভাবকগণ যেন সন্তানদের চোখের উপর রাখেন। আসলে চোখের উপর কতক্ষণ রাখবেন। এটা তাদের বিরক্তিরও কারণ হতে পারে। তাই গোড়া থেকে পরিশীলিত করতে হবে। অন্তরে ঈমান ও তাকওয়া বপন করতে হবে। আর এটা সম্ভব কেবল দ্বীনী শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমেই। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। এটি বাস্তব উদাহরণ এবং তা অনেকেরই জানা। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর রা. জনগণের খবর রাখতেন। কে কী করে, কার কী সমস্যা পর্যবেক্ষণ করতেন। একবার রাতের বেলায় সে উদ্দেশ্যে বের হলেন। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্তি এসে গেল। তখন মধ্যরাত। একটা দেয়ালে হেলান দিয়ে শুনতে পেলেন, এক বৃদ্ধা তার মেয়েকে দুধে পানি মিশাতে বলছে। মেয়েটি মাকে বলল, আপনি কি শুনেননি, খলীফা আজ কী আদেশ জারি করেছেন? তিনি ঘোষণা করেছেন, কেউ যেন দুধে পানি না মেশায়। বৃদ্ধা বলল, এখন মেশালে না খলীফা দেখবেন, না তার ঘোষণাকারী। মেয়েটি বলল, তারা না দেখলেও আল্লাহ তো দেখবেন। আমার পক্ষে এটা সম্ভব নয় যে, মানুষের সামনে আল্লাহর আনুগত্য করবো আর নির্জনে নাফরমানি করবো। কত গভীর বোধ ও উপলব্ধি! কী জ্বলন্ত চেতনা ও বিশ্বাস!! নির্জনেও অনৈতিকতাকে অকপটে প্রত্যাখ্যান। এটাই হচ্ছে সত্যিকার ঈমান ও তাকওয়ার ফল, যা অনন্য, অতুলনীয়। এই শিক্ষা পিতা-মাতার উপর সন্তানের হক। এর আওতায় সকল সন্তানকে নিয়ে আসা চাই এবং তা আগে থেকে শুরু করা উত্তম। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে এ ব্যাপারে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার উপর নির্ভর করে একটি শিশুর ভবিষ্যৎ। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার ভিত্তি শক্ত না হলে পরবর্তীতে তা শোধরানো কঠিন। শৈশবের শিক্ষা পাথরে অঙ্কিত নকশার মতই অন্তরে গেঁথে যায় এবং জীবনাচরণে সুদূর প্রসারী ভূমিকা রাখে। এ শিক্ষার জন্য সকালে মকতব বা স্কুলের ধর্ম শিক্ষা যথেষ্ট নয়; মকতবে তো একেবারে প্রাথমিক কিছু বিষয় শিক্ষা দেয়া হয়। আর স্কুলের ধর্ম শিক্ষা দ্বারা ইসলাম সম্পর্কে হয়ত কিছু তথ্য ও জ্ঞান অর্জিত হবে, কিন্তু দ্বীনের বোধ ও চেতনা, জযবা ও প্রেরণা জাগ্রত হওয়া কঠিন। তাই এগুলোর পাশাপাশি বয়স অনুপাতে আরো উদ্যোগ-ব্যবস্থা নিতে হবে। সেই সাথে দরকার পিতা-মাতার সন্তানদের নিয়ে এসব বিষয়ে মুযাকারা করা। কিন্তু আমাদের পরিবারগুলোতে দ্বীনী বিষয়ে পারস্পরিক আলোচনার অনেক অভাব। প্রতিটি পরিবারে দ্বীনী আলোচনার অভ্যাস গড়ে তোলা দরকার। এ ক্ষেত্রে 'তালীম' একটি উপলক্ষ বা সহায়ক হতে পারে। প্রতিদিন সুবিধামত সময়ে দ্বীনী কোনো কিতাব থেকে

তালীম হবে, যেখানে পরিবারের সকল সদস্য উপস্থিত থাকবেন। একজন পাঠ করবেন, অন্যরা শুনবেন। এটা ঘরের মধ্যে, পরিবারের লোকদের মাঝে দ্বীনী আবহ বিস্তারে সহায়ক হবে। ইসলাম মুসলমানদেরকে আল্লাহর কাছে নেক সন্তান প্রার্থনা করতে বলে। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বার্ধক্যে উপনীত হয়ে যান; কিন্তু তাঁর কোনো সন্তান জন্মায়নি। জীবন সন্ধ্যায় দাঁড়িয়েও তিনি সন্তানের অভাব বোধ করেছেন। দুআ-কাতর হয়েছেন আল্লাহর দুয়ারে।

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছেন নেক সন্তান। কুরআনের ভাষায়- رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ "হে প্রভু! আমাকে নেক সন্তান দান করুন।"[১]

হযরত যাকারিয়া আ.-এর চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাঁর কোনো সন্তান জন্মায়নি। জীবনসায়াহ্নে দাঁড়িয়ে তিনি দয়াময় আল্লাহর দরবারে সন্তান প্রার্থনা করেছেন। তবে যেমন তেমন সন্তান নয়। কাতর-মিনতি করেছেন সেই সন্তান যেন দুটি গুণে গুণান্বিত হয়। ❖ আমার ও ইয়াকুব আলাইহিস সালামের (ইলমের) ওয়ারিশ হবে। ❖ সেই সন্তান যেন আপনার সন্তুষ্টি ধন্য হয়।

قَالَ رَبِّ اِنِّيْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّيْ وَ اشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا وَّ لَمْ اَكُنْۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَ اِنِّيْ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَّرَآءِيْ وَ كَانَتِ امْرَاَتِيْ عَاقِرًا فَهَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَّرِثُنِيْ وَ يَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا

"সে বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার অস্থিরাজি পর্যন্ত জীর্ণ হয়ে গেছে, মাথা বার্ধক্যজনিত শুভ্রতায় উজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছে এবং হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করে কখনও ব্যর্থকাম হইনি। আমি আমার পর আমার চাচাত ভাইদের ব্যাপারে শঙ্কা বোধ করছি এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। সুতরাং আপনি আপনার নিকট থেকে আমাকে এমন এক উত্তারাধিকারী দান করুন- যে আমারও উত্তরাধিকারী হবে এবং ইয়াকুব আলাইহিস সালাম-এর উত্তরাধিকারও লাভ করবে এবং হে আমার প্রতিপালক! তাকে এমন বানান, যে (আপনার নিজেরও) সন্তুষ্টি প্রাপ্ত হবে।"[২]

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবানেও একই কথা উচ্চারিত হয়েছে। তিনিও নেক সন্তানকেই মুমিন-জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ আখ্যা দিয়েছেন- 'মৃত্যুর পর তিনটি আমল ছাড়া সব আমলের যোগাযোগ রহিত হয়ে যায়।
❖ সদকায়ে জারিয়া ❖ উপকারী ইলম ❖ নেক সন্তান।"[৩]

---

[১] সূরা সাফফাত : ১০০।
[২] সূরা মারইয়াম : ৪ থেকে ৬।
[৩] মুসলিম শরীফ, হাদীস ৪৩১০।

একজন আল্লাহওয়ালা আলেম বা আলেমার প্রতিকৃতি

প্রতিটি দেশের একটি সীমানা থাকে, সীমান্ত প্রহরী থাকে। ইসলামেরও একটি সীমানা আছে। কর্মগত, চিন্তাগত সকল বিধি-বিধানের আছে সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট অবকাঠামো। এর ভিতরে যা পড়ে তা ইসলাম, যা পড়ে না তা অনিসলাম। তো ইসলামী বিধি-বিধানের এই সীমান্ত যারা প্রহরা দেন, যারা ইসলামকে স্বরূপে উপস্থাপন করেন, তারা হলেন আহলে ইলমের জামাত, উলামায়ে কেরামের জামাত। আল্লাহ তাঁর মনোনীত এই দ্বীন সংরক্ষণের জন্য যুগে যুগে অবিচ্ছিন্নভাবে ওলামায়ে কেরামের জামাত সৃষ্টি করে থাকেন। যারা সকল লোভ-লালসা, ভয়-ভীতি এবং চরম প্রতিকূলতায়ও দ্বীন রক্ষায় নিজেদের উৎসর্গ করে দেন। নবীজী ইরশাদ করেন–

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ.

"এই উম্মতের একটি দল সর্বদা হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তাদের বিরুদ্ধাচরণকারীরা তাদের দ্বীনের কোনো ক্ষতি করতে পারে না। যাবৎ না কেয়ামতের নির্ধারিত আলামত প্রকাশ পায়।"[১]

ইসলাম সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। ফলে কোনো যামানাই আহলে ইলম থেকে শূন্য হয় না। ইসলাম ধর্মে বিকৃতি সাধন করে কেউ কখনো পার পায় না। আগের, পরের কিংবা সমকালের অধিকাংশ আহলে ইলম এবং শাস্ত্রজ্ঞ মনীষি ঐ বিকৃতি নস্যাৎ করে দেন। ইসলাম-অনিসলামের পার্থক্য দিন-রাতের মতই পরিষ্কার করে দেন। দ্বীন সংরক্ষণের কাজে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিবেদিত প্রাণ সেই আল্লাহ প্রেমিক নিঃস্বার্থ আহলে ইলমগণের ধারাবাহিকতায় কালের অন্যতম ব্যক্তিত্বগণ।

সাহাবায়েকেরাম ইলমে দ্বীন গ্রহণ করেছেন নবীজীর কাছ থেকে। তাঁদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন তাবেঈনেকেরাম। তাবেঈনের কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন তাঁদের পরবর্তীগণ। এভাবে প্রজন্ম পরম্পরায় এক অবিচ্ছিন্ন স্রোতধারায় আমাদের পর্যন্ত দ্বীন ও দ্বীনী ইলম পৌঁছল। সাহাবা-তাবেঈনের যামানায় সূত্রবিচ্ছিন কোনো ব্যক্তি দ্বীনের সংরক্ষক আহলে ইলমের কাতারে আসতে পারেনি। পরবর্তীকালেও বিচ্ছিন্ন সূত্র থেকে বিদ্যা অর্জন করে কেউ কখনও আহলে ইলম ও আহলে হক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারেনি।

---

[১] মুসলিম, হাদীস ১৯২০।

নবীজী ইরশাদ করেছেন- তোমরা ইলম অর্জন করো তা বিদায় নেয়ার আগে। সাহাবীগণ আরয করলেন, ইলম কীভাবে বিদায় নেবে, হে আল্লাহর নবী! আমাদের মাঝে তো আল্লাহর কিতাব বিদ্যমান? বর্ণনাকারী বলেন, এ কথায় নবীজী রুষ্ট হলেন অতপর বললেন, তোমাদের মরণ হোক! বনী ইসরাঈলের মাঝে কি তাওরাত-ইঞ্জিল ছিল না? কিন্তু (ইলম অর্জন ও দ্বীন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে) শুধু কিতাব তাদের কোনো কাজে আসেনি। আরে! ইলম বিদায় নেয়ার অর্থ (আহলে ইলম থেকে ইলম শিখে নেয়ার আগেই) আহলে ইলমের মৃত্যু হওয়া, ইলম বিদায় নেয়ার অর্থ আহলে ইলম বিদায় নেয়া![১]

মুফতী ফয়যুল্লাহ রহ.-এর মেয়ে ইলম পিপাসু

মুফতীয়ে আযম হযরত মাওলানা মুফতী ফয়যুল্লাহ রহ.-এর কয়েকজন কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছিল। তন্মধ্যে দুই মেয়ে বেঁচে ছিল। বড় মেয়ের নাম রহীমা খাতুন রহ.। ছোট মেয়ের নাম যয়নাব খাতুন রহ.।

আশ্চর্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তাঁরা। তাদের ইলম অর্জনের আগ্রহের কথা শুনলে অবাক হতে হয়। অতি অল্প বয়সেই তারা যে সমস্ত কিতাব পড়ে ফেলেছেন, শুনলে অবাস্তব মনে হয়। পিতা নিজেই তাঁদের অনেক প্রশংসা করতেন। বড় মেয়ে সম্পর্কে বলেন, আমার কলিজার টুকরা মেয়ে যদি পুরুষ হতো তাহলে মাশাআল্লাহ অনেক বড় আলেম হত। কিংবা বিবাহটাও যদি কিছু দেরিতে হতো তাহলে ফাযেলা হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহর সিদ্ধান্ত, চৌদ্দ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই তার বিবাহ হয়ে গেল এবং সংসার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এভাবে বিভিন্ন সময় উভয় মেয়ের কথা বলতেন।

বড় মেয়ে সম্পর্কে হযরত মুফতী ছাহেব নিজেই বলেন তার মেধা এবং কিতাবাদী বোঝার ও মুখস্ত করার যোগ্যতা প্রখর ছিল। অত্যন্ত বুঝমান এবং মেধাবী ছিল। কিতাবের যত কঠিন বিষয় হোক অত্যন্ত পরিপূর্ণতার সাথে উপস্থাপন করতে পারতো। ইবারতের স্বাভাবিক অর্থ সঠিকভাবে বুঝতে পারতেন। সবক শুনাতে অথবা সামনের পড়া পড়তে ইবারত (আরবী পাঠ) খুব দ্রুততার সাথে পড়তে পারত। নির্ভুল পড়ত। হস্তাক্ষর ছিল পরিষ্কার ও সুন্দর। যে কোনো বিষয় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে সামগ্রিকভাবে তুলে ধরতে পারত।

মুফতীয়ে আযম রহ. বলেন, অনেক সময় আমি তাকে দিয়ে ফতোওয়াও নকল করিয়েছি। ফারায়েয ও (মিরাছ বণ্টন-হিসাব) করিয়েছি। মাশাআল্লাহ ফারায়েযে সে খুবই দক্ষ ছিল।

[১] দারেমী, হাদীস ২৪৬।

রহীমা খাতুন রহ. তার নিজের শিক্ষা-দীক্ষার বিষয়ে বলেন, আমাদেরকে পড়ানোর ক্ষেত্রে আব্বাজান রহ.-এর সীমাহীন আগ্রহ ছিল। আল্লাহ্ তাআলার অসীম মেহেরবানী তিনি আমাদেরকেও দ্বীনী ইলম অর্জন করার সীমাহীন আগ্রহ দান করেছেন। আব্বাজান রহ. আমাদেরকে যত্নের সাথে পড়াতেন। আমি, ছোট বোন যয়নাব এবং ঘরের অন্যান্য বাচ্চাদেরকে পড়ানোর জন্য উস্তাযে মুহতারাম হযরত মাওলানা আযীযুল্লাহ ছাহেব রহ.-কে দায়িত্ব দিয়ে ছিলেন। আমি দশ বছর বয়সেই সম্মানিত উস্তাযের কাছে উর্দু-ফার্সীর প্রাথমিক কিতাবগুলো এবং ইলমে ছরফের মীযান-মুনশাইব, পাঞ্জেগাঞ্জ এবং ইলমে নাহুর নাহবেমীর পরিপূর্ণরূপে শিখে ফেললাম। তিনি আরো বলেন, আমি এই কিতাবগুলো যতটুকু পড়েছি যয়নাবও আমার চেয়ে ছোট হওয়া সত্ত্বেও উস্তাদজীর কাছে ততটুকু পড়েছে। তবে যয়নাব ইলমে ছরফে অনেক দক্ষ ছিল। কোনো ছীগা জিজ্ঞাসা করলে সাথে সাথে বলে দিতে পারত। যয়নাবের দক্ষতা সম্পর্কে আব্বাজান রহ. বলেন, একবার আমার বন্ধু মুহতারাম মাওলানা আব্দুল মাজীদ শাহ ছাহেব রহ. এবং মাওলানা আবুল হাসান রহ. ও মাওলানা নূর আহমদ ছাহেব দা.বা আমাদের ঘরে এলেন। খাবার সমাপ্ত করার পর যয়নাবকে আমার রচিত 'তালীমুল মুবতাদী' থেকে কিছু প্রশ্ন করলেন। যয়নাবের বয়স ছিল তখন খুবই কম। কিন্তু মাশাআল্লাহ সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিলো। তখন শাহ ছাহেব রহ. খুব খুশি হলেন এবং তাকে পুরস্কার দিলেন।

মুফতীয়ে আযম রহ. বলেন, 'তালীমুল মুবতাদী' রচনা করার প্রেক্ষাপট ছিল; আদরের কন্যা যয়নাবের আরবী সাহিত্যের সাথে সম্পর্ক তৈরি করানোর জন্য কিছু জুমলা আরবীতে লিখে দিতাম। এভাবে কিছু লেখা একত্রিত হয়ে একটা কিতাবের আকার ধারণ করে।

মুহতারামা রহীমা খাতুন আরো বলেন, দশ বসর বয়সেই নাহবেমীর পর্যন্ত পড়ার পর পড়াশোনার আগ্রহ আরো বাড়তে থাকল। আব্বাজান রহ.-এর ইচ্ছাও এটাই ছিল যে, উস্তাদজীর কাছে প্রচলিত সমস্ত কিতাবই পড়বো। পরে যখন উস্তাদজীর কাছে যেতে লজ্জাবোধ করতে শুরু করলাম তখন আব্বাজান নিজেই ঘরের মধ্যে খুব গুরুত্বের সাথে পড়ানো শুরু করলেন। ফযর এবং যোহর নামাযের পরে এবং রাতে পড়াতেন। উস্তাদজীর কাছে পড়া কিতাবগুলো ছাড়াও আব্বাজান প্রথমেই কারীমা, পান্দেনামা আত্তার, গুলিস্তা, বোস্তা এবং ফার্সী কিতাবগুলোর পাশাপাশি আরবী মুফীদুত তালেবীন, তালীমুল মুতাআল্লিম, কালয়ূবী, কাসীদাহ বুরদাহ, নাফহাতুল আরব এবং আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ রহ.-এর প্রসিদ্ধ কিতাব আলফুরকান ইত্যাদি পড়ালেন। ফিকহের মধ্যে মা-লা-

বুদ্দামিনহু, কুদুরী এবং আব্বাজান রহ.-এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ আরবী ও ফার্সি কিতাবও পড়ালেন।

আমার বয়স যখন তের বছর তখন আব্বাজান রহ. আমাকে উলূমে আরাবিয়্যাহ এবং ফিকহের সাথে সম্পর্ক তৈরি করানোর জন্য হেদায়া পড়াতে শুরু করলেন। আব্বাজান রহ. হেদায়া শুরু করার পর আমি অত্যন্ত আগ্রহ ও আনন্দের সাথে পড়তে লাগলাম। হেদায়ার পাশাপাশি আরো দু'তিনটি বিষয়ের দু'তিন কিতাবও পড়লাম।

আলহামদুলিল্লাহ, আমি রাত-দিন অধ্যয়নে থাকতাম। আমার পড়াশোনার জন্য আলাদা একটা রুম ছিল। পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটবে বিধায় আম্মার সাথে থাকার পরিবর্তে ঐ রুমে রাতেও সেখানে থাকতাম। কোনো কোনো সময় এমন হতো যে, যথেষ্ট পরিমাণ রাত জাগার পর আব্বাজান রহ. এসে শুয়ে যাওয়ার নির্দেশ করতেন। আব্বাজানের কথা অনুযায়ী বাতি নিভে শুয়ে পড়তাম। কখনো আবার এই কৌশল করতাম যে, 'হারিকেনের চিমনী কাগজ দিয়ে ঢেকে দিতাম' যেন তিনি মনে করেন আমি শুয়ে পড়েছি।

হযরত মুফতী ছাহেব রহ. একবার হাটহাজারীর জামে মসজিদে তাঁর বুধবারের বয়ানে বলেন, যেদিন মেয়ে রহীমা খাতুন তাফসীরে জালালাইন শুরু করল ঐদিনের কথা, আমি রাতের যথেষ্ট অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর কোনো প্রয়োজনে ঘুম থেকে জাগ্রত হলাম। দেখতে পেলাম রাহীমার ঘরে বাতি জ্বলছে। এত রাতে তার ঘরে আলো দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। চুপি চুপি তার রুমের কাছে গেলাম। দেখলাম, সে জালালাইন শরীফ অধ্যয়ন করছে। এটা দেখে আমার আর খুশীর সীমা রইল না। আমি আল্লাহর শুকর আদায় করলাম। বড় মেয়ে রহীমা খাতুন বলেন, হেদায়া শুরু করার পর নিয়মিত পড়তে থাকলাম এবং অল্প দিনেই হেদায়ার প্রথম দু'খন্ড শেষ হয়ে গেল। তখন আব্বাজান রহ. আবার পড়াতে শুরু করলেন। পাশাপাশি মিশকাত শরীফ-এরও ছবক দিলেন। মিশকাত শরীফ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শব্দে শব্দে পড়ালেন এবং আল্লামা আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. রচিত أشعة اللمعات (মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ) পূর্ণ চার খন্ড সমাপ্ত করালেন। মিশকাত শরীফ أشعة اللمعات সহ যখন সমাপ্ত হলো তখন আমার চৌদ্দ বছর পূর্ণ হলো। আবার যখন মিশকাত শরীফ পুনরায় পড়তে শুরু করলাম তখন হেদায়া আখেরাইন (৩য় ও ৪র্থ খন্ড) এবং জালালাইন শরীফ সবক দিলেন। আর তখনি আমার বিবাহ হয়ে গেল। আলহামদু লিল্লাহ বিবাহের পূর্বেই এ সমস্ত কিতাবাদি শেষ হয়ে গেল।

তিনি আরো বলেন, ইলম অর্জনের যে তীব্র আকাংখা ছিল বিবাহের পর তাতে ভাটা পড়ল। ছিহাহ ছিত্তা খতম করার যে আশা অন্তরে ছিল সেটাও পূর্ণ হলো না। এজন্য যদি জীবনের শেষ পর্যন্তও আফসোস করি তা কমই হবে।

এখন শুধু কবির এ কথায় সান্তনা খুঁজি- 'মানুষ যা কামনা করে তার সবটাই সে পায় না বা বাতাস জাহাজের বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়।'

অবশ্য বিবাহের পরে মুয়াত্তা মুহাম্মাদ এবং সিরাজী পড়েছি।

মুফতীয়ে আযম রহ. বলেন, রাহীমার ফারায়েযের ক্ষেত্রে অনেক দক্ষতা ছিল, কিন্তু বিবাহের পরে ঘরের ঝামেলা এবং বিভিন্ন সমস্যার কারণে নিবিড়ভাবে পড়া শোনার সুযোগ পায়নি। এর মাঝেই যতটুকু সম্ভব হয়েছে চেষ্টা চালিয়েছে।

মুহতারামা রহীমা খাতুন আরো বলেন, ছোট বোন যয়নাব উস্তাযে মুহতারাম হযরত মাওলানা আযীযুল্লাহ্ ছাহেবের কাছে নাহবেমীর পর্যন্ত পড়ার পর আব্বাজান রহ. 'তালীমুল মুবতাদী', 'ফয়যুল কালাম' 'হিদায়াতুল ইবাদ' ইত্যাদি কিতাব পড়ালেন। ইন্তেকালের আট-নয় বছর পূর্বে আব্বাজান রহ. আমাদের দু'বোনকে কুরআনের অনুবাদ জরুরি তাফসীরসহ পড়ালেন। আমার তো কিছু কারণে কখনো কখনো অনুপস্থিতি হয়ে যেত। কিন্তু ছোট বোন যয়নাব ঠিকই আব্বাজানের কুরআনের দরস দ্বারা উপকৃত হতে থাকল। আব্বাজান রহ. আমাদেরকে যে পরিমাণ ভালোবাসতেন, তা প্রকাশ করার ভাষা আমাদের নেই। আম্মাজান রহ. বলেন, আমি যখন খুব ছোট ছিলাম আব্বাজান রহ. কোথাও গেলে ঘরে এসে প্রথমেই আমাকে কোলে নিতেন। আমাদের খোঁজ-খবর নিতেন। আর সবচেয়ে বড় ভালোবাসা হলো তিনি আমাদেরকে ইলমে দ্বীন শিখিয়েছেন। যার শুকরিয়া আদায় করে শেষ করতে পারব না।

আখলাক-চরিত্র : বড় মেয়ের আখলাক সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এক দৃষ্টান্তহীন নারী ছিলেন। তার স্বভাব-চরিত্র ছিল প্রশংসার যোগ্য। আল্লাহ তাআলা মুফতীয়ে আযম রহ.- কে যে সমস্ত বিরল গুণ এবং নমুনাহীন চরিত্র দান করেছেন তার সবটাই তিনি পেয়েছিলেন। আচার আচরণ, চলা-ফেরা, অভ্যাস-রীতি মূলকথা জিন্দেগীর সর্বক্ষেত্রে সম্মানিত পিতার অবিকল প্রতিচ্ছবি ছিলেন। ছোট মেয়ে যয়নাব সম্পর্কে বলেন, তিনি আমার খালা-শাশুড়ি ছিলেন। সাত বছর আমি তাদের বাড়িতে রাত-দিন অবস্থান করেছি। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ে তাঁর গলার আওয়াজ কখনো আমার কানে আসেনি। অথচ মাঝখানে শুধু বাঁশের বেড়া ছিল।

তার লজ্জা এতই প্রবল ছিল। এগার বছর পর্যন্ত তার সাথে আমার একটি কথাও হয়নি। কয়েক বছর আগে হযরতের জীবনের কিছু তথ্য সংগ্রহ করার জন্য তার বড়

বোনের মাধ্যমে অনেক পীড়াপীড়ি করলাম; নিজের পিতার কিছু কথা আমাদেরকে শুনান, কিন্তু লজ্জার দরুণ তার মুখ থেকে এক শব্দও বের হয়নি।

শুধু মেয়েদের ক্ষেত্রেই নয়, হযরত মুফতী ছাহেব স্বীয় স্ত্রীর পড়াশোনার ক্ষেত্রেও বেশ সজাগ ছিলেন এবং এ বিষয়ে খুব গুরুত্ব দিতেন। স্ত্রীর তালীমি বিষয়ে হযরত রহ. নিজেই বলেন, তিনি যখন খুবই ছোট তখন আমি মকতবে কিছু বাচ্চাদের পড়াতাম। তার মধ্যে আমার স্ত্রীও ছিল। বিবাহের আগে কায়েদা থেকে কুরআন শরীফ পর্যন্ত শিক্ষা দিয়েছি। অবশ্য বিবাহের পরে উর্দু কিতাব যেমন- রাহে নাজাত, যীনাতুন নিসা, হুকুকুল ইসলাম, মিফতাহুল জান্নাত, বেহেশতী জেওর এগারো খণ্ড এবং ফার্সী পহেলী ইত্যাদি কিতাবগুলো পড়েছি। আরবীর সাথে সম্পর্ক তৈরি করানোর জন্যে 'মুফীদুত তালেবীন' শুরু করেছি, কিন্তু ঘরোয়া বিভিন্ন ঝামেলা ও বিভিন্ন অসুস্থতার কারণে আর সম্ভব হয়ে উঠেনি। অন্যথায় ইচ্ছা ছিল মেয়েদের মত একটা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পড়াব। তারপর মাদরাসার দরসের ফাঁকে ফাঁকে কিছু পড়াতাম।[১]

শিক্ষণীয় বিষয় : এসবকিছু লেখার এই উদ্দেশ্য নয় যে, আমরা একজন আরেকজনের কাছে বলব আর তৃপ্তি পাবো। বরং উদ্দেশ্য হলো, উপদেশ গ্রহণ করা এবং তাঁদের উত্তম অবস্থাগুলো নিজের চলার পথের আমল হিসেবে গ্রহণ করা। হযরত রহ.-এর পরিবারস্থ নারীরা আমাদের জন্য আদর্শ, নারী জাতির মাঝে অনন্য দৃষ্টান্ত। তিনি তাদেরকে আরবী, ফার্সী, উর্দু, কুরআনের তাফসীর, ফিকহ কোনোটাই শিক্ষা দিতে বাদ রাখেননি। নারী জাতির কত ঝামেলা-অজুহাত, একটু চিন্তা করি; তারাও তো আমাদের মতই নারী। এতো কম বয়সে এতগুলো কিতাব পড়ে ফেলা খুব বেশি আগের কথাও নয়। তারা তো আমাদের দেশেরই নারী। আজ আমাদের মাঝে দ্বীন শিক্ষার আগ্রহ খুবই কম। সাংসারিক ঝামেলায় পড়ে গেলে তো আর কথাই নেই। যদি একটু ভেবে দেখি তাহলে তাঁদের জীবন কাহিনীতে যথেষ্ট চিন্তা করার দ্বারা আত্মার খাদ্য রয়েছে।

শিক্ষার্থীদের জীবনের গুরুত্ব

আমরা ইলম যেভাবে অন্বেষণ করতে হয় সেভাবে অন্বেষণ করেছি। যখন শিক্ষার্থী ছিলাম তখন আমাদের পড়ালেখা ছাড়া আর কোনো কাজ ছিল না। পড়া-লেখা থেকে ফারেগ হওয়ার পর যখন প্রয়োজন হয়েছে, আল্লাহর শুকর এমনভাবে কাজ করেছি যে বড় বড় রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গও আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য থাকত। যে কোনো আলেমের কথাই বলুন, দুনিয়াতে যারাই দ্বীনের বড় বড় খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। বড় বড় আলেমদের মধ্য

[১]হায়াতে মুফতী আযম রহ. (উর্দূ)।

থেকে যারাই রাজনীতির ময়দানে এসেছিলেন, তারা সকলে শিক্ষা প্রতি ছিলেন। তাদের শিক্ষাজীবন রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। তারা শুধুই পড়ালেখা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তারপর আল্লাহ যখন তাদেরকে কাজে লাগিয়েছেন তখন রাজনৈতিক অঙ্গনেও তাদের দ্বারা অনেক কাজ হয়েছে। এ সব কিছু শোনানোর উদ্দেশ্য হলো, শিক্ষাজীবনকে মূল্যয়ন মনে করে কাজে লাগানো।

শিক্ষার্থীদের জীবনের সূচনা

এ ধারাবাহিকতায় আমাকেও কুরআন শরীফ নাজেরা ও কিছু উর্দূ কিতাবাদি পড়ার পর ফারসী ও আরবী পড়ায় লাগিয়ে দেন। কিন্তু আমি -হয়ত বয়স কম হওয়ার কারণে অথবা ছরফ ও নাহু বুঝার উপযুক্ত না হয়ে উঠায় (বিশেষভাবে মিজান-মুনশাইব, পাঞ্জেগাঞ্জ ও নাহবেমীরের মত কিতাবগুলোর মাধ্যমে ছরফ ও নাহু পড়া ও বুঝার উপযুক্ত ছিলাম না।)- অত্যন্ত অনাগ্রহ ও অমনোযোগিতার সঙ্গে পড়ালেখা করছিলাম। এরচে' বড় কারণ ছিল, দ্বীনী শিক্ষার প্রতি আমার কোনো ধরনের আগ্রহ ও চাহিদা ছিল না। আমি অত্যন্ত অনিচ্ছা ও অনাগ্রহের সঙ্গে পড়ছিলাম। বরং অবস্থা তো এই ছিল, শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য যা পড়া দেয়া হত মুখস্থ করে শুনিয়ে দিতাম- কিছুই বুঝতাম না। পড়াশোনার প্রতি বিন্দুমাত্রও মনোযোগ ছিল না আমার।

বর্তমান সময়ের শিক্ষার্থীরা

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ. বর্তমান কালে মাদরাসার শিক্ষার্থী-এর উন্নত, দামী, জৌলুসপূর্ণ পোশাক ও তাদের আড়ম্বরপূর্ণ জীবন-যাপন দেখে খুবই আফসোস করতেন এবং বলতেন, তাদের এ ধরনের (অর্থাৎ, বিলাসী ও আড়ম্বরপূর্ণ) জীবন যাপন দেখে মনে হয় তাদের ইলমের হাওয়াও লাগেনি, যদি ইলম হাসিলের আগ্রহ থাকতো, তাহলে এ ধরনের হীন ও তুচ্ছ জিনিসের প্রতি তাদের মনযোগ হতো না, তারা এ সকল জিনিসের দিকে ফিরেও তাকাতো না।

স্কুল ও কলেজের শিক্ষা

বিশেষভাবে রাজনীতি আজ স্কুল-কলেজকে শেষ করে দিয়েছে। তাদের কাছে না ইলম, না দ্বীন, না হালাল-হারামের পার্থক্য। শুধু আছে শ্লোগান, আর শ্লোগানের পেছনে ডিগ্রী। আর ডিগ্রীর উপর নির্ভর করে তাদের চাকুরি। এভাবে চলেও তারা পার পেয়ে যায়। কারণ তারা শ্লোগান দিতে শিখেছে এবং শ্লোগান দিয়ে চড়াও হয় নিজেদের প্রধান শিক্ষকের উপর। আমাদেরকে ডিগ্রী দিয়ে দাও। এভাবে তাদের চাকুরিও হয়ে যায় এবং দুনিয়াতে তারা বাহ্যিকভাবে কামিয়াবও হয়ে যায়। যদিও সেটা কোনো সফলতা নয়, কেবল ছাই।

সার্টিফিকেট বনাম জ্ঞান ও যোগ্যতা

শিক্ষার্থীরা! আপনাদের সনদের দু'পয়সারও মূল্য নেই। ধরুন, আমি বড় বড় উপাধি আপনার নামের শুরুতে লিখে দিলাম। বাজারে যান, দেখবেন সেগুলোর মূল্য দু'পয়সাও হবে না। অফিসে যান, কোনো চাকুরিও এই সার্টিফিকেট দিয়ে পাবেন না। হ্যাঁ, যদি আপনার যোগ্যতা থাকে তাহলে সবকিছু আছে। এটা অনেক বড় মূল্যবান জিনিস। আর যদি যোগ্যতা না থাকে, তাহলে কিছুই নেই। সুতরাং আপনারা সার্টিফিকেটের লোভ করবেন কেনো? আমি যা বলছি হয়ত আমার পরে এ কথা বলার কেউ থাকবে না। আমি শুধুশুধুই আমার চুলদাড়ি সাদা করিনি। বরং সারাটা জীবন এ কাজেই ব্যয় করলাম। আমার চোখ খুলেছে মাদরাসায়। শিক্ষার্থীদের মাঝে আমার শৈশব কেটেছে। শৈশবের খেলাধূলাও আমি করেছি শিক্ষার্থীদের সাথে। আমার জীবনটাই কেটেছে দারুল উলূম দেওবন্দের পরিবেশে। বর্তমান দুনিয়ায় যাদের কোনো ব্যক্তিকে খুঁজে পাবেন না। সে সকল আকাবিরদের তত্ত্বাবধানে শুধু পড়িনি, পড়িয়েছিও।

জীবনের একটি অভিজ্ঞতা : শিক্ষার্থীরা! আমি আমার অভিজ্ঞতার কথা বলছি। আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। বিশ্বাস করুন, আমার পরে একথা বলার লোক আর পাওয়া যাবে না। কারণ সেই পরিবেশ দেখেছে এবং এত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে এমন লোক আর কেউ বেঁচে নেই। সবাই নবীন। নতুন কাজে যোগ দিয়েছে। অল্প কিছু লাভের পেছনে তারা ছুটে যায়। আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতা হলো, যে শিক্ষার্থী তার শিক্ষা জীবনে অন্য কোনো ধান্দায় লিপ্ত হয়ে যায়, বিশেষভাবে রাজনৈতিক সভা-সমাবেশে যোগদান করে। রাজনীতি তো শিক্ষার্থীদের জন্য একেবারে বিষের মত। অনেকে দেখা যায়, সবক-তাকরার ইত্যাদি বাদ দিয়ে বক্তৃতা শেখার পেছনে লাগে, এটা কিন্তু তাদের জন্য মোটেই উপকারী নয়। হ্যাঁ, সাদামাটাভাবে প্রতি সপ্তায় বক্তৃতা শেখার অনুষ্ঠান করা যেতে পারে।

আমার জীবনের অভিজ্ঞতা হলো- সে সকল মনীষীরও যারা শিক্ষাজীবনকে জ্ঞান অর্জনের পেছনে ব্যয় করেছেন। এই সময়কে গনীমত মনে করুন। কুরআনের আয়াত কী বলে সেটা দেখুন। আমার অভিজ্ঞতা আপনাদের সামনে পেশ করলাম। আপনাদের তো বাস্তব অভিজ্ঞতা নেই। এই সময়টিকে শুধুই কিতাব বোঝার, দ্বীনী প্রজ্ঞা অর্জন করার এবং বৃদ্ধি করার পেছনে ব্যয় করুন। দু'চার বছর এভাবে মেহনত করেই দেখুন। 'অল্প কিছু দিন পরিশ্রম কর, তারপর বাকি জীবন সুখে থাক।'

সময় ও জীবনের মূল্য

শিক্ষার্থীরা আগে যদি না করে থাকেন তাহলে এখন করুন। নিজের উপর একটু দয়া করুন। নিজের মা-বাবার উপর একটু দয়া করুন। তারা আপনাদেরকে এই কাজের জন্য পাঠিয়েছেন। সুতরাং আপনারাও কিছু অর্জন করে নিন। অর্জন করার সময় এখনই। যদি এই সময় অতীত হয়ে যায় তাহলে এই সম্পদ আর কোনোভাবে অর্জন করতে পারবে না। দুনিয়ার সকল কিছু আসবে। যা চাও হয়তো তাই পাবে। কিন্তু ইলম আর পাবে না। যে সকল জিনিস উস্তাযের নিকট থেকে শিখতে হয়, তাতে ইলম, আমল, আখলাক ও আদাব সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত। আমি একদু'জন নয় অনেক শিক্ষার্থীকে দেখেছি, যারা সময় অপচয় করেছে। তারপর পরিণামে নিজেরা ধ্বংস হয়েছে।

আমরা যারা শিক্ষকতা করছি, আমাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা পরীক্ষায় উচ্চ নম্বরে কৃতকার্য হয় যদি তাদেরকে আমরা নিজেদের মানদণ্ড যাচাই করি তাহলে খুব কম সংখ্যক শিক্ষার্থীই যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারবে। আগের মানদণ্ড অনুসারে পরীক্ষা নিলে আপনাদের মধ্যে হয়ত চার পাঁচজন খুব কষ্ট করে পাস করতে পারবে। আমরা এখন দেখেও না দেখার ভান করে আপনাদের পাস করে দিই। যোগ্যতা তো কমছেই। এরপর যদি অধ্যয়নও কমে দেন তাহলে কী অবস্থা হবে?

মাদরাসায় তো আপনারা এজন্যই এসেছেন। এজন্যই তো আপনাদের বাবা মা আপনাদেরকে মাদরাসায় পাঠিয়েছেন। আপনারা খাওয়া-দাওয়াও এ উদ্দেশ্যেই করে থাকেন। মানুষের সামনে এটাই বলেন যে, আমরা দ্বীনি ইলম অর্জনের জন্য মাদারাসায় এসেছি। সুতরাং আপনাদের দায়িত্ব হলো তাফাক্কুহ অর্জনের চেষ্টা করা। এখনও যদি চেষ্টা করেন তাহলে সারা বছরের চেষ্টা পূরণ হয়ে যাবে। সে সাথে নামাযের পাবন্দী করুন। একটু চিন্তা করুন, যদি আমাদের নামাযটাই এখনো ঠিক না হয় তাহলে আমরা দ্বীনের কী খেদমত করবো? কমপক্ষে নামায তো আমাদেরকে জামাতের সাথে গুরুত্ব দিয়ে পড়া উচিত। এর জন্য একে অপরকে সহযোগিতা করবেন। সহানুভূতির সাথে, রাগের সুরে নয়। ফযরের সময় একে অপরকে আস্তে আস্তে উঠে দিবেন। যদি সে না উঠে আর আপনি নামায পড়তে চলে যান, তাহলে নামাযের পর আবার তাকে জাগিয়ে দিন। নিজের সাথীদের পেছনে এইটুকু মেহনত তো আমাদের করতে হবে।

জীবনের মূল : সময় আল্লাহ তাআলার অনেক বড় নেআমত। এ নেআমত একবার হারিয়ে গেলে আর ফিরে আসে না। সময় অতিবাহিত হচ্ছে। আপনার দৃষ্টান্ত হলো বরফ বিক্রেতার মতো। বরফ বিক্রেতার মূলধন সারাক্ষণ নিঃশেষ হচ্ছে। জনৈক বুযুর্গ বলেন, বরফের দোকানে গিয়ে আমার সূরা আসরের

হাকীকত বুঝে এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "সময়ের শপথ! নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।" বুযুর্গ বলেন, মানুষ যে কীভাবে ক্ষতির মধ্যে রয়েছে, আমি বরফের দোকানে গিয়ে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখতে পেয়েছি। বরফ ব্যবসায়ীর মূলধন সারাক্ষণ গলে গলে শেষ হতে থাকে। কেউ কিছু কিনলেও শেষ হয়, না কিনলেও হয়। তবে যা বিক্রি হলো, তার বিনিময়ে অর্থ আসে। আর যা বিক্রির আগেই গলে যায় তার বিনিময়ে কোনো অর্থ আসে না।

মানুষের জীবন সম্পূর্ণই বরফের মত। প্রতি নিঃশ্বাসে একটি করে মুহূর্ত বিয়োগ হচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে আমাদের জীবন ছোট হচ্ছে। মানুষ বলে বয়স বাড়ছে। মাশাআল্লাহ সত্তর বছর হয়ে গেছে। কিন্তু বাস্তব কথা হলো, যার যত বয়স বাড়ছে তার জীবন তত কমছে। আমরা ছোট বেলায় একটি কবিতা পড়েছি-"হে উদাসীন! ঘড়ির কাটা তোমাকে ডেকে ডেকে বলছে। ঘড়ির প্রতিটি সেকেন্ড তোমার জীবন থেকে একেকটি মুহূর্তকে কমে দিচ্ছে।" ঘড়িতে ঘন্টা বেজেছে। এর অর্থ, তোমার জীবন থেকে আরো একটি ঘণ্টা কমে গেল।

সময় কাজে লাগানোর উপায়

সময় আপন গতিতে বয়ে চলেছে। "নিশ্চয়ই আকামন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহর কিতাবে আল্লাহর নিকট মাসের সংখ্যা বারটি।"[১]

সময়ের নেযাম আল্লাহ তখন থেকেই সৃষ্টি করেছেন। এখন যেমন দিনরাত তখনও তেমন দিনরাত ছিল। আর দিনরাত সব মানুষের ক্ষেত্রে সমান। পার্থক্য শুধু এখানে যে, কারো সময়ের মধ্যে বরকত আছে। কারো সময়ের মধ্যে বরকত নেই। এই যে আমরা বলি 'সময় কোনো দিক দিয়ে যায়' এটা হলো সময়ের বরকতহীনতার কারণে। আবার অনেকে বলে, 'সময় যাচ্ছে না কেনো? সময় কাটছে না কেনো?'-এটা কখনো হয় পেরেশানীর অবস্থা কিংবা দুঃখ-কষ্টের অবস্থার কারণে। সেটা ওযর। সেটা একটা স্বভাবের দুর্বলতা। এ ধরনের অবস্থা ছাড়াও কখনো মনে হয় সময় দ্রুত শেষ হয়ে গেল। কখনো মনে হয় সময় শেষ হয় না। মুমিনের শান এটাও না, ওটাও না। মুমিনের শান হলো সময়ের বরকত নষ্ট করে এমন কাজ থেকে বেঁচে থাকা। যাতে সময়ের বরকত লাভ করা যায়। আর সময় কাটানোর জন্যে কোনো কাজ পাচ্ছে না এমন অবস্থা তো মুমিনের হতেই পারে না। কারণ আল্লাহ তাআলা নেক আমলের এত উপায়, ইবাদতের এত রাস্তা খুলে রেখেছেন যে, সকল পরিস্থিতিতে সর্বাবস্থায় বান্দার জন্য নেক আমলের রাস্তা খোলা। তার এ কথা বলার সুযোগ নেই যে, 'সময় কাটছে না'। আমাদের দেশের যানজট তো যাকে বলে নজিরবিহীন। যানজটের সময় রাস্তায়

---

[১] সূরা তাওবা : ৩৬।

তাকালে আপনার মনে হবে, যেন বিশাল একটা গাড়ীর গ্যারেজ। সব একজায়গায় গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে আছে। এ যানজটে আমাদের অনেক সময় নষ্ট হয়। এ সময়গুলোকে কীভাবে কাজে লাগানো যায়?

গাড়ীতে আমি যিকরে ফিকরে সময় কাটাই। এরপর থেকে আমার ঘণ্টার পর ঘণ্টা জ্যামে পড়ে থাকলেও কোনো কষ্ট হত না। গরম লাগত এই যা। নয়ত বেকার বসে আছি রাস্তায় বসে আছি– এ পেরেশানী লাগত না।

মুমিনের জন্যে রাস্তা খোলা। আপনি কেনো ধরে রেখেছেন, ঐ কাজটি আমার কাজ। আরবে যে সকল স্থানে লম্বা লাইন ধরতে হয় সেখানে কিছু দূর পর পর লেখা থাকে- অর্থ্যাৎ 'অপেক্ষার মুহূর্তগুলো ইস্তিগফারের মাধ্যমে পূর্ণ করুন।'

মক্কা থেকে মদীনায় যাওয়ার পথে আপনি বড় বড় সাইনবোর্ডে লেখা দেখতে পাবেন, 'সুবহানাল্লাহ'। কিছু দূর গিয়ে আবার দেখতে পাবেন, 'আলহামদুলিল্লাহ'। এভাবে রাস্তায় বড় বড় সাইনবোর্ডে আপনি বিভিন্ন যিকির লেখা দেখতে পাবেন। এটা অনেক ভালো। এটাও এক প্রকার দাওয়াত। এটা দেখলে যিকরের কথা মনে হবে। তো আমাদের সময়গুলোকে কাজে লাগানোর জন্যে আল্লাহ অনেক উপায় রেখেছেন। যদি নেক কাজের প্রকার সীমিত হতো এবং এর জন্যে অনেক আয়োজন করতে হতো তাহলে এটা আমাদের জন্যে অনেক বড় পেরেশানীর কারণ হত। বরং বলা ভালো, এটাই হত আমাদের সব চেয়ে বড় পেরেশানী। কিন্তু আল্লাহ তাআলা নেক কাজ আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। অধিকাংশ নেক কাজই দেখবেন একেবারে সহজ। মুফতী তকী ছাহেব হুযুরের 'আসান নেকিয়াঁ' একটি খুব ভালো কিতাব। এ বিষয়ে বাজারে নতুন আরো কিতাব এসেছে। কিন্তু হযরতের কিতাব পুরানো। আর এ পুরো কিতাবটি হযরত লিখেছেন হাওয়াই জাহাযের উপরে।

আরবী শেখার সহজ উপায়

আরবী ভাষা ও সাহিত্য চর্চা বিগত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আরবী বিভাগ এবং কওমী মাদরাসার পাঠ্যসূচীর মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর সূচনালগ্ন থেকে আরবী ভাষা ও সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্র ও পরিধি বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে এবং এর জন্য পৃথক পাঠ্যসূচী, প্রতিষ্ঠান ও বিভাগ ব্যক্তি পর্যায়ে অথবা প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে গড়ে উঠে। এর জন্য এক বছর বা দু'বছর মেয়াদি কোর্সও চালু করা হয়। এসব কোর্সে সাধারণত কওমী মাদরাসার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্তকারী ও সনদপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা ভর্তি হয় এবং নতুন করে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে চর্চায় আত্মনিয়োগ করে। এর ফলে তারা আরবী ভাষার ক্ষেত্রে তাদের দুর্বলতা অনেকটা কেটে

উঠতে সক্ষম হয় এবং বলার ও লেখার যোগ্যতাও কমবেশী লাভ করতে সক্ষম হয়। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘ মেয়াদি আরবী ভাষা, ব্যাকরণ ও সাহিত্যের পাঠ্যক্রম সমাপ্ত করার পরও শিক্ষার্থীরা কেনো নতুন করে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের কোর্সে ভর্তি হয় এবং কমপক্ষে এক-দুই বছর ব্যয় করে? এর সহজ উত্তর হলো, আমাদের কওমী মাদরাসাগুলোর আরবী পাঠ্যক্রমের চূড়ান্ত লক্ষ্য আরবী ভাষা ও সাহিত্যে পাণ্ডিত্য অর্জন নয় বরং এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে- ❖ বিশুদ্ধভাবে আরবী ইবারত পাঠ করার দক্ষতা অর্জন।

❖ আরবী ভাষার গ্রন্থাদি পাঠ করে এর মর্ম উপলব্ধি করার দক্ষতা অর্জন।

❖ কুরআন ও হাদীসের অসাধারণ ভাষাগত নৈপুণ্যের সাথে পরিচিতি লাভ।

তবে এটা অনস্বীকার্য যে, কওমী মাদরাসার আরবী পাঠ্যক্রমেও এমন মৌলিক উপাদান রয়েছে যার মাধ্যমে একজন প্রতিভাধর শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত সাধনা ও অনুশীলনের মাধ্যমে আরবী ভাষায় বুৎপত্তি অর্জনে সক্ষম হতে পারে।[১]

এখানে একটা বিষয় পরিষ্কার হওয়া উচিত। সেটা হচ্ছে, ভাষা চর্চা ও সাহিত্য চর্চা কি একই বিষয়? নিরেট সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে কি ব্যবহারিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় ভাষার দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব? এর পরিষ্কার ও যথার্থ উত্তর হলো, না। কারণ, যে কোনো ভাষার প্রাচীন সাহিত্যধর্মী গদ্য ও পদ্যের ভাষা হচ্ছে দুর্বোধ্য, দৈনন্দিন জীবনে অব্যবহৃত এবং ব্যবহারিক জীবনের ভাষার প্রয়োজন পূরণে অক্ষম। এই বাস্তবতা কেবল আরবী ভাষার ক্ষেত্রেই নয় পৃথিবীর জীবন্ত যে কোনো ভাষার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ও লক্ষ্যণীয়। তাই আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, আরবী সাহিত্যের প্রাচীন পদ্য 'আস সাবউল মু'আল্লাকাত', 'দিওয়ানুল হামাসা', 'দিওয়ানুল মুতানাববী' এবং প্রাচীন গদ্য বিশেষ করে 'মাকামাতে হারিরী' ইত্যাদি প্রামাণ্য ও উচ্চাঙ্গের সাহিত্যে গ্রন্থাদি পাঠ করে দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক ভাষা শিক্ষা করা আদৌ সম্ভব পর নয়। আর এ কারণেই শিক্ষার্থীরা এসব গ্রন্থাদি পাঠ করেও ভাষাগত দুর্বলতা কাটিয়ে উঠার জন্য নতুন করে ভাষাচর্চা করতে বাধ্য হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী ও আরবী সাহিত্যের শিক্ষার্থীরা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেও ঐ একই কারণে নতুন করে ভাষা কোর্সে ভর্তি হতে বাধ্য হয়।

আদবের সংজ্ঞা : সাহিত্য হচ্ছে বিরচিত প্রাঞ্জল বক্তব্য- সেটা কাব্য হোক অথবা গদ্য- যার লক্ষ্য হচ্ছে পাঠক ও শ্রোতাবৃন্দের আবেগকে প্রভাবিত করা।

---

[১] বিশেষ করে যেসকল কওমী মাদরাসায় মাদানী নেসাবের কিতাবগুলো পড়ানো হয়।

যে কোনো ভাষা সাহিত্য চর্চার জন্য যা একান্ত প্রয়োজন

❖ শব্দমালা (اَلْمُفْرَدَاتُ) ❖ ব্যাকরণ (اَلنَّحْوُ وَالصَّرْفُ)

❖ শব্দতত্ত্ব (عِلْمُ الْمَعَانِيْ) ❖ বর্ণনা বিদ্যা (عِلْمُ الْبَيَانِ)

❖ শব্দালঙ্কার (عِلْمُ الْبَدِيْعِ) ❖ ছন্দশাস্ত্র (عِلْمُ الْعُرُوْضِ)

❖ কল্পনা (اَلْخِيَالُ) ❖ আবেগ (اَلْعَاطِفَةُ)

প্রাথমিক ভাষা শিক্ষার কোর্স। এই কোর্সের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা আরবী ভাষায় বলা, লেখা ও পড়ার যোগ্যতা অর্জনের একটা কার্যকর সুযোগ পায়। এই মৌলিক ভাষিক যোগ্যতা বিশেষ করে পড়া ও বলার যোগ্যতা যথাযথ ও কাঙ্ক্ষিত মানে অর্জন করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। যথা : ❖ উচ্চারণের বিশুদ্ধতা (صحة النطق)

❖ শব্দ কাঠামোর বিশুদ্ধতা (صحة الضبط)

❖ এ'রাবের বিশুদ্ধতা (صحة الإعراب)

❖ বাচনভঙ্গির বিশুদ্ধতা (صحة الأداء)

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও যথার্থ বাচনভঙ্গি পৃথিবীর যে কোনো ভাষায় বলা ও পড়ার যোগ্যতা অর্জনের জন্য অপরিহার্য বলে বিবেচিত। তবে সাধারণ আরবী ভাষায় যেহেতু স্বরচিহ্ন বা হরকত থাকে না, সাথে সাথে আরবী ভাষায় এমন অনেক শব্দ আছে যার একাধিক কাঠামো থাকলেও তা একক বানানে লেখা হয় তাই সেগুলো পড়ার সময় বাক্যের পূর্বাপর ও প্রসঙ্গ অনুযায়ী সঠিক কাঠামো নির্ণয় করে তা উচ্চারণ করতে হয়। এ জন্য আরবী শব্দের একাধিক কাঠামো ও কাঠামোভেদে অর্থের পার্থক্য বিশেষভাবে জানতে হয়। এর জন্য শিক্ষার্থীদেরকে পরিশ্রম ও ব্যাপক অনুশীলন করতে হয়।

পরিশেষে ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হলো, ভাষিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য ভাষা চর্চাটা হতে হবে সামগ্রিক এবং তা অবশ্যই ব্যবহারিক, তাত্ত্বিক ও জ্ঞান-বিজ্ঞান ভিত্তিক এবং প্রয়োজন পূরণে হতে হবে কার্যকর ও ফলপ্রসূ। আর এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ভাষা চর্চার পাশাপাশি ব্যক্তি পর্যায়েও নিয়মতান্ত্রিক ও বাস্তবভিত্তিক সাধনা ও অনুশীলন। অন্যথায় আমাদের পক্ষে কাঙ্ক্ষিত মানের আরবী, ইংরেজী ও বাংলা ভাষা শিক্ষা সম্ভব হবে না।

ইংরেজি শেখার সহজ উপায়

ইংরেজি একটি আন্তর্জাতিক ভাষা। বিশ্বের বহু দেশে এই ভাষা প্রচলিত আছে। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায়ও ইংরেজি রয়েছে। বাধ্যতামূলক ভাবে প্রত্যেক শ্রেণিতে বাঙালিদের ইংরেজি পড়তে হয়। তবে বিভিন্ন কারণে বাঙালিদের কাছে এটি একটি দুর্বোধ্য ভাষা। এর অন্যতম প্রধান কারণ বাল্যকালে ইংরেজি চর্চা না করা। প্রাথমিক শিক্ষায় পাঠ্য বিষয় হিসেবে ইংরেজি থাকার পরও দক্ষ ও কৌশলী শিক্ষকের অভাবে শেখা হয় না। যে উপায়ে ইংরেজি পড়ানো হয় তাও সুন্দর নয়। তাছাড়া শব্দ ভান্ডারের স্বল্পতার কারণে শিক্ষার্থীরা ভালো ভাবে ইংরেজি বলতে ও লিখতে পারে না। এ সমস্যা দূর করতে হলে নিচের নিয়মগুলো মেনে চললে ইংরেজিতে দক্ষতা অর্জন করা আশা করি সহজ হবে।

❖ ইংরেজিতে দক্ষতা অর্জন করতে হলে বাল্যকাল থেকে শিক্ষার্থীদের চর্চা করতে হবে। বাল্যকাল থেকে ইংরেজির ভিত্তি মজবুত করা না গেলে উপরের শ্রেণিতে উঠে তা করাটা অত্যন্ত কঠিন হয়ে যায়।

❖ ইংরেজি বিদেশী ভাষা হওয়ার কারণে ইংরেজির প্রতি শিক্ষার্থীদের মনে একটা অজানা ভয়-ভীতি এসে স্থান করে নেয়। প্রকৃতপক্ষে বাংলা ভাষার চেয়ে ইংরেজি কঠিন কিছু নয়, মনের ভয় দূর করে একটু মনোযোগ দিয়ে চর্চা করলেই শেখার কাজটি সহজ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে প্রথমেই মন থেকে গ্রামারের ভীতি দূর করতে হবে। বিভিন্ন ভাবে গ্রামারের বাস্তব ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রামার শিখতে হবে। তাছাড়া ইংরেজি পত্র- পত্রিকা পড়া ও চর্চা করলে ইংরেজি শেখা কঠিন কিছু নয়।

❖ ইংরেজিতে দক্ষ হতে হলে প্রচুর শব্দ জানতে হবে। যার শব্দভান্ডার যত বেশি থাকবে, সে ইংরেজিতে তত পারদর্শী হবে। তাই প্রতিদিন ডিকশনারিতে চোখ দিবে। প্রতিদিনই মুখস্থ করতে হবে কয়েকটি শব্দার্থ। শুধু মুখস্থ করে রেখে দিলেই হবে না, শব্দগুলোকে বাক্যে প্রয়োগ করতে হবে, তাহলে লেখার লেখার ক্ষেত্রে দক্ষতা এসে যাবে।

❖ লেখার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের বলার দক্ষতাও অর্জন করা প্রয়োজন। এজন্যে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যারা ইংরেজি জানে, তাদের সাথে কথা বলতে হবে। পরিবার থেকে জড়তা কাটিয়ে প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবের সাথে কথা বলতে থাকলে আস্তে আস্তে ইংরেজি বলার কৌশল আয়ত্ত হয়ে যাবে। কখনো যদি ভুল-ত্রুটি হয়, তাতে লজ্জার কিছু নেই। মনে রাখতে হবে, অন্ধকারের পরেই যেমন আলোর অবস্থান, তেমনি ভুলের পরেই নির্ভুল ইংরেজি আশা করা যায়। ভুলের ভয়ে যদি চর্চাই বন্ধ হয়ে থাকে, তবে তো শেখার কোনো সম্ভাবনাই থাকে না।

❖ অনেকেই শিক্ষকের সাথে ইংরেজিতে কথা বলতে ভয় পাও। এই ভয় মন থেকে দূর করতে হবে। মনে রাখবে, শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকই তোমাদের সবচেয়ে

বড় প্রিয় বন্ধু। তাদের সাথে কথা বলে তোমরা যতটা উপকৃত হতে পারো, আর কারো সাথে ততটা নয়। কাজেই শিক্ষকের সাথে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে তোমরা দ্রূত ইংরেজিতে দক্ষতা অর্জন করতে পারবে।

গণিত শেখার সহজ উপায়

এদেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থীর মনে অংকের ভয় বিরাজমান। বিশেষ করে মানবিক শাখার শিক্ষার্থীরা অংকের স্পর্শ থেকে সব সময় দূরে থাকতে চায়। তবু এস,এস,সি পরীক্ষা পর্যন্ত সাধারণ গণিত থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। অংকের চর্চা কম বলেই মানবিক শাখার শিক্ষার্থীরা বেশির ভাগ অকৃতকার্য হয়।

অংক এমন একটি বিষয়, যা অন্যান্য বিষয়ের মতো মুখস্থ করা যায় না। অংক বুঝতে হয়, না বুঝলে করা যায় না। কিন্তু ভালো ভাবে বুঝিয়ে করাতে পারেন, দেশে এমন শিক্ষকের অভাব। এজন্যেই শিক্ষার্থীরা অংকে কাঁচা থাকে। অনেক পরিবারেই অংক জানা লোকের কোটা শূন্য। সব মিলিয়ে অংক ভীতি বাঙালি শিক্ষার্থীদের সর্বক্ষণ তাড়া করে ফেলে। ফলে অনেক সময় সহজ অংক তাদের কাছে কঠিন মনে হয়।

মনে রাখতে হবে, মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। আল্লাহর রহমতে মানুষের অসাধ্য বলে কিছু নেই। চেষ্টা করলে মানুষ সবই পারে। পৃথিবীতে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। কঠিন অংককে সহজ উপায়ে করা যায়, এমন কৌশলও মানুষেরই উদ্ভাবন। নিচে অঙ্ক সহজ করার উপায় সর্ম্পকে আলোকপাত করা হলো-

❖ অংক মানেই ভয়ের ব্যাপার একথাটা মন থেকে পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। প্রতিদিনই কম-বেশি চর্চা করতে হবে। অধ্যবসায় থাকলে ভয়কে জয় করা কঠিন কাজ নয়।

❖ যেসব অঙ্ক কঠিন মনে হয়, করতে গিয়ে ফলাফল মেলে না, সেসব অংক শিক্ষকের কাছ থেকে বুঝে নিয়ে বারবার নিজে নিজে করবে। যে কোনো অংক একবার ভালোভাবে বুঝে গেলে তা আর কখনো ভুলবে না।

❖ শিক্ষা জীবনের প্রারম্ভে অংকের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। জোর দিতে হবে অভিভাবকের পক্ষ থেকেই। অংকের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করতে হবে শিশুদের। কোনো বিষয়ে যদি কারো আকর্ষণ সৃষ্টি হয়, সে বিষয়টি আর তার কাছে কঠিন মনে হয় না। নিয়মিত দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে মোটা কাগজে লিখিত নামতা, বীজগণিতের সূত্র, জ্যামিতির চিত্র প্রভৃতি শিক্ষার্থীর পড়ার কক্ষে চোখের সামনে রাখতে হবে। এমন ভাবে টাঙাতে হবে, যাতে টেবিলের পাশে চেয়ারে বসেই তা পড়া যায়। নিয়মিত চোখ তাকাতেই সূত্রগুলো এমনিতেই মুখস্থ হয়ে যাবে। যদি গণিতের নিয়মগুলো একবার আয়ত্ত হয়ে যায়, তাহলে এর চেয়ে সহজে বেশি নম্বর তোলার মতো আর কোনো বিষয় নেই।

ইলমের সাথে ইলমের আদব শিক্ষা করা জরুরী

ইলম শেখার পূর্বে ইলমের আদব শেখা উচিত। ইমাম ইবনে সিরীন রহ.বলেন- 'তারা যেমন ইলম শিক্ষা করতেন তেমনি আচার-আচরণও শিক্ষা করতেন।'[১]

আমি একটু কম করেই বলেছি যে, ইলমের আগে না হলেও অন্তত ইলমের সাথে অবশ্যই ইসলামী আদব, বিশেষ করে ইলমের আদব শিখতে থাকা উচিত। কিন্তু এখন বাস্তবতা এই যে, প্রাতিষ্ঠানিক তলবে ইলমের সময় শেষ হওয়ার পরও আমরা ইলমের গুরুত্বপূর্ণ আদব থেকেই উদাসীন থাকি। ইলম অর্জনের (?) পরও যেন আমরা আদব শেখার প্রতি আগ্রহী নই! ফরয পর্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ আদব হলো ইলম শেখার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করা। ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে নবীজীর আদর্শের পরিপন্থী যেন কখনোই না হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- "এজন্য ইলম অর্জন করো না যে, তা দ্বারা আলেমের সাথে গর্ব করবে বা মূর্খদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হবে কিংবা মজলিসের অধিকর্তা হবে। যে এমন করবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম।"[২]

যেমন বলা হয়ে থাকে- আমার কাছে এটি জটিল মনে হচ্ছে। কারো কাছে কোনো কথা বা বিষয় জটিল মনে হলে, কোনো বিষয়ে সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি হলে কিংবা কিতাবের কোনো কথার যথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহ হলে তার এই প্রশ্নটি যথাযথ আদব ও বিনয়ের সাথে উস্তাযের নিকট পেশ করতে পারে। কেনোনা এটি হলো ইলম শেখারই অংশ। তবে তা হতে হবে সংশ্লিষ্ট পূর্ণ আলোচনা শেষ হওয়ার পর। কারণ আলোচনার মাঝে থামিয়ে দেয়াও আদব পরিপন্থী। তাছাড়া এমনও হতে পারে যে, আলোচনার শেষ ভাগে আপনার প্রশ্নে উত্তর পাওয়া যাবে। তখন তো আপনি নিজেই লজ্জা ও সংকোচ বোধ করবেন।

শ্রেণি কক্ষে শিক্ষক-শিক্ষিকাকে প্রশ্ন করার নিয়ম

প্রশ্ন করার আগে অনুমতি গ্রহণ করা এবং প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে কখনো তর্কের ভাব প্রকাশ না পাওয়া। কেনোনা এটি মারাত্মক বেআদবী। আর তখন তা 'ইশকাল' থাকে না, 'ইতিরাযে' পরিণত হয়। ইশকাল করতে কোনো বাধা নেই। কিন্তু ইতিরায করা সম্পূর্ণ আদব পরিপন্থী। ইতিরায হলো আপত্তি করা, উস্তায ও আলোচনার মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে যাওয়া। এটি কীভাবে জায়েয হতে পারে? ইশকালের মর্ম বোঝার পর এ কথা বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, তালিবে ইলম উস্তাযের কাছে শুধু এমন বিষয় জিজ্ঞাসা করবে, যে বিষয়ে বাস্তবেই তার

---

[১] আলজামি লিআখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামে, খতীব বাগদাদী ১/৭৯।

[২] ইবনে হিববান, হাদীস : ৭৭।

কোনো প্রশ্ন বা সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। যে বিষয়টি তার জানা আছে, অন্য কোন উস্তায বা আলেমের কাছে শুনেছে, কোন শরাহ্ বা হাশিয়ায় পেয়েছে কিংবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কোন কিতাব বা ইলমী সাময়িকীতে পড়েছে তা তো অজানা নয়। তবে কেনো তা উস্তাযকে জিজ্ঞাসা করবে? তাও আবার দরসের মধ্যে?!

অধ্যয়নের প্রতি গুরুত্ব দেয়ার একটি বড় হেকমত এটাও, যেন সব বিষয় উস্তাযের নিকট জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন না হয়। তাই যে বিষয়টি জানা আছে, যে বিষয়ে কোনো সন্দেহ সৃষ্টি হয়নি তা উস্তাযের নিকট জিজ্ঞাসা করার পিছনে কী রহস্য থাকতে পারে? সাথীদের অবগতি উদ্দেশ্য হলে তাকরারের সময় বলে দেয়া যায়। তবে কি নিজের ইলম প্রকাশ করা উদ্দেশ্য? নাকি উস্তাযকে পরীক্ষা করা, উস্তাযকে পেরেশান করা উদ্দেশ্য? এগুলো কি ভালো কাজ? এগুলো ছাড়া আর কী হেকমত হতে পারে? আমি বা-আদব ও সমঝদার তালাবাকে দেখেছি, বিভিন্ন শরহ ও হাশিয়া থেকে যা তাদের বোঝা সম্ভব ছিল তা দরসে জিজ্ঞাসাই করতেন না। অধ্যয়নের পূর্বেও করতেন না, পরেও না। সারকথা, নিজের ইলম প্রকাশের জন্য বা জিজ্ঞাসিত ব্যক্তিকে পেরেশান করার জন্য কিংবা উদ্দেশ্যহীনভাবে দরসে অযথা কোনো কথা জিজ্ঞাসা করা ইলম ও উস্তাযের আদবের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আর এমন আচরণ তালিবে ইলমের ধ্বংসের কারণও হয়ে যেতে পারে।

ইশকাল করার একটি গুরুত্বপূর্ণ আদব এই যে, নিজ প্রতিষ্ঠানের কোনো উস্তায বা নিজ উস্তাযের কোনো সমবয়সী আলেম বা আলেমা কিংবা তাঁর কোনো উস্তাযের কোনো কথাকে দলিল হিসেবে ইশকাল না করা। এটাও উস্তাযকে পেরেশান ও অপ্রস্তুত করার শামিল। তেমনিভাবে উস্তাযের চেয়ে পদ-স্তর বা বয়সে ছোট কোনো আলেমের উদ্ধৃতি দিয়ে অথবা যাদের সাথে তাঁর তবিয়তের অমিল আছে তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করা সব কিছুই পরিত্যাজ্য। শায়খুল হাদীস যাকারিয়া কান্ধলভী রহ.-এর 'আপবীতী' কিতাবটি আমাদের অধ্যয়ন করা উচিত। এটি অনেক উপকারী কিতাব। মাওলানা ওবায়দুল হক রহ. কিতাবটি অধ্যয়নের জন্য গুরুত্ব দিতেন।

এই কিতাবে শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ. একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন- "একই সময়ের শিক্ষকগণের কোনো কথা বর্ণনা করতে চাইলে আগ্রহ ভরেই করা যায়, তবে শিক্ষক বা শিক্ষিকার নাম উল্লেখ না করে। এ বিষয়টির প্রতি নিজেও গুরুত্ব দিতাম এবং শিক্ষার্থীদেরকে শুরু থেকেই বলতাম।

মূলকথা, ইলমের জন্যও অনেক বুদ্ধির প্রয়োজন। সহনশীলতা ও আদব থাকা দরকার। কোনো কথা উস্তাযকে কখনোই জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়, কোনো কথা

নির্জনে বা বিশেষ মজলিসে জিজ্ঞাসা করা উচিত আর কোনো কথা দরস বা সাধারণ আলোচনায় জিজ্ঞাসা করা যায় আবার কোনো কথা শুধু এমন উস্তাযকেই জিজ্ঞাসা করা উচিত, যার সাথে দুই দিক থেকেই (অবশ্যই আদব ও ভাব-গাম্ভীর্যতা বজায় রেখে) বে-তাকাল্লুফির সম্পর্ক রয়েছে-এসব বিষয়ের বিবেচনা ও পার্থক্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিতাব ও বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান, পাঠ্যভুক্ত কিতাবের আলোচনার বাইরে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অতিরিক্ত আলোচনা সবকিছু তালিবে ইলমের দায়িত্বে। তারা অধ্যয়ন করে এসব অর্জন করবে। এ বিভাগে হাওয়ালার প্রতি যে গুরুত্ব দেয়া হয় এবং বিভিন্ন বিষয়ের উপর একাধিক কিতাবের নাম উল্লেখ করা হয় এর বড় উদ্দেশ্য তো এটাই যে, তালিবুল ইলম তা নিজেই অধ্যয়ন করবে এবং এসব বিষয়ের জন্য শিক্ষক বা শিক্ষিকাদেরকে কষ্ট দিবে না। কোনো বিষয় না বোঝলে নির্জনে অনুমতি নিয়ে সংশ্লিষ্ট মাওয়াদ উস্তাযের সামনে পেশ করে সন্দেহ সমাধা করার চেষ্টা করবে। এর জন্য উস্তাযকে কষ্ট দেয়া (যেমন, উত্তর দেয়ার কষ্ট বা খুঁজে বের করার কষ্ট ইত্যাদি) কখনো সমীচীন নয়।

দরস গ্রহণের এক গুরুত্বপূর্ণ আদব এটাও যে, কোনো মর্ম ও ব্যাখ্যা বর্ণনার ক্ষেত্রে কিংবা সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে উস্তাযের কোনো ভুল হয়ে গেলে (যা হওয়া খুবই সম্ভব) আর তালিবে ইলমের এ সম্পর্কে অবগতি থাকলে দরস বা সাধারণ আলোচনায় উস্তাযের নিকট তা বলতেন না; বরং নির্জনে গিয়ে পূর্ণ আদব বজায় রেখে উস্তাযের নিকট তা ব্যক্ত করবে। পরামর্শ প্রার্থনা বা মতামত প্রকাশের পদ্ধতিতে তাকে অবহিত করবে।

শিক্ষার্থী, শিক্ষিকা ও মজলিসের অবস্থার বিবেচনায় কখনো মজলিসেও আদবের সাথে ভুলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। কিন্তু আমাদের মতো তালিবে ইলমদের জন্য ঐ পন্থাই সবচেয়ে নিরাপদ, যা দারাকুতনী রহ. তাঁর উস্তাযের ক্ষেত্রে অবলম্বন করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনে কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ যিনি নাহু-লুগাতসহ কয়েকটি শাস্ত্রের ইমাম ও হাফেয ছিলেন প্রতি জুমাবারে তাঁর আলোচনা হতো। কোনো আলোচনায় একটি হাদীস ইমলা করানোর সময় সনদের এক রাবীর নামে ভুল করে ফেলেন। (হিববানকে 'হাইয়ান' বলেছেন বা এ জাতীয় কোন ভুল।)

দারাকুতনী রহ. সেই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, আমি চিন্তা করলাম, তিনি এত বড় মানুষ, তাঁর সূত্রে লোকেরা এই ওহাম লিখে নিবে, এটা কেমন কথা? কিন্তু তাঁকে এই ভরা মজলিসে কী করে বলি? দারাকুতনী বলেন, মজলিস শেষ হলে আমি তাঁর মুসতামলীকে বললাম যে, অমুক নামের ব্যাপারে শায়খের ভুল হয়ে গিয়েছে। সঠিক হলো এই- দারাকুতনী বলেন, পরবর্তী জুমায় আমি মজলিসে উপস্থিত হলে শুরুতেই ইবনুল আনবারী রহ. খাদেমকে বললেন, লোকদেরকে বলে

দাও যে, গত জুমায় অমুক হাদীস ইমলা করার সময় সনদের অমুক নাম উচ্চারণে আমি ভুল করে ফেলেছি। সঠিক নাম এই। আর এ কথাও বল যে, ওই যুবক (দারাকুতনীর দিকে ইঙ্গিত করে) আমাকে তা সংশোধন করে দিয়েছিল।[১]

হযরত দারাকুতনী রহ.-এর ঘটনা থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

হযরত নানুতুবী রহ.-এর একটি ঘটনা প্রসিদ্ধ। হযরত হাজ্বী ছাহেব রহ.তাকে একটি খসড়া লেখা স্পষ্ট করে লিখে দেয়ার জন্য দিলেন। ঘটনাক্রমে তাতে একটি শব্দ ভুল লেখা ছিল। তিনি ভাবলেন, নিজে থেকে সঠিক শব্দ লিখলে তা বে-আদবী হবে। আবার ভুলইবা কীভাবে লিখবেন? তাই সে জায়গা তিনি খালি রেখে দিলেন এবং হযরত হাজ্বী ছাহেব রহ.-এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন, হযরত! এই শব্দটি বুঝতে পারছি না। হযরত তা নিজেই শুদ্ধ করে দিলেন।[২]

ফার্সী ভাষায় একটি প্রসিদ্ধ উক্তি আছে- অর্থাৎ যে শিক্ষার্থী 'কেনো -কীভাবে' প্রশ্ন করে না আর যে মুরীদ 'কেনো-কীভাবে' প্রশ্ন করে উভয়কেই জঙ্গলে পাঠিয়ে দেয়া উচিত। এই উক্তির অর্থ এই নয় যে, অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করতে হবে। এর উদ্দেশ্য হলো বুঝেশুনে পড়া। আর তাহকীকের প্রয়োজনে যথাযথ আদব ও ভদ্রতার সাথে উস্তাযের কাছে নিজের ইশকাল ব্যক্ত করা এবং হাকীকত পর্যন্ত পৌঁছতে চেষ্টা করা। অবশ্য তালিবে ইলমীর একটি স্তর হলো, কোনো বিষয়ের বিশেষত্ব অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বোঝা অর্জিনকারী কোনো আহলে আত্মা ও আহলে আলেমের সাহচর্য গ্রহণ করা।

আর ওলিউদ্দীন ইরাকী রহ. ও ইবনুল হুমাম রহ.-এর মাঝে যা হয়েছিল তা এরই অন্তর্ভুক্ত। এতে বোঝা গেল, বহস ও মুনাকাশা (যুক্তিতর্ক ও গবেষণা-অনুসন্ধান)-এর সাথে পড়তে চাইলে আগে থেকেই অনুমতি নেয়া শর্ত। তবে এটা জরুরি নয় যে, উস্তাযের তবিয়ত সবসময় এর জন্য প্রস্তুত থাকবে। আর শিক্ষার্থীদের মধ্যে এর যোগ্যতা ও রুচি থাকা তো সর্বাবস্থায় শর্ত।

পড়া ভুলে যাওয়ার কারণ ও তার প্রতিকার

পড়া ভুলে যাই, পড়া বুঝে আসে না, মুখস্থ করা পড়া মনে থাকে না, পড়ালেখায় মন বসে না-এ অভিযোগ আমাদের অনেকেরই আছে। স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা ও মেধাহীনতা ছাড়া এর আর কী কারণ থাকতে পারে এবং এর প্রতিকার কী-এ সম্পর্কে আকাবিরদের ঘটনা উল্লেখ করছি।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, অবশ্যই আমি মনে করি, মানুষ তার শিক্ষা করা ইলম ভুলে যায় তার কৃত গুনাহর কারণে।[৩]

---

[১] শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ.-এর কিতাব 'সাফাহাত মিন ছাবরিল উলামা'য় (পৃষ্ঠা : ২৯৯)।

[২] কামালাতে আশরাফিয়া, পৃষ্ঠা : ১৬৪।

[৩] জামিউ বয়ানিল ইলম ১/১৯৬।

হযরত ইবনে আববাস রা. মানুষের বাহির ও ভিতরে নেক কাজ ও অসৎ কাজ কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, নেক আমলের কারণে অন্তরে নূর সৃষ্টি হয়, দেহের শক্তি বাড়ে, চেহারায় শুভা বৃদ্ধি পায়, রিযিক প্রশস্ত হয় এবং মানুষের অন্তরে তার জন্য ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে গুনাহ অন্তরকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে, চেহারাকে বিবর্ণ ও মলিন করে, দেহকে শক্তিহীন ও অলস করে দেয়। রিযিক সঙ্কুচিত করে এবং মানুষের অন্তরে তার প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে।

হযরত ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর সামনে কোনো মাসআলা যখন জটিল হয়ে যেত এবং তার সমাধান বের হত না তখন তিনি সাথীদের বলতেন, এটা আমার কোনো গুনাহর কারণে হচ্ছে। অতপরঃ তিনি ইস্তেগফার করতেন। কখনো কখনো নামাযে মশগুল হতেন। তারপর সমাধান বের হওয়ার পর বলতেন, আশা করি আমার তওবা কবুল হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর এই আমলের কথা যখন হযরত ফুযাইল ইবনে আয়ায রহ.-এর নিকট পৌঁছল তখন তিনি খুব কাঁদলেন এবং বললেন, এটা তার গুনাহ কম হওয়ার প্রমাণ। অন্যরা তো এদিকে ভ্রুক্ষেপও করে না।[১]

❖ মগজ শুকে যাওয়া। ❖ স্নায়ু সঞ্চালকের স্বল্পতা দেখা দেয়া।

❖ সেরিব্রাল কর্টেক্স, হিপোক্যাম্পাস আর অ্যামিগডালার স্মৃতি সংক্রান্ত কাজে সমন্বয়ের অভাব। ❖ স্মৃতির জন্য অপরিহার্য মেমোরি সার্কিটগুলো ঠিকভাবে কাজ না করা বা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় পড়া ভুলে যায়।

বিখ্যাত ইমাম ও হাফিযে হাদীস ওয়াকী ইবনুল জাররাহ আলকুফী রহ. সম্পর্কে হযরত ইসহাক ইবনে রাহোয়া রহ. বলেন, লোকেরা পরিশ্রম করে মুখস্থ করে আর তার মুখস্থ হয়ে যায় স্বভাবগত স্মৃতিশক্তির কারণে। তেমনি আলী ইবনে খাশরাম রহ. বলেন, আমি ওয়াকীকে দেখেছি তবে তার হাতে কখনো কিতাব দেখিনি; বরং তিনি শুধু মুখস্থই করেন। আমি তাকে এ অসাধারণ স্মৃতিশক্তির রহস্য জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, গুনাহ থেকে মুক্ত থাকা। স্মৃতিশক্তির পক্ষে এর মতো কার্যকর আর কিছু দেখিনি।[২]

ইমাম শাফেয়ী রহ. তাঁর নিকটই স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার অভিযোগ করেছিলেন। তখন তিনি গুনাহ ত্যাগ করার উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ইলম হলো আল্লাহর নূর আর আল্লাহ তাঁর নূর কোনো গুনাহগারকে দান করেন না।

ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহ. গুনাহের ক্ষতি ও কুপ্রভাব সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। তাঁর প্রায় একশ পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনা থেকে কয়েকটি কথা এখানে

---

[১] তবকাতুল হানাফিয়্যাহ ২/৪৮৭।

[২] তাহযীবুত তাহযীব ১১/১২৯।

তুলে ধরছি। তিনি বলেন, গুনাহ মুখস্থ করা ইলম ভুলে দেয় এবং ইলম থেকে বঞ্চিত করে। রিযিকের অভাব এবং পেরেশানি-দুশ্চিন্তার সম্মুখীন করে। অন্তরকে কঠোর ও কলুষিত করে। বিবেক-বুদ্ধি বিনষ্ট করে। আমল-আখলাক ধ্বংস করে। আল্লাহর রহমত হতে দূরে সরে দেয়, কল্যাণের পথ রুদ্ধ করে এবং নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করে। ইবাদত ও নেক আমলের শক্তি কমে যায় এবং কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে। গুনাহর প্রভাবে মানুষের দৃষ্টিশক্তি লোপ পেতে থাকে। গুনাহ মানুষের দেহ ও মনে যে খারাপ প্রভাব বিস্তার করে এবং কত ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।[১]

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. এ প্রসঙ্গে বলেন- ইলম ঐ জিনিসকে বলে, যা গুনাহর কারণে দূর হয়ে যায় এবং যা কোনো গুনাহগার অর্জন করতে পারে না। ইলম যদি হয় কিছু শব্দ জানার নাম তাহলে তা গুনাহর মাধ্যমেও অর্জন করা যায়। এমনকি কাফের-মুশরিকেরাও তা অর্জন করতে পারে। বৈরুত ও জার্মানিতে অনেক খৃষ্টান আরবী সাহিত্যিক রয়েছে, যাদের মেধা ও স্মৃতিশক্তিও খুব ভালো। কিন্তু তার নাম ইলম নয়। প্রকৃতপক্ষে ইলম একটি নূর। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে এক জ্যোতি এবং এমন এক কিতাব, যা সত্যকে স্পষ্ট করে।[২]
করে।[২]

এই নূর তথা ইলমকে আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে রূহ শব্দে আখ্যায়িত করেছেন। ইরশাদ হয়েছে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নিজ রূহ দ্বারা সাহায্য করেছেন।[৩]

অর্থাৎ অদৃশ্য নূর দান করেছেন, যার দ্বারা তারা এক বিশেষ রকমের শক্তি ও পবিত্রতা লাভ করে। ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর অন্তরে আল্লাহ তাআলা একটি নূর দান করেছিলেন। যার ফলে তিনি যাই বর্ণনা করতেন, সম্পূর্ণ বিশুদ্ধভাবেই বর্ণনা করতেন। তাই ইলমের প্রকৃত রূপ ও আসল বৈশিষ্ট্য হলো একটি নূর, যার সম্পর্কে অন্যত্র আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, আমি তার জন্য এক আলোর ব্যবস্থা করেছি, যা নিয়ে সে মানুষের মাঝে চলে।[৪]

এই নূর অর্জনকারী ব্যক্তির অবস্থা এমন হয় যে, যদি তার চতুর্দিকে তলোয়ার নিয়ে ঘিরে ফেলা হয় তবুও তার অন্তরে কোনো আতঙ্ক সৃষ্টি হয় না।[৫]

---

[১] আলফাওয়ায়েদ ও আলজাওয়াবুল কাফী।
[২] সূরা মায়েদা : ১৫।
[৩] সূরা মুজাদালা : ২২।
[৪] সূরা আনআম : ১২২।
[৫] আল-ইলম ওয়াল ওলামা।

এ সম্পর্কে বর্তমান সময়ের মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, লেখাপড়াকে ভালোবাসতে হবে। মন থেকে তীব্র আকর্ষণ থাকতে হবে। আন্তরিকভাবে বিষয়টাকে গ্রহণ করতে হবে। যদি সে রকম না হয় তাহলে কোনো পড়াই মনে রাখতে পারবে না। অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় সারা দিন ধরে পড়ছে। তাৎক্ষণিকভাবে পড়াটি হয়ত শিখছেও। আবার পরক্ষণে ভুলে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে পূর্ণ মনোযোগের অভাবে এমনটি হয়। তাই লেখাপড়ার সময় মনোযোগ বিঘ্নিত হয় এমন কোনো কাজ করা যাবে না।

হাতের লেখা সুন্দর করার সহজ কৌশল

❖ লেখা সুন্দরের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করা।

❖ বাংলা লেখার ক্ষেত্রে লাইনের উপরের দিক, আরবী লেখার ক্ষেত্রে নিচের দিক এবং ইংরেজি লেখার ক্ষেত্রে মাঝামাঝি দিক সোজা রাখা।

❖ দুই বা তিন মাস খুব সতর্কতার সাথে লিখতে হবে।

❖ প্রতিদিন কমপক্ষে এক ঘন্টা লিখতে হবে।

❖ অক্ষর ছোট বড় এবং সোজা-বাঁকা করা যাবে না।

❖ প্রত্যেক লাইনকে তুলনামূলকভাবে ঠিক সমান দূরত্ব রাখতে হবে।

❖ যাদের লেখা সুন্দর, তাদের লেখা হুবহু অনুসরণ করার চেষ্টা করা।

❖ শিক্ষক যখন লিখেন, তখন তাঁর ডান পার্শ্বে বসে তিনি কলম দিয়ে কিভাবে লিখছেন তা মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করতে হবে এবং সেভাবে লেখার চেষ্টা করতে হবে। এসব কৌশল অবলম্বন করলে সহজেই সাফল্য হতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

নিজের পড়া নিজে যেভাবে হিসাব রাখবেন

আপনি যে বিষয় পড়বেন, সে বিষয়ের শিরোনাম, মূল কথা, নিজের স্মৃতি থেকে কত টুকু বুঝতে পারেন, আর পারেন না, তা যাচাই করলে পড়ার বোধশক্তির হিসাব করা সহজ হবে।

কম পড়লে বেশি সময় মনে রাখার উপায়

যখন কোনো পড়াকে দুই তিনজন একসাথে বসে আলোচনা করবে, তখন কঠিন বিষয় ও সহজ হয়ে যাবে এবং বেশি সময় মনে থাকবে।

পড়া-লেখার প্রতি যেভাবে মনোযোগী হবেন

❖ শিক্ষা ছাড়া বাহিরের অন্য কোনো বিষয়ে অন্তরে স্থান না দেয়া।

❖ যত গভীর ভাবে পড়ার প্রতি মনকে যুক্ত করবেন, পড়াকে তত সহজে মনে বা স্মৃতিতে রাখতে পারবেন।

❖ শিক্ষা জীবনে পড়া-লেখার প্রতি যে কোনো বিষয়ে গভীর মনোনিবেশের অভ্যাস করতে হবে। ❖ যা পড়ছি তা স্মৃতি বা মন থেকে চলে যাওয়ার একমাত্র কারণ হলো- পড়ছি ঘরে কিন্তু মন খেলার মাঠে, বাহ্যিক জগতে, পাশে কোনো আওয়াজ হচ্ছে সেখানে বা রান্নার ঘরে ইত্যাদি।

❖ বই সামনে খোলা শিক্ষার্থীদের চোখ বইয়ের পাতায়, মন হয়তো খেলার মাঠে, এ রকম নানা কারণ থেকে বিরত থেকে পড়ার প্রতি মনোনিবেশ করলে গভীর মনোযোগ সৃষ্টি হবে এর ফলে পড়া অতি সহজে মনে রাখা যাবে।

পরীক্ষায় তাড়াতাড়ি লেখার সহজ উপায়

পরীক্ষায় তাড়াতাড়ি লেখার অভ্যাস করা প্রয়োজন। তাড়াতাড়ি লেখার অভ্যাস করতে না পারলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করা কঠিন। বিশেষ করে পরীক্ষার হলে লেখা শেষ হওয়ার আগে সময় শেষ হয়ে যায়। তাই শিক্ষার্থীদের জীবনে তাড়াতাড়ি লেখার অভ্যাস গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। এ জন্য কতকগুলো বিষয়ে আগ থেকেই সতর্ক থাকতে হবে।

❖ যে বিষয় লেখা হবে সে বিষয় সম্পর্কে থাকতে হবে পরিষ্কার ধারণা, তা না হলে তাড়াতাড়ি লেখা সম্ভব হবে না।

❖ পড়ার টেবিল সব সময়ই গোছানো থাকতে হবে। বিশেষ করে লেখার সময় টেবিল গোছানো না থাকলে লেখা তাড়াতাড়ি লেখার প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে।

❖ পড়ার টেবিলের উপর বই, খাতা, কলম, ব্যাগ ইত্যাদি গুছে রাখলে টেবিলের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় থাকে, তাতে লেখার সময় হাতের সামনে কোনো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় না।

❖ তুমি যত বেশি লিখবে তত বেশি হাতের লেখা গতিশীল হবে। তাই নির্ভুল ভাবে বেশি বেশি লেখার চর্চা করতে হবে।

ছাত্রীদের মোবাইল ব্যবহারের নিয়ম

শিক্ষিকার মোবাইল ব্যবহার করবে। তা সময় নির্ধারণ করতে হবে, তবে তা ক্লাসের ক্ষতি হয় এমন সময় করা যাবে না। শিক্ষিকা লক্ষ্য করবেন কার সাথে কথা বলছে বা কতক্ষণ ধরে কথা বলছে ও কী কথা বলছে ইত্যাদি যাচাই করা শিক্ষিকার প্রকান্ত প্রয়োজন।

যেভাবে ক্লাসের প্রস্তুতি নিবেন

প্রস্তুতি অর্থ ঐ সকল পড়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করা, যেগুলি আগামীকাল শিক্ষক ক্লাসে পড়াবেন। শুরুতে আপনার মনে হতে পারে যে, "প্রস্তুতির কী লাভ। কারণ শিক্ষক যখন পূর্ণরূপে সহজভাবে পাঠদানের জন্য দায়বদ্ধ, তাহলে ক্লাসের প্রস্তুতির কী প্রয়োজন? কিন্তু বিশেষজ্ঞ বক্তব্য হচ্ছে- অর্থাৎ যে শিক্ষার্থী ফলদায়ক অধ্যয়নের ইচ্ছা রাখে, সেই ছাত্রের নিজের পক্ষ থেকে ক্লাসের প্রস্তুতি নেয়াই হচ্ছে, তার জন্য সব চেয়ে সঠিক ও সহজ পথ।"

এটা সর্বস্বীকৃত বিষয় যে, আপনার যতো বেশি সামনের ক্লাসের জন্য পরিশ্রম হবে তার উপকারীতা ও ততই বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তাই সমীচিন হবে, সচেতন মেজাজ আর উপস্থিত বুদ্ধি সহযোগে যেন সবক পাঠ করা হয়। যাতে করে সবকের তাৎপর্য সম্পর্কে অবগতি লাভ করা যায়। জটিল বিষয়গুলোর প্রতি মনোযোগ আর সময়ের দিকটি যেন নির্দিষ্ট হয় এবং এটাও যেন জানা যায় যে, কোনোটা বুঝে আসলো আর কোনোটা বুঝে আসলো না। আর কোন্ অংশটি বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। অধ্যয়ন না করার কারণে অনেক সময় কোনো কোনো শিক্ষার্থী ক্লাস চলাকালীন এমন র্নিবুদ্ধিতা ও মূর্খতা সূলভ প্রশ্ন করে বসে যদ্দরুন শিক্ষক অসন্তুষ্ট হন এবং ছাত্রের ও এমন ভাবে বিব্রত ও লজ্জিত হতে হয় যে, সে আর পুর্ণবার প্রশ্ন করে না। অতএব, বুঝা গেল পাঠ প্রস্তুতি অধিক থেকে অধিকতর বুদ্ধি ও যোগ্যতা সৃষ্টি করে থাকে।

সর্ব উত্তম শিক্ষা ও আসল গোল্ডেন প্লাস পাওয়ার উপায়

কুরআনে কারীমের অধ্যায়ন বেশি বেশি করা উচিত। কারণ এটা আল্লাহর প্রদত্ত উপহার আপাদমস্তক হেদায়েত। আল্লাহ মানব জাতিকে এই সর্বশ্রেষ্ঠ সত্তাগত ও উপহারটি কেয়ামত পর্যন্তের জন্য দান করেছেন। এর অধ্যয়ন মানব মন ও মননে সৎ বিপ্লব সৃষ্টি করে। আর যখন মানুষের মন এটার সাথে সংযুক্ত হয়ে যায় মানব রচিত গ্রন্থাবলী, প্রবন্ধ ও বক্তব্যসমূহ এর সামনে অর্থ হীন মনে হয়। কুরআনে পরিপূর্ণ অধ্যয়নের পর মানব জীবনের দিক পরিবর্তন হয় এবং তার মানসিক চারিত্রিক ও আত্মিক উন্নয়ন সঠিক পথে শুরু হয়। কুরআনের শিক্ষা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের জন্যে নেয়ামত হিসাবে বিবেচিত হয়।

হযরত মাওলানা আলী মিয়া নদভী রহ. কুরআনে কারীমের অধ্যয়ন সম্পর্কে লিখেন- শুনেছি কুরআনে মজীদের সাথে মানুষের মন যখন লাগতে শুরু করে মানব রচিত বই পত্র বক্তৃতাবলী তখন তার কাছে হীন ও অসার মনে হতে

থাকে, সাহিত্যিক, দার্শনিক বিজ্ঞানী আর গবেষকদের কথাগুলি শিশু সুলভ ও সাধারণ বলে পরিদৃষ্টি হয়। যে গুলিতে কোনো গভীরতা ও পরিপক্কতা আছে বলে মনে হয়না। সাদা কাগজে কালো নকশা ও অঙ্কন আর কাগজে ফুল বলে মনে হয়। যে গুলোর রং আছে সুগন্ধ নেই, মানুষের জ্ঞান অগভীর ও শূন্য মনে হয় আর এসব দীর্ঘক্ষণ পড়া রুচি ও মননের উপর বোঝা হয়ে ওঠে।

আসল গোল্ডেন প্লাস পাওয়ার উপায় : যে সব বিষয় উলূমে নুবুওয়্যতের ঝর্ণা ধারার সাথে সম্পৃক্ত নয়, সে সব সংশয়পূর্ণ এবং শব্দের তেরেসমা বলে মনে হয় প্রশান্তি আর স্বস্তি মাত্র ওহী ও নুবুয়াতের পথ দিয়ে আসা ইলম দ্বারাই হয়। যা রসূলল্লাহ সা. দুনিয়া পর্যন্ত পৌঁছেছেন যেটা ওহীর ভাষায় কুরআনে আর আরবী ভাষায় হাদীসে সংরক্ষিত আছে। অর্থাৎ-তোমায় উদ্দীষ্ট গন্তব্যের পথ বাতলে দিলাম। আমি তো পৌঁছতে পারি নি হয়তো তুমি পারবে। একই কিতাবের অন্য জায়গায় তিনি লিখেন- যদি কখনও আমাকে সমগ্র জ্ঞান ভান্ডার থেকে বঞ্চিত করা হয় আর শুধু দুইটি কিতাবের অনুমতি দেয়া হয় তাহলে আমি কিতাবুল্লাহ (কুরআন) আর যাদুল মা'আদ গ্রন্থ আমার সঙ্গে রাখবো। এটা আমাকে নামায, দুয়া ও যিকির, সফরের আদব, দৈনন্দিন জীবনের সুন্নাত পদ্ধতি শিখিয়েছে এবং সুন্নাতের জ্ঞান দান করেছেন।

লেখা-পড়ায় মন বসানোর পদ্ধতি

অধ্যয়নে মন না বসা শুধুই হীলা-বাহানা আর অবজ্ঞার প্রমাণ মন বসানোর তরীকা হচ্ছে যে, চিন্তা করা যে, এছাড়া গত্যন্তর নেই উদাহরণ স্বরূপ, যদি কারও বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা হয় আর সে শুনে থাকে যে, আইনের কোনো একটা দৃষ্টান্ত আমার জন্য সুফল বয়ে আনবে। তখন যদিও আইন পড়তে তার ভালো লাগেনা বরং বুঝেও আসেনা তখন কিন্তু সে মনে প্রাণে তাই পড়বে। এই সময় সে আইন গ্রন্থের বদলে কোনো মনোলোভা বই, যেমন আলিফ লায়লা কিংবা কোনো উপন্যাস নিয়ে বসে থাকবে না।

লেখা-পড়া করার সহজ পদ্ধতি

একবার দেখেই যথেষ্ট ভাববেন না। বরং দৈনন্দিন অধ্যয়ন করতে থাকুন। অভিজ্ঞতা সাক্ষী যে, একবারের দেখা খুব কমই মনে থাকে। বরং সিংহভাগই মন থেকে মুছে যায়। সুতরাং যদি কেউ একবার দেখেই কিতাব আলমিরাতে রেখে দিল তাহলে এটা দেখে লাভটা কী হলো?

❖ বই বা কিতাব পড়ুন, দুই চার পাতা দৈনিক অবশ্যই অধ্যয়ন করুন। জটিল স্থানে নিজের মতের উপর আমল করবেন না। বরং যেখানে সন্দেহ হয় তথায় পেন্সিল ইত্যাদির দাগ দিয়ে রেখে দিন। যখন দক্ষ আলেমের সাক্ষাত পাবেন

তার নিকট থেকে ভালো করে বুঝে নিবেন। অথবা কোনো আলেমের নিকট লিখে পাঠিয়ে দিন। তিনি এর মর্ম লিখে পাঠিয়ে দিবেন। রুটি খাওয়ার একটা স্থুল নীতি আছে যে, প্রতিটি গ্রাস ভালো ভাবে চিবিয়ে খাওয়া। মুখের লালায় তা ভালো করে মিশে নেয়া, যেন তা উদরে বোঝা হয়ে না দাঁড়ায় এবং তার পাকস্থলী সুস্থ থাকে। পড়ার জন্যও স্থুলনীতিটি ব্যবহার করুন যে, প্রতিটি শব্দ ও ছত্র এবং প্রতিটি ধারণাকে ভালো করে মননে চর্বণ করুন। পড়ার মাধ্যমে যে লালা মস্তিষ্কে তৈরী হয়েছে তার সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিন। যা পড়েছেন তা যেন উত্তমরূপে হজম হতে পারে। যদি এমনটা করা না হয় তবে তার ফলাফল খারাপ হবে, যার জন্য লেখককে দায়ী করা যাবেনা। যে রুটি ভালো করে চিবে খাওয়া হয়নি সেটা বদহজমির জন্য দায়ী কিভাবে হতে পারে?

সব কিতাব অধ্যয়ন যোগ্য নয় ঃ যাচাই না করে সব কিতাব অধ্যয়ন ফলদায়ক হয় না বরং ক্ষতিকর হয়। বর্তমানে মানুষ এই ভূলটি বেশি করছে যে, যে কিতাবটি ধর্মের নামে দেখে বা শুনে চায় এর বিষয় সত্য হোক কিংবা মিথ্যা হোক, লেখক হিন্দু কিংবা ঈসায়ী কিংবা নাস্তিক অথবা মুসলমান আবার সেই বেদআতী। যাচাই ও অনুসন্ধান ছাড়া যার তার কিতাব পড়া শুরু করে দেয়। এর দ্বারা ক্ষতিকর ক্ষতি লক্ষণীয়- ❖ কোনো কোনো সময় অপ্রতুল জ্ঞানের কারণে এটা পরস করা যায় না যে, এতে কোন্ বিষয়টি সঠিক আর কোন্টি ভ্রান্ত।

❖ ফলশ্রুতিতে কোনো ভ্রান্ত কথা সঠিক ভেবে বিশ্বাস ও আমলে ভুল করে বলে।

❖ কোনো কোনো সময় আগে থেকেই জানা থাকে যে এই বিষয়টি ভ্রান্ত। কিন্তু কোনো কোনো লেখকের বর্ণনাভঙ্গী এতেই আকর্ষণীয় ও মনোহারী হয় যে, পাঠক সাথে সাথেই প্রভাবিত হয়ে আর তার বিপরীতে নিজের আগের বিশ্বাসকে দূর্বল অযথা ভেবে সেটা কে ভ্রান্ত আর এটিকে সঠিক ভাবতে থাকে।

❖ কোনো কোনো সময় সেটাকে মন গ্রহণ করে না কিন্তু দ্বিধা দ্বন্দ্বে দোদুল্য আর ছয় পাঁচে পতিত হয় আর এই সন্দেহ দংশয় মনে রেখে পেরেশান হয়ে পড়ে।

❖ আবার কখনও অন্যদের কাছে থেকে যাচাই করে নিতে চায় কিন্তু যেহেতু এতে দুর্বোধ্য বিষয় থাকে যা বোধগম্য করার জন্য তার জ্ঞান ও মেধা যথেষ্ট নয় তাই বুঝে আসে না এবং অর্থহীন প্রশ্ন করে অন্যদের সংকোচিত করে রেখে আর উত্তর দাতাদের কে অক্ষম ভাবে তাদের প্রতি কু-ধারণা পোষণ করে। এ কারণেই রাসূল সা. হযরত উমর রা. এর মত গভীর জ্ঞান ও আমল সম্পন্ন ব্যক্তিকে তাওরাতের অধ্যয়ন নিষেধ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এটা আসমানী কিতাব হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু এতে কিছুটা বিকৃতিও ঘটে গিয়েছিল। অধ্যয়ন ও আবার একাকী নয় বরং নিজে হুজুর কে শুনাচ্ছিলেন যে কারণ এতে বিকৃত অংশ দাগ ছিল স্পষ্ট। তদুপরি কোনো ফাসাদ হওয়ার সম্ভাবনা ও ছিল না। এত সব সত্ত্বে ও এই

আশংকায় যে আগামীতে এই কাজে ফ্যাসাদের দরজা খুলে যাওয়ার কারণ বলে বিবেচিত হবে। কঠোর ভাবে নিষেধ করে দিলেন এবং অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করলেন এবং হুজুর সা-এর ও খুব অপছন্দ হলো। তাওরাত, যেটা আসমানী কিতাব ছিল কিন্তু বিকৃতির সংমিশ্রণ ছিল। যখন এটাকে নিষেধ করে দেয়া হলো। তখন যে সব কিতাব শুধু নাস্তিকতা আর কুফরীর হবে এগুলোর বিধান তো সুস্পষ্ট। আর যখন হযরত উমর রা. কে নিষেধ করা হলো সেখানে আমরা কোনো শিক্ষার্থী নিজের কিতাব গুলো দেখুন। এখানে তো এতো জ্ঞান ভান্ডার পড়ে আছে যে সারা জীবন ও দেখার সুযোগ হবে না।

শিক্ষার্থী নিজের সাথে সর্বদা যা রাখা উচিত

❖ কিছু কাগজ ❖ কলম বা পেন্সিল ❖ মিছওয়াক ❖ তাসবীহ ❖ টয়লেট পেপার ❖ প্রয়োজন মাফিক কিছু টাকা ❖ একটি ঘড়ি পকেটে রাখবে, হাতে নয়, কারণ শিক্ষকের সামনে হাতে ঘড়ি ব্যবহার করা বেয়াদবীর মধ্যে গণ্য হয়।

পড়া ভুলে যাওয়ার কারণ

শিক্ষার্থীকে এ বিষয়ে সচেতন থাকা একান্ত প্রয়োজন যে, সর্বাবস্থায় হারাম থেকে বেঁচে থাকব। তোমাদেরকে তোমাদের অভিভাবক বাড়ি থেকে বোর্ডিং ও আনুসাঙ্গিক খরচ বাবদ টাকা দেয়। আর প্রায় তোমরা মাদরাসায় এসে বিভিন্ন বাহানা দিয়ে মাদরাসার লিল্লাহ বোর্ডিং এর ছদক্বা যাকাতের টাকা খাওয়ার চেষ্টা করে। সকল শিক্ষার্থীর জন্য কি এ রকম খাওয়া হালাল না কি হারাম। যাদের সামর্থ্য আছে তারা লিল্লাহ বোর্ডিং-এ খাবে না। আল্লাহ বলেন–

يَاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَ اعْمَلُوْا صَالِحًا اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

অর্থাৎ হে রসূলগণ! পবিত্র বস্তু আহার করুন এবং সৎকাজ করুন। আপনারা যা করেন সে বিষয়ে আমি পরিজ্ঞাত।[১]

এই আয়াতের মধ্যে নেক আ'মলের পূর্বে হালাল খাদ্য ভক্ষণ করার জন্য কথা বলা হয়েছে।

এখান থেকে বুঝা যায় যে, আমরা দ্বীনি ইলম শিখতে মাদরাসায় এসে যদি, হালাল খাবার ভক্ষণ না করি, তবে তা আমাদের হালাল ইলম অর্জন হবে কি? আর আমাদের এই ইলম শিখে বা কি লাভ, যে ইলম আমাকে হারাম খাবার বা হারাম আয় করতে শিখায়।

❖ জেনে রাখা আবশ্যক- যেখানে আল্লাহ তা'য়ালা রাসূল সা. কে হালাল খাদ্য ভক্ষণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই আমাদের বিকল্প কোনো চিন্তা করার

---

[১] সূরা মু'মিনূনঃ আয়াতাংশ-৫১।

অবকাশ নেই। তাই সাবধান! ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্ব শর্ত হালাল খাবার। আল্লাহ আমাদেরকে হালাল উপার্জন করার সুযোগ দিন। আমীন!

দৈনিক পড়া-লেখা করার তালিকা

তারিখ-

সময়				পড়া হলো কতটুকু		মোট কত পৃষ্ঠা
হতে	পর্যন্ত	কাজের বর্ণনা	ব্যয়িত সময়	হতে	পর্যন্ত	
৪.২০	৫.১০	পবিত্রতা, নামায				
৫.১০	৫.৩০	ঈমানের দাওয়াত				
		গোসল করা				
		নাস্তা করা				
		কুরআন পড়া				
		বুখারী পড়া				
		মুসলিম পড়া				
		লেখা				
		মাদরাসা/স্কুল				
		আসরের নামায				
		সন্ধ্যার নাস্তা				
		আবার লেখা				
		ইংরেজী				
		আরবী				
		গণিত				
		এশা'র নামায				
		আদব				
		বিভিন্ন আমলের লাভ				
		বিজ্ঞান				
		রাতের খাবার				
		পবিত্রতা অর্জন				

		কুরআন পড়া				
১০.০০	৪.২০	সুন্নাতী ঘুমানো				

প্রতি সপ্তাহের পড়ার হিসাব

সাপ্তাহিক পাঠ পরিকল্পনা চার্ট এর নমুনা-

তাং...হতে	শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	জুমা'	মোট
তাং.. পর্যন্ত	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	
কিতাব								
ঈমানী কথা								
নামায								
কুরআন								
আলোচনা								
ঈমানী দাওয়াত								
ইলম শিক্ষা								
সদকা দেয়া								

পরীক্ষার পূর্বে লেখা-পড়া করার নিয়ম

যা করা উচিত	যা না করা উচিত
❖ সব বিষয়ে সমান গুরুত্ব দিয়ে পড়বে।	❖ কঠিন বলে কোনো বিষয় এড়িয়ে যাবে না
❖ পরীক্ষার বেশ কিছু পূর্বে পূর্ণ সিলেবাস শেষ করে রিভিশন দিবে।	❖ মনে থাকছে না ভেবে টেনশন করবে না। এ নিয়ে যত কম ভাববে তত মনে থাকবে বেশি।
❖ কোনো বিষয় শক্ত বলে এড়িয়ে না গিয়ে, গুরুত্ব দিয়ে পড়বে।	❖ একটানা না পড়ে মাঝে মধ্যে ঘুম একেবারে ছেড়ে দিবে না।
❖ শেষ দিকে বারবার রিডিং পড়বে একই বিষয়, অতিতাড়াতাড়ি।	❖ পরীক্ষাকে 'যুদ্ধ' ভেবে পড়া-লেখা করবে না।
❖ বিষয় ধরে ধরে এগোবে। ওই বিষয়ে সম্ভাব্য সব প্রশ্ন যতটা সম্ভব লিখে নেবে।	❖ অন্যের পড়ার সঙ্গে তোমার অবস্থানকে তুলনা করতে যাবে না।
❖ যেখানে ছবি আঁকতে হবে, উত্তর	❖ পরীক্ষার ঠিক আগে মনে আছে

দিতে অভ্যাস করে নাও তাড়াতাড়ি আঁকা	কি নেই তা যাচাই করবে না।

ছাত্রীদের প্রতিদিনের সময়সূচি

❖ ঘুম থেকে উঠে নফল নামায আদায় করে ফজরের নামাযের পূর্ব পর্যন্ত অধ্যয়ন করবে।

❖ সকাল সাতটা থেকে নয়টা পর্যন্ত বাংলা বিষয় তাকরার করবে।

❖ গোসলের ঘন্টার পাঁচ মিনিট পর খাবার ঘন্টা বাজবে অতপরঃ খাবার উঠাবে।

❖ খাবার ও ক্লাস শুরু হওয়ার মাঝেএক ঘন্টা ত্রিশ মিনিট সময় বাকি থাকে।

❖ যোহরের নামায আরম্ভ হতে ৫ম ঘন্টা আরম্ভের পনেরো মিনিট।

❖ আছর ও মাগরিবের নামাযের মাঝে প্রায় দেড় ঘন্টা।

❖ মাগরিব ও ইশারে নামাযের মাঝে দুই ঘন্টা ত্রিশ মিনিট।

❖ ইশারের নামাযের পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর ঘুমের ঘন্টা বাজবে।

স্মরণশক্তি বৃদ্ধির সহজ আ'মল

❖ চোখ ও অন্তরের হেফাজত করা। ❖ মেসওয়াক করা।

❖ اَلْعَلِيْمُ اَلْحَكِيْمُ এই গুণবাচক নাম দুইটি জপলে জ্ঞান ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায়।

❖ প্রত্যেক নামাজের পর رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا (রাব্বি জিদনী ইলমা) কয়েকবার জপলে স্মরণশক্তি ও ইলম বৃদ্ধিপায়।

❖ প্রতিদিন ফজরের নামাজের পর رَبِّ اشْرَحْلِيْ (রাব্বিশ রাহ্‌লী) শেষ পর্যন্ত ২১ বার পড়লে স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়।

পড়া মনে রাখার বৈজ্ঞানিক উপায়

❖ মনে রাখার বিষয়টি ঠিক মতো বুঝে নিন।

❖ মনে রাখার বিষয় বারবার পড়ুন, আবৃত্তি করি।

❖ পড়াটা স্থায়ীভাবে মনে গেঁথে রাখতে হবে এ উদ্দেশ্য নিয়ে পড়তে বসুন।

❖ পড়ার মাঝে মঝা বিরতি দিন। কী পড়েছেন তা মনে করি। পড়াটা আওড়ান।

❖ যা পড়েছেন তা আপনার মনে থাকেবে এ বিশ্বাস নিয়ে পড়তে থাকুন।

❖ সক্রিয়ভাবে মনো যোগ দিন। পড়ার বিষয়টি সম্বন্ধে চিন্তা করি। এ বিষয়ের উপর নোট সংগ্রহ করি, শিক্ষক বা সহপাঠীদের কাছ থেকে সাহায্য নিন। শুধু মন্ত্রের মতো শব্দের পুনরাবৃত্তি করলে মনে রাখা সম্ভব নয়।

❖ পড়াটা নতুন করে ঢেলে সাজাই।

মুফতী ফয়েজুল্লাহ্ রহ.-এর নারীর জন্য কিছু উপদেশ

❖ প্রতিবেশি কোনো খারাপ প্রভাব যেন তোমাদের মাঝে না আসে।

❖ খারাপ অভ্যাস ও বেহুদা কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা।

❖ আদব ও শিষ্টাচার রজায় রাখা। ❖ প্রতিটি কাজ সুন্নাত অনুযায়ী করা।

❖ আযান শুনামাত্র নামায আদায়ের প্রস্তুতি নেয়া।

❖ বদ মেজাজ ও ইচ্ছাধীন মনোভাব পরিহার করা।

❖ আচার-ব্যবহার ও পোষাক নেককার ব্যক্তিদের মতো হওয়া।

❖ প্রয়োজন ব্যতিত বাজারে যাবে না।

❖ একে অপরের সাথে ঝগড়া করবে না।

❖ একে অপরের সাথে শত্রুতা করবে না।

❖ বড়দের শ্রদ্ধা আর ছোটদের স্নেহ করবে।

❖ শোকরকারী ও ধৈর্যশীল থাকবে।

❖ দুনিয়াবী বিষয়ে তোমার চেয়ে অভাবীদের সাথে তুলনা করবে আর পরকালের বিষয়ে তোমার চেয়ে অগ্রগামীদের সাথে তুলনা করবে।

❖ শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান বজায় রাখবে।

আল্লামা আলী আহমদ বোয়ালভী রহ. এর অমূল্য নসিহত[১]

❖ আল্লাহর ডরে ডরো, আল্লাহর আশা গরো, আল্লাহর কথা ধরো, এ তিন কথা লয় মরো। (অর্থাৎ- আল্লাহর ভয়ে ভয় করো, আল্লাহর আশা করো, আল্লাহর আদেশ পালন করো, এ তিন কথা নিয়ে মরো।)

❖ আফসোস করে মরো, মরার পর আফসোস করলে কোনো লাভ হবে না।

❖ যে ন বুঝে মনে মনে তারে বুঝাইত পারে খনে। (যে মনে মনে বুঝে না তাকে কে বোঝাবে?)

❖ যারে বুঝে ছুঁইয়ে, তারে কালে ছুঁইয়ে। ❖ ঈমান অমূল্য ধন, করিও যতন।

❖ আল্লাহর দিয়া অফুরানি, বন্দার দিয়া খোয়ার (অল্প) পানি।

❖ পোয়া বুড়া যওয়ান, মওতল্লায় ওয়ান। (বাচ্চা, বৃদ্ধ, যুবক, মৃত্যুর জন্য সমান)

❖ পোয়াকালে ন বুঝিলাম, যওয়ানকালে ন গরিলাম, বুড়া কালে ন পারিলাম।

❖ সব জিনিষ জিনিষ, আল্লাহ একজন গিরিছ।

❖ দুনিয়ার মানুষ বেক্কুন (সবাই) পুলিশ অইলে (হলে), একজন চোর অইলে, তার ভিতরে আল্লাহর ডর (ভয়) ন থাকিলে, চুরিত্তুন তারে ফিরাইত ন পারিবো।

---

[১] চট্টগ্রামের ভাষা।

আর দুনিয়ার মানুষ বেক্কুনর ভিতরে আল্লাহর ডর থাকিলে পুলিশ ন লাইবো (লাগবে না), চুরিও ন অইবো।

❖ যত কম তত গম, যত বেশ তত শেষ, যত পাশ ততো নাশ।

❖ চাইর কিছিমর মাইয়া পোয়া বিয়া ন গরিছ। ১. শিক্ষিতর জাত। ২. ফকিরের জাত। ৩. বেদাতীর জাত। ৪. উঁর মাইনষর (বড় মানুষের) জাত।

❖ উঁর মাইনষর মাইয়া গরিবে বিয়া গরন পিঁয়ারার গলাত হাঁতি বাঁধি দন।

❖ আগে অজু, মাঝে আযান, পরে নামায।

❖ হাতে পায়ে গরো কাম, দিলে মুখে আল্লাহর নাম।

❖ আল্লাহ বাদে গতি নাই, বন্দার কাছে কিছুই নাই, আল্লাহ আল্লাহ, বান্দা বান্দা।

❖ ঈমান অমূল্য ধন, করো যত্তন।

❖ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গরো, যদি ধরো আল্লাহরে বান্দা ধরিব তোরে, যদি ছাড়ো আল্লাহরে বন্দা ছাড়বে তোরে।

❖ আক্কলের মাথায় মার লাথি, আল্লাহর হুকুম গর জারী, শয়তান নাশ অইয়্যে, আদম পাশ অইয়্যে, মাশুকর সামনে আক্কল নচালাইয়্যো।

❖ আল্লাহর হুকুম ভেঙ্গে, নবীর তরীকা ছেড়ে, মনমতে চলে আখেরাত গেলাম ভুলে।

❖ ভয় আর আশা, এই দুইয়র মাঝে ঈমানর বাসা।

❖ আল্লাহর কুদরত ঝলক মারের, আল্লাহর কুদরত ঝলক মারের।

❖ জিনিষে বেহেশতত নিত ন পারে, একমাত্র গিরিছেই নিত পারেদে।

❖ যে যারে চায় তারে পায়, খোদা হদ্দে (বলে) মোর কি যায়।

❖ কিবির (গর্ব) ছাড়, জিকির ধর।

❖ দুনিয়ার মানুষ বেগ্‌গুন তোর তারিফ গরি তোরে বেহেশতে নিত ন পারিবো! আল্লাহ যদি বেহেশত ন দেয়। আর দুনিয়ার মানুষ বেগ্‌গুন তোরে খারাপ খইয়েরে দোযখত দিত ন পারিবো! আল্লাহ যদি দোযখত ন দেয়।

❖ একবার একছাত্র কে "ইনকিলাব" পত্রিকা পড়তে দেখে তার পাশ দিয়ে আস্তে করে এই কথা বলে চলে গেলেন "ইন-- কি- লাভ।"

❖ এক ব্যাক্তি এসে বল্লেন, হুজুর দোয়া গইজ্জন, পোয়া উগ্‌গা (ছেলে একটা) আল্লাহ দিলে ডাক্তর, উগ্‌গা মাষ্টর, উগ্‌গা বারিষ্টর। তখন হুজুর বল্লেন, "বর ডর, বর ডর, বর ডর (অনেক বড়)।"

❖ জীবনর শেষ শবে কদর, শেষ নসিহত বলি বুঝো, নফস খুব চায়, গোশত রুটি বেশি খায়! কিন্তু খাইলাম-দাইলাম ভরাইলাম পেট। নফস হদ্দে (বলে) এবার লেট (ঘুমাও)। যত উম (আরাম) তত ঘুম এবাদতত্তুন মাহরুম।

আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে হুজুরের এই অমূল্য বাণীসমূহের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমিন!

শীর্ষ কয়েকটি কওমী মহিলা মাদরাসার নাম

❖ জাতীয় মহিলা মাদরাসা, পশ্চিম রামপুরা, ঢাকা।
❖ উম্মাহাতুল মুমেনিন মহিলা মাদরাসা, ভাটারা মোড়, গুলশান, ঢাকা
❖ ইবরাহিমিয়া মহিলা মাদরাসা, কাজলারপাড়, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা
❖ জামিয়া সিদ্দিকিয়া নুরানি মহিলা মাদরাসা, মিরপুর-২, ঢাকা
❖ মদিনাতুল উলুম মহিলা মাদরাসা, তুরাগ, ঢাকা
❖ উম্মাহাতুল মুমেনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা মাদরাসা, দারুস সালাম, ঢাকা
❖ আল মাদরাসা আল মাদানিয়া আল আরবিয়া, পল্লবী, ঢাকা
❖ হালিমা সাদিয়া মহিলা মাদরাসা, লালবাগ, ঢাকা
❖ জামিয়া ইসলামিয়া আশরাফুল উলুম মাদরাসা, ছনটেক, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
❖ আনোয়ারুল উলুম মহিলা মাদরাসা, আশরাফাবাদ, কামরাঙীচর, ঢাকা
❖ দারুল উলুম মহিলা মাদরাসা, উত্তর গোলাপবাগ, ঢাকা
❖ আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া রানাভোলা, উত্তরা-১০, ঢাকা
❖ মাদরাসা ফাতেমাতুজজোহরা, মুহাম্মাদিয়া হাউজিং লিমিটেড, ঢাকা
❖ মাহাদু তালিমিল বানাত, আল-হেরা টাওয়ার, খিলখেত, ঢাকা
❖ আয়েশা সিদ্দিকা দারুল উলুম মাদরাসা, কদমতলী, ঢাকা
❖ নুরে হেরা মহিলা মাদরাসা, কোম্পানিগঞ্জ, হাজারিবাগ, ঢাকা
❖ মাদরাসাতুল কিতাব ওয়াসসুন্নাহ, শেরশাহসুরী রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা
❖ মাদরাসা আয়েশা সিদ্দিকা, ঢালকানগর, সুত্রাপুর, ঢাকা
❖ ইকরা দারুল কারিম মহিলা মাদরাসা, দখিন কেরানিগঞ্জ, ঢাকা
❖ জামেয়া ইসলামিয়া মহিলা মাদরাসা, মুমসিহাটি, কামরাঙিচর, ঢাকা
❖ হাজী আব্দুর রশিদ দারুল উলুম মহিলা মাদরাসা, শিবপুর, সাভার, ঢাকা
❖ আয়েশা সিদ্দিকা মহিলা মাদরাসা, দেবিনগর মাঝিরচর বাজার, দোহার, ঢাকা
❖ খাদিজাতুল কুবরা মহিলা মাদরাসা, নবোদয় হাউজিং, মুহাম্মদপুর, ঢাকা
❖ হযরত ফাতিমা তালিমুদ্দিন মহিলা মাদরাসা, মেরাজনগর, কদমতলি, ঢাকা
❖ আল্লাহর দান বালিকা মাদরাসা, পুর্ব নয়াপাড়া গাজিপুর সদর, ঢাকা
❖ নুসাইবা বালিকা মাদরাসা (দখিন বারিধারা), মেরুল বাড্ডা, ঢাকা
❖ জামিয়া ইসলামিয়া মহিলা মাদরাসা, মজিপুর, সাভার, ঢাকা
❖ তাহিরাতুন নিসা মহিলা মাদরাসা, ভাটারা বাড্ডা, ঢাকা
❖ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা আন্না বিবি মহিলা মাদরাসা, উত্তর কাফরুল, ঢাকা
❖ রশিদিয়া ইবরাহিমিয়া মহিলা মাদরাসা, পলাশপুর, ডেমরা, ঢাকা

❖ ফাইজুল উলুম ইসলামিয়া হাফিজিয়া মাদরাসা, বছিলা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা

ঢাকার বাইরের কয়েকটি শীর্ষ কওমী মহিলা মাদরাসার নাম

❖ খাদিজাতুল কুবরা মহিলা মাদরাসা, নন্দিনা পশ্চিম বাজার, জামালপুর সদর

❖ খাতুনে জান্নাত কামরুন্নেছা মহিলা মাদরাসা, জালেশ্বরীতলা, ঠাকুরগাও সদর

❖ সিদ্দিকিয়া বালিকা শিশু সদন ও মহিলা মাদরাসা, ঝিনাইগাতি ব্রিজপাড়, শেরপুর

❖ ফাতেমাতুজ যাহরা বালিকা মাদরাসা, হাজি খলিলুর রহমান রোড, ভোলা সদর

❖ আয়েশা রা. মহিলা মাদরাসা, লালখান বাজার, খুলশি, চট্টগ্রাম

❖ আল-হুদা মহিলা মাদরাসা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

❖ আলমতাজ মহিলা মাদরাসা, শাহেদনগর, সিরাজগঞ্জ সদর

❖ আয়েশা সিদ্দিকা মহিলা মাদরাসা, মনোহর বাজার রোড, পালং, শরিয়তপুর

❖ আয়েশা সিদ্দিকা মহিলা মাদরাসা কমপ্লেক্স, ইপিজেড রোড, কুমিল্লা সদর

❖ মারকাযুস সুন্নাহ আল ইবরাহিমি মহিলা মাদরাসা, আগুাউড়া, দাউদকান্দি, কুমিল্লা

❖ তালিমুল কুরআন মহিলা মাদরাসা, জয়দেবপুর, পুর্ববরুদা, গাজিপুর সদর

❖ আল্লাহর দান বালিকা মাদরাসা, পুর্ব নয়াপাড়া, গাজিপুর সদর

❖ জামিয়া উসমানিয়া দারুল উলুম মহিলা মাদরাসা, সাতাইশ, টঙ্গি, গাজিপুর

❖ হযরত হাফসা মহিলা মাদরাসা, বানিদাপাড়া (মিলসগেট), কালিগঞ্জ, ঝিনাইদহ

❖ সুফফাহ মহিলা মাদরাসা, জলিলপুর, মহেশপুর, ঝিনাইদহ

❖ মাদরাসা আয়েশা সিদ্দিকা, পশ্চিম দাশড়া, মানিকগঞ্জ সদর

❖ খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ মহিলা মাদরাসা, আওরাঙ্গা বাজার, মানিকগঞ্জ, সদর

❖ আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া, খালপাড়া, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ

❖ জামেয়া ইসলামিয়া জাহারুননেছা, ডেকরপাড়া, মুন্সিগঞ্জ সদর

❖ জামিয়া আরবিয়া লিল বানাত, সোনারং, টঙ্গিবাড়ি, মুন্সিগঞ্জ

❖ জামিয়া রশিদিয়া আহসানাবাদ মহিলা মাদরাসা, চরমোনাই, বরিশাল সদর

❖ জামেয়া ইসলামিয়া ফজিলাতুননেছা লিল বানাত, শাহ পরান সড়ক, ২নং ওয়ার্ড, বরিশাল

❖ জামিয়া ইসলামিয়া ফাতেমাতুজ যাহরা, সেকশন রোড, ভাটিখানা, বরিশাল সদর

❖ রিয়াজুল জান্নাহ মহিলা মাদরাসা, নিশিন্দারা কারবালা, বগুড়া সদর

❖ তাহযীবুল বানাত মহিলা মাদরাসা, স্টাফ কোয়ার্টার রোড, বগুড়া সদর

❖ রাবেয়া বসরি মহিলা মাদরাসা, শিকারপুর পুর্বপাড়া, বগুরা সদর

❖ জামিয়া ফাতেমাতুজ যাহরা মহিলা মাদরাসা, দয়ামীর, উসমানি নগর, সিলেট

❖ আল জামিয়াতু ত্বয়িবাহ মহিলা মাদরাসা, সুলতানপুর, বালাগঞ্জ, সিলেট

❖ মাসরাসাতুল বানাত দারুল হাদীস, বারুতখানা, সিলেট সদর

❖ মিফতাহুল জান্নাহ মহিলা মাদরাসা, গলগন্ডা, মোমেনশাহি সদর
❖ রাহাতুল জান্নাহ মহিলা মাদরাসা, বাগডহর, কোতয়ালি, মোমেনশাহি
❖ জামিয়া খাদিজাতুল কুবরা মহিলা মাদরাসা, বাওলা, ফুলপুর, মোমেনশাহি
❖ জামিয়াতুজ জাহরা মহিলা মাদরাসা, বালিয়া, ফুলপুর, মোমেনশাহি
❖ নাসিরাবাদ তোহফাতুল জান্নাত মহিলা মাদরাসা, ১৮ নং বগাবাড়ি, মোমেনশাহি সদর
❖ আল হেরা মহিলা মাদরাসা, গাবতলি, চাড়িপাড়া, মুক্তাগাছা, মোমেনশাহি
❖ মাফাকিরুল আরিফ মহিলা মাদরাসা, মাইজবাড়ি, মোমেনশাহি সদর
❖ ছাওতুল হেরা মহিলা মাদরাসা, রায়বাজার, ইশ্বরগঞ্জ, মোমেনশাহি
❖ জামিয়া আশরাফিয়া মহিলা মাদরাসা, সি-১৬, সেক্টর-৭, যশোর সদর
❖ আমেনা মহিলা মাদরাসা, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যশোর
❖ জামিয়া ইমদাদিয়া মাদানিনগর, মনিরামপুর, যশোর
❖ আয়েশা সিদ্দিকা মহিলা মাদরাসা, সল্প মারিয়া, কিশোরগঞ্জ সদর
❖ হালিমা সাদিয়া মহিলা মাদরাসা, ভৈরবপুর, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ
❖ খাদিজাতুল কুবরা মহিলা মাদরাসা, শুম্ভপুর, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ
❖ জামিয়া রাহেলা পারভিন তাহযীবুল বানাত, পুর্ব চকপাড়া, নেত্রকোনা সদর
❖ ফাতিমাতুজ যাহরা মহিলা মাদরাসা, নিশ্চিন্তপুর, নেত্রকোনা সদর
❖ বাগে জান্নাত মহিলা মাদরাসা, ব্রাম্মনজাত, কেন্দুয়া, নেত্রকোনা
❖ জামিয়াতুল আরবিয়া খাদিজাতুল আরবিয়া, শেখপাড়া, সানাডাঙা, খুলনা
❖ আয়েশা সিদ্দিকা মহিলা মাদরাসা, আরজী, ডুমুরিয়া, খুলনা
❖ আশরাফুল উলুম উম্মে হাবিবা মহিলা মাদরাসা, নিরালা, প্রান্তিকা, খুলনা সদর
❖ ইবরাহিমিয়া আমিনিয়া মাদরাসা,আটি ওয়াপদা কলোনি রোড, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ
❖ দারুল হুদা মহিলা মাদরাসা, ভুইগড়, ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ
❖ আশরাফিয়া মহিলা মাদরাসা, নয়াআটি, চিটাগাং রোড, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ন গঞ্জ
❖ দারুস সুন্নাহ মহিলা মাদরাসা, রাজঘর খালিয়ারা, বি-বাড়িয়া সদর
❖ খাতুনে জান্নাহ মহিলা মাদরাসা, মুনাসেফপাড়া, বি-বাড়িয়া সদর
❖ জামেয়া ইসলামিয়া ইবরাহিমিয়া মহিলা মাদরাসা, কাউতলি, বি-বাড়িয়া সদর
❖ হযরত ফাতেমা মহিলা মাদরাসা, হরিপুর, কালিহাতি, টাঙাঈল
❖ রাবেয়া বসরি মহিলা মাদরাসা, জেলা সদর, টাঙাঈল
❖ জামিয়া আয়েশা সিদ্দিকা লিল বানাত, গোড়াকি (কাজিনগর), মির্জাপুর, টাঙাঈল
❖ রিয়াজুল জান্নাহ মহিলা মাদরাসা, জেলখানার মোড়, তরোয়া, নরসিংদি সদর
❖ সিরাজুল উলুম মহিলা মাদরাসা, উত্তর সাটিরপাড়া, নরসিংদি সদর

❖ আল মাহমুদিয়া মহিলা মাদরাসা, বিরামপুর, নরসিংদি সদ

যোগ্য নারী হওয়ার সহজ উপায়

কুরআন ও হাদীসের আলোকে যোগ্য নারী

কুরআনুল কারিমের অনেক আয়াতে আল্লাহ তাআলা যোগ্য নারীর অনেক গুণ তুলে ধরেছেন। নিজেদের জীবনে এগুণগুলোর বাস্তবায়ন ঘটালে সে নারী হয়ে ওঠে নেককার। যা তাকে দুনিয়া ও পরকালে সম্মানের আসনে আসীন করেন। কুরআনে ঘোষিত যোগ্য নারী গুণগুলো হলো-

দ্বীনদারী ও সতী-সাধ্বী- যোগ্য নারীর প্রথম গুণ হলো- দ্বীনদার ও সতী-সাধ্বী হওয়া। কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা দ্বীনদার সতী-সাধ্বী গুণের অধিকারী হিসেবে নারীকে উল্লেখ করেন। আয়াতে 'ছলেহাত' শব্দের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে জারীর রহ. বলেন, 'দ্বীনের সঠিক অনুসারণকারীণী ও সৎকর্মশীলা নারীগণ।'

যোগ্য নারী সম্পর্কে হাদীসে আছে- হযরত সাওবান রা. বর্ণনা করেন, 'সোনা-রূপা সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহর রাসুল! আমরা কোন্ ধরনের মাল সঞ্চয় করব? তিনি বললেন, তোমাদের প্রত্যেকেই যেন সঞ্চয় করে- কৃতজ্ঞ অন্তর, যিকিরকারী মুখ এবং পরকালীন কর্মকাণ্ডে সহায়তাকারিনী মুমিনা নারী।'[১]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'দুনিয়া হলো ক্ষণিক উপভোগের বস্তু। আর দুনিয়ার সর্বোত্তম সম্পদ (উপভোগের বস্তু) সাধ্বী নারী।'[২]

হযরত আবু উমামা রা. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'কোনো মুমিনের জন্য আল্লাহর ভয় অর্জনের পর নেককার স্ত্রীর চেয়ে কল্যাণকর কিছু নেই। কারণ স্বামী তাকে আদেশ করলে সে আনুগত্য করে, তার দিকে দৃষ্টিপাত করলে সে (স্বামী) মুগ্ধ হয়। তাকে নিয়ে শপথ করলে সে তা (শপথকৃত কর্ম) পূরণ করে। স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজেকে (অন্যায়-অপকর্ম থেকে) এবং স্বামীর সম্পদ সংরক্ষণ করে।'[৩]

বিশ্বস্ত ও অনুগত হওয়া : নারীর দ্বিতীয় গুণ হলো- স্বামীর অনুগত ও বিশ্বস্ত হওয়া। কুরআনুল কারিমে 'কানিতাত' শব্দ দিয়ে তা বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ও স্বামীর অনুগত নারীদের 'কানিতাত' বলা হয়। হাদীসে এসেছে-হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নারী যখন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবে, রমজান মাসের

---

[১] মুসনাদে আহমাদ, তিরমিজি, ইবনে মাজাহ।

[২] মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ।

[৩] ইবনে মাজাহ।

রোযা রাখবে, নিজ লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে এবং স্বামীর আনুগত্য করবে তখন তাকে বলা হবে, যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ কর।'[১]

হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল, নারীদের মধ্যে কোন নারী উত্তম। তিনি বললেন, স্বামী যাকে দেখলে আনন্দবোধ করে, যাকে আদেশ করলে আনুগত্য করে, স্ত্রীর বিষয়ে এবং সম্পদের ব্যাপারে স্বামী যা অপছন্দ করে তা থেকে বিরত থাকে।'[২]

সতীত্ব ও সম্পদের হেফাজত করা- নারীর তৃতীয় গুণ হলো- সতীত্ব ও সম্পদের হেফাজত করা। কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা যেভাবে বলেছেন- حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ "নিজের সতীত্বের হেফাজত করা এবং স্বামীর (অনুপস্থিতিতে তার) ধন-সম্পদ হেফাজত করা।"[৩]

আয়াতের এই বাক্যের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে জারীর তবারী রহ. বলেন, 'নারীগণ তাদের স্বামীর অবর্তমানে নিজেদের লজ্জাস্থান হেফাজত করবে এবং এক্ষেত্রে কোনো ধরনের খেয়ানত করবে না। আর স্বামীর ধন-সম্পদ সংরক্ষণ করবে। তাদের উপর এ দায়িত্ব আল্লাহর পক্ষ থেকেই আরোপিত।'

হাদীসের এসেছে- হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'উত্তম স্ত্রী সে, যার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে তোমাকে আনন্দিত করে, আদেশ করলে আনুগত্য করে, তুমি দূরে থাকলে তার নিজের ব্যাপারে এবং তোমার সম্পদের ব্যাপারে তোমার অধিকার রক্ষা করে। তারপর তিনি কুরআনের উক্ত আয়াত (পুরুষ নারীদের অভিভাবক) তেলাওয়াত করেন।'[৪]

পবিত্র ও চরিত্রবান হওয়া- নারীর চতুর্থ গুণ হলো- নিজে পবিত্র তাকা এবং সৎচরিত্রবান হওয়া। কুরআনুল কারিমের অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন- وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ "পবিত্র নারীরা পবিত্র পুরুষদের উপযুক্ত আর পবিত্র পুরুষরা পবিত্র নারীদের উপযুক্ত।"[৫]

এ আয়াতে মুমিন নর-নারীর জন্য মূলনীতি বলে দেয়া হয়েছে যে- আল্লাহ তাআলা মানবচরিত্রে স্বাভাবিকভাবে পরস্পরের মাঝে যোগসূত্র রেখেছেন। পবিত্র ও চরিত্রবান নারীদের আগ্রহ পবিত্র ও চরিত্রবান পুরুষদের প্রতি হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে পবিত্র ও চরিত্রবান পুরুষদের আগ্রহ পবিত্র ও চরিত্রবান নারীদের প্রতি হয়ে থাকে। স্বাভাবিকভাবে প্রত্যেক চরিত্রবান নারী-পুরুষ নিজ

---

[১] মুসনাদে আহমাদ।

[২] মুসনাদে আহমাদ, নাসাঈ।

[৩] সূরা নিসা : আয়াত ৩৪।

[৪] তাফরিরে তবারি।

[৫] সূরা নুর : আয়াত ২৬ ।

নিজ আগ্রহ অনুযায়ী জীবনসঙ্গী খোঁজ করে নেয় এবং প্রাকৃতিক বিধান অনুযায়ী সেটাই বাস্তবরূপ লাভ করে। এ জন্য জীবনসঙ্গী ও সঙ্গিনী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইসলাম পবিত্র ও সৎচরিত্রকে প্রাধান্য দিতে গুরুত্ব দিয়েছে। হাদীসে এসেছে- হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তিন গুণের যে কোনো একটি গুণের কারণে নারীকে বিয়ে করা যায়। যথা- ধন-সম্পদের কারণে, রূপ-সৌন্দর্যের কারণে ও দ্বীনদারীর কারণে। তুমি দ্বীনদার ও চরিত্রবানকেই গ্রহণ কর।'[১]

নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী হওয়া- বিয়ের মাধ্যমে চারিত্রিক পবিত্রতা সম্পন্ন হওয়া নারীর অন্যতম গুণ। গোপনে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনে লিপ্ত না হয়ে নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী হওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেছেন- 'তারা বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে চারিত্রিক পবিত্রতাসম্পন্ন হবে, ব্যভিচারিনী হবে না এবং গোপনে কোনো অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনকারিনী হবে না।'[২]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আববাস রা. বলেন, চারিত্রিক নিষ্কলুষতার অধিকারিনী নারীগণ, যারা প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে ব্যভিচারিনী হবে না এবং সঙ্গোপনে অবৈধ বন্ধু গ্রহণকারিনী হবে না। তিনি বলেন, জাহেলি যুগের লোকেরা প্রকাশ্যে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়াকে হারাম মনে করত, কিন্তু গোপনে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়াকে হালাল মনে করত। এই প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তাআলা কুরআনের আয়াত নাজিল করলেন- তোমরা প্রকাশ্যে হোক, অপ্রকাশ্যে হোক কোনো রকম অশ্লীল কাজের কাছেও যেও না।[৩]

বর্তমান সমাজে অবৈধ সম্পর্কের ব্যাধি মহামারিতে পরিণত হয়েছে। পর্দাহীনতা, সহশিক্ষা এবং অশ্লীল ফিল্ম ও ছবির বদৌলতে একদিকে অবিবাহিত উঠতি নর-নারী তথাকথিত প্রেমের নামে ভয়ঙ্কররূপে প্রকাশ্য অশ্লীলতায় মেতে উঠছে, অন্যদিকে পরকীয়া প্রেমের কারণে ঘর ভাঙছে অসংখ্য নারীর। তাই মুসলমান নর-নারীরা যতক্ষণ আল্লাহর হুকুম ও ধর্মীয় অনুশাসন মেনে না চলবে, ততক্ষণ পারিবারিক শান্তি ও দাম্পত্য জীবনের সুখ খুঁজে পাবে না।

সরলমনা হওয়া- দ্বীনদার ও চরিত্রবান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরল মনের অধিকারিণী হওয়া। আল্লাহ বলেন- 'চরিত্রবান, সরলমতী ঈমানদার নারীরা।'[৪]

এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আল্লামা আলুসি রহ. বলেন, পবিত্রতার সার্বিক উপাদান নিয়ে বেড়ে উঠা এবং উত্তম চরিত্রের উপর লালিত-পালিত হওয়ার কারণে অন্য কোনো চিন্তা ও মানসিকতা যাদের কল্পনায়ও আসে না। এই গুণ

---

[১] ইবনে আবি শায়বা, মুসনাদে আহমাদ।

[২] সূরা নিসা : আয়াত ২৫।

[৩] সূরা আনআম : আয়াত ১৫১ ও তাফসিরে তবারি।

[৪] সূরা নুর : আয়াত ২৩।

পূর্ণ নিষ্কলুষতা ও চারিত্রিক পবিত্রতার প্রমাণ বহন করে, যা শুধু সতী নারী শব্দের মধ্যে পাওয়া যায় না।'[১]

তাছাড়া আত্মার ব্যাধিমুক্ত, স্বচ্ছ অন্তরের নারীরা, যাদের মধ্যে প্রবঞ্চনামূলক চাতুর্য নেই। যাদের স্বভাব-প্রকৃতিতে অসৎ কোনো মনোবাসনা নেই। শৈশবকাল থেকেই এই স্বভাব-সুচরিত্র গড়ে উঠতে সহায়ক হয়। সরলমনা বৈশিষ্ট্যের নারীদের বাইরের জগত সম্পর্কে ধারণা থাকে না, অবৈধ সম্পর্কের কল্পনাও তাদের অন্তরে থাকে না। তারা প্রবঞ্চনা কি জিনিস তা বুঝে না। ছল-ছাতুরিও জানে না। প্রতারণা ও মিথ্যা বলে না। পর্দাহীনতা ও ফ্যাশন সম্পর্কে চিন্তাও করে না। ফলে তাদের চরিত্র কলুষিত হওয়া ও দ্বীনদারী বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কাও থাকে না।

ঘরে অবস্থানকারী নারী- নারীর সপ্তম গুণ হলো- ঘরে অবস্থান করা। বিনা প্রয়োজনে বাইরে না যাওয়া। যা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 'তোমরা নিজ নিজ ঘরে অবস্থান কর। (পর পুরুষকে) সাজসজ্জা প্রদর্শন করে বেড়িও না। যেমন প্রাচীন জাহেলি যুগে প্রদর্শন করা হত।'[২]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসিরে ইবনে কাসিরে এসেছে- তোমরা নিজেদের ঘরে অবস্থানকে অবধারিত করে নাও। প্রয়োজন ব্যতিত ঘর থেকে বের হবে না।'

আয়াতের নীতিমালা হচ্ছে, নারীর আসল কাজ তার ঘরে অবস্থান করা। ঘরোয়া কর্তব্য পালন করা এবং সন্তান-সন্ততিকে গড়ে তোলাই তার মূল দায়িত্ব। তবে এর অর্থ এমন নয় যে- নারীর জন্য ঘর থেকে বের হওয়া একেবারেই নাজায়েয। বরং প্রয়োজনে সে পর্দার সঙ্গে বাইরে যেতে পারবে। বাইরে যাওয়া এবং অবস্থান করাও হবে প্রয়োজন অনুসারে। হাদীসে এসেছে- হযরত আনাস রা. বর্ণনা করেন, নারীরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আগমন করে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! পুরুষেরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ও অন্যান্য মর্যাদায় অগ্রগামী হয়েছেন। আমাদের জন্য কি এমন কোনো আমল রয়েছে যার মাধ্যমে মুজাহিদীনের সমপর্যায়ের মর্যাদা ও সওয়াবের অধিকারী হতে পারব? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের থেকে যারা নিজ ঘরে অবস্থান করবে সেটাই তাদেরকে মুজাহিদদের ফজিলত ও সাওয়াবে উপনীত করবে।'[৩]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নারী হল আবরণীয়। যখন সে বের হয় তখন

---

[১] রূহুল মাআনি।

[২] সূরা আহযাব : আয়াত ৩৩।

[৩] মুসনাদে বাজজার, তাফসিরে ইবনে কাসির।

শয়তান তার অনুসরণ করে। যখন সে ঘরে আবদ্ধ থাকে তখন আল্লাহর রহমত লাভের অতি কাছাকাছি থাকে।'[১]

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহর সব নারীকে কুরআনে উল্লেখিত গুণের অধিকারী হয়ে যোগ্য আলেমা হওয়অর তাওফিক দান করুন।

যোগ্য নারীর ভূষণ হলো আদব ও শিষ্টাচার

সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষ ধনী-গরীব, ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সকলের জন্যই ইসলাম এমন কিছু আদব উপহার দিয়েছে, যেগুলো দ্বারা একজন মুসলমান সুন্দর থেকে সুন্দরতর হয়, স্বচ্ছ হৃদয়ের অধিকারী হয়, মানুষের প্রিয়ভাজন হয়। একজন মুসলমান নারী হিসেবে আমিও চাই আমার ভিতর-বাহির সুন্দর হোক। সবার প্রিয়ভাজন হই। আমার রবের সন্তুষ্টি অর্জন করি। তাই আমাকেও পালন করতে হবে ইসলামের নির্দেশিত বিভিন্ন অবস্থা ও সময়ের উপযুক্ত আদব। তবেই আমি সুন্দর হবো, আমার জীবন সুন্দর হবে।

ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ আদব হলো সালাম দেয়া

পরিচিত-অপরিচিত, ছোট-বড় সবাইকে আমি সালাম দিব। কেউ হয়ত আমার ছোট, কিংবা আমার খাদেমা, কিংবা আমার অধীনে আছে, তাকেও সালাম দিব। এক্ষেত্রে নিজেকে সালাম পাওয়ার হকদার আর সালাম দেয়ার দায়িত্ব তাদের- এমন ভাবব না। কারণ নবীজী ধনী-গরীব, ছোট-বড়, পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে সালাম দিতেন। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় কিংবা প্রবেশ করার সময় দরজাটা আস্তে বন্ধ করা। জোরে আওয়াজ করে বন্ধ করবো না বা জোরে ধাক্কা দিয়ে ছেড়ে দিব না, যাতে বিকট শব্দ করে নিজে নিজে বন্ধ হয়ে যায়। কারণ তা ঘরের লোকদের, বিশেষ করে শিশু বা বৃদ্ধদের কষ্টের কারণ হবে। তাছাড়া এটা ইসলামী আদবের পরিপন্থী। সেই সাথে অন্যেরও বিরক্তির কারণ।

নারীর দ্বীনদারী হলো আত্মসচেতন হওয়া

আত্মসচেতন মুমিনের একটি গুণ। আত্মসচেতন না হলে প্রকৃত মুমিন হওয়া যায় না। কিছু নারীকে দেখা যায়, তারা আল্লাহর পথে চলতে আগ্রহী, দ্বীন মেনে চলতে চায়, মনটা আল্লাহর দিকে ধাবিত, কিন্তু শুধু অসচেতনতার কারণে অনেক ফরয তরক করছে কিংবা গুনাহে জড়িয়ে পড়ছে।

আমার এক বান্ধবী, যাকে আমি আমার বান্ধবীদের মধ্যে সবচেয়ে পরহেযগার মনে করি। প্রতিকূল পরিবেশেও গায়রে মাহরাম আত্মীয়ের সামনে বেপর্দা হয়

[১] মুসনাদে বাজজার।

না। কখনোই ইচ্ছা করে কোনো বেগানা পুরুষের দিকে তাকায় না। সাদাসিধে জীবন-যাপন করে। এক ওয়াক্ত নামাযও কাযা করে না।

ক'দিন আগে তার বিবাহ হলো। হায় আফসোস! বিবাহের সময় আমি তাকে নামায কাযা করতে দেখলাম। বড় কষ্ট পেলাম। যে নাকি এক ওয়াক্ত নামায কাযা করে না, বিবাহের অনুষ্ঠানের কারণে নামায কাযা করে দিল! অথচ একটু সচেতন হলেই নামায কাযা হওয়া থেকে বাঁচতে পারতো। তবে এক্ষেত্রে অভিভাবকদের সহায়তাও একটি বড় বিষয়। কখনো কখনো অন্যদের অসহায়তার কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এমন হয়ে যায়। কিন্তু আসল বিষয় হলো নিজের অদম্য আগ্রহ। আমি চাইলে যে কোনো প্রতিকূল পরিবেশকে অনুকূল করতে পারি। বিশেষ করে নামাযের মত গুরুত্বপূর্ণ ফরয আমলের জন্য তো আমাকে তা করতেই হবে। তেমনি আমরা কোনো কোনো নারীকে দেখি, তিনি পর্দা করেন। কিন্তু বিবাহের সময় পর্দার বিপরীত অনেক কিছুতে জড়িয়ে পড়েন। কনে সেজেগুজে বসে আছে, আর যেই আসছে মোবাইলে তার ছবি তুলে নিয়ে যাচ্ছে। যদিও ছবি তুলছে মহিলা, কিন্তু এ ছবি তো একটু পরেই কোনো পুরুষ দেখবে। ডিজিটাল ক্যামেরার ছবি জায়েয-নাজায়েয সে ভিন্ন কথা; ছবির ব্যাপারেই বা কেনো আমাদের এতো অবহেলা! পর্দানশীন নারীর জন্য এটা বড়ই ক্ষতির কারণ। এক্ষেত্রে আত্মসচেতনতার বিকল্প নেই।

আমার এক স্নেহভাজন ভাতিজি। মহিলা মাদরাসায় পড়ে। ছাত্রী অত্যন্ত ভালো। পরিবারে পূর্ণ পর্দা রক্ষা করা হয়। মেয়েটি একদিন আমাকে ফোনে বলল, আমরা অমুক সময় গ্রামের বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা করছি। আমি বললাম, রাস্তায় নামাযের কী হবে? সে বলল, নামায তো পড়া হবে না; বাড়িতে পৌঁছে ক্বাযা পড়তে হবে। বললাম, সেটা কেমন কথা! কোনো ভাবে ব্যবস্থা করতে হবে। তবুও কি নামায কাযা করার কোনো সুযোগ আছে?

এভাবে আমাদের কত নামায কাযা হয়ে যায়। প্রথমত এমন সময় সফর করা উচিত, যাতে নামায কাযা না হয়। একান্ত এমন সময় সফর হলে যথাসাধ্য চেষ্টা করা, নামায যেন কাযা না হয়। পথে নামায পড়া নারীদের জন্য অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে অভিভাবকের সহায়তা থাকলে বিষয়টি অনেক সহজ হয়ে যায়। দেখা যায় যাদের পিতা বা স্বামী নামাযের ব্যবস্থা করে দেন তারা সফরেও নামায আদায় করে। কিন্তু স্বামী বা পিতা যদি দায়িত্বশীল বা সচেতন না হন তাহলে নারীকে কি নিজে সচেতন হতে হবে না?

ঈমানের পরেই নামাযের স্থান, অথচ কারণে অকারণে আমরা এ বিষয়ে কত অবহেলা করছি! অন্যের কথা আর কী বলব! আমি নিজেই তো এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট অলস। উঠছি উঠছি করে ফজরে দেরি হয়ে যায়। কাজের কারণে যোহর পড়ছি

অনেক দেরি করে। আসরের নামায কখনো পড়ছি মাকরূহ ওয়াক্তে। আল্লাহ আমাকে নামাযে অলসতা থেকে রক্ষা করুন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ

"সুতরাং বড় দুঃখ আছে সেই নামাযীদের, যারা তাদের নামাযে গাফলতি করে।"[১]

আর দ্বীনদারীর ক্ষেত্রে নারীর আত্মসচেতনতার জন্য সবচেয়ে বড় সহায়ক হলো -দ্বীনী ইলম। নারী হোক পুরুষ হোক দ্বীনদারির উন্নতির জন্য দ্বীনী ইলমের কোনো বিকল্প নেই। এ জন্যই তো জ্ঞান অন্বেষণ করা ফরয। কিন্তু আফসোস! আমরা নারীরা এই ফরয জ্ঞান অন্বেষণের ক্ষেত্রে পিছে রয়েছি। এ বিষয়ে আমরা খুবই উদাসীন, খুবই গাফেল; সামান্য রিয়াযুস সালেহীন কিতাবটাও আমাদের অনেক নারীর পড়া নেই। নববী রা. এই কিতাবে মানুষের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত আয়াত-হাদীস সংকলন করেছেন। অন্তত এটা সকলেরই পড়া থাকা দরকার।

তবে দোষ শুধু নারীর নয়; পুরুষও এখানে সমানভাবে দায়ী। কারণ আল্লাহ তাআলা নারীকে পুরুষের অধীন করেছেন। নারীর সকল দায়িত্ব পুরুষের উপর ন্যস্ত করেছেন। তাই নারীকে প্রয়োজন পরিমাণ ইলম শেখানো পুরুষের দায়িত্ব। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا

হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর (জাহান্নামের) আগুন হতে।[২]

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

"জেনে রেখ, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। পুরুষ তার পরিবারবর্গের বিষয়ে দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। নারী তার পরিবার, সন্তান-সন্ততির বিষয়ে দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। জেনে রেখ, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।"[৩]

---

[১] সূরা মাউন: ৪, ৫

[২] সূরা তাহরীম : ৬

[৩] বুখারী শরীফ হাদীস ৭১৩৮।

কিন্তু পুরুষ যদি নারীকে যথাযথ শিক্ষা না দেয় কিংবা শিক্ষার ব্যবস্থা না করে, ত বে কি নারী দায়মুক্ত হয়ে যাবে? সে কি নিজে জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করবে না? হ্যাঁ, চেষ্টা আমাদেরকে করতেই হবে; কারণ অন্যের কথা বলে আমরা পার পাবো না। যার যার হিসাব নিজেকেই দিতে হবে। আমি সঠিত পন্থায় চেষ্টা করলে আল্লাহ পথ খুলে দিবেন। নবীজীর জামানায় নারীরা ইলম অর্জন করেছেন। এমন কি তাদের আগ্রহ দেখে নবীজী তাদের জন্য আলাদা একটি দিন ধার্য করেছিলেন; যেদিন নবীজী তাদেরকে সময় দিতেন।

সারকথা, দ্বীনী ইলম ছাড়া যেহেতু সচেতন দ্বীনদার হওয়া কঠিন, তাই দ্বীনী ইলম আমাদেরকে অর্জন করতেই হবে। এটি ফরয দায়িত্ব। একে এড়িয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই।

নেককার হওয়া স্ত্রী দ্বীনদারীর অর্ধেক নেয়ামত

মুমিনের জীবনে নেককার স্ত্রীর এতটাই গুরুত্ব যে, একে দ্বীনদারীর পথে অর্ধেক এগিয়ে যাওয়া ধরা হয়েছে।

হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- আল্লাহ তাআলা যাকে সৎ স্ত্রী দান করেছেন, তাকে তার দ্বীনের অর্ধাংশের ক্ষেত্রে সাহায্য করেছেন, (অর্ধাংশ সহজ করে দিয়েছেন।) সুতরাং সে যেন বাকি অর্ধাংশের ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করে।[১]

পৃথিবীতে মানুষ যত নেয়ামত লাভ করে, এর মধ্যে নেককার স্ত্রী অন্যতম প্রধান নেআমত। স্ত্রী নেককার ও আখলাকওয়ালা হলে পরিবারে জান্নাতী আবেশ বিরাজ করে। অন্যথায় শান্তির পরিবারই হয়ে যায় সাক্ষাৎ জাহান্নাম। তাই তো নেককার স্ত্রীকে হাদীস শরীফে মহা নেআমত ও সৌভাগ্যের বিষয় বলা হয়েছে। আর বদকার স্ত্রীকে দুর্ভাগ্যের বিষয় বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- আদম সন্তানের সৌভাগ্যের বিষয় তিনটি। তেমনি দুর্ভাগ্যের বিষয়ও তিনটি। প্রথম তিনটি হলো, দ্বীনদার-নেককার স্ত্রী, ভালো বাসস্থান, ভালো সওয়ারী। দ্বিতীয় তিনটি হলো, খারাপ স্ত্রী, খারাপ বাসস্থান ও খারাপ সওয়ারী।[২]

مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ

---

[১] মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ২৬৮১; বায়হাকী, হাদীস ৫১০১; তবারানী, হাদীস ৯৭২।

[২] মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৪৪।

আল্লাহর তাকওয়া অর্জনের পর একজন মুমিনের সবচেয়ে বড় অর্জন একজন দ্বীনদার-নেককার স্ত্রী; স্বামী কোনো আদেশ করলে তা মানে, তার দিকে তাকালে আনন্দ লাভ হয়, তার বিষয়ে স্বামী কোনো কসম করলে সে তাকে মুক্ত করে, স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজের বিষয়ে এবং স্বামীর সম্পদের বিষয়ে কল্যাণ কামনা করে।[১] হাদীসে এসেছে-

إِنَّمَا الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَلَيْسَ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنَ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ.

"দুনিয়া তো (ক্ষণস্থায়ী) প্রয়োজন পূরণের। আর মানুষ দুনিয়াতে যা কিছু দ্বারা কল্যাণ ও উপকার লাভ করে, তার মধ্যে দ্বীনদার-নেককার স্ত্রীর চেয়ে উত্তম আর কিছু নেই।"[২]

أَرْبَعٌ مَنْ أُعْطِيَهُنَّ أُعْطِيَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَ بَدَنًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا وَزَوْجَةً لَا تَبْغِيهِ خَوْنًا فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهِ.

"চারটি বস্তু যাকে দান করা হলো, তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কল্যাণ দান করা হলো। শোকরকারী অন্তর, যিকিরকারী জিহ্বা, বিপদে ধৈর্য-ধারণকারী শরীর এবং এমন স্ত্রী, যে নিজের ক্ষেত্রে এবং স্বামীর সম্পদের ক্ষেত্রে কোনো খেয়ানত করে না।"[৩]

দাম্পত্য জীবনে পরস্পরের কল্যাণ ভাবনা

বিবাহ কার্য সম্পাদন হয়ে গেল। অতপর স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে জাগতিক সকল ক্ষেত্রে একে অপরের সহযোগী ও শরীক হয়ে গেল, কিন্তু আখেরাতের ক্ষেত্রে তারা একে অপরের সহযোগী হলো কি? জাগতিক সকল ক্ষেত্রে পরস্পরের কল্যাণ তালাশ করে, কিন্তু আখেরাতের কল্যাণ তালাশ করে কি? এ বিষয়টি ভাবতে হবে প্রতিটি স্বামী-স্ত্রীর।

যে স্বামী স্ত্রীর আখেরাত নিয়ে ভাবে এবং যে স্ত্রী স্বামীর আখেরাত নিয়ে ভাবে, তাদের জন্য নবীজী রহমতের দুআ করেছেন।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ فَإِنْ أَبَتْ رَشَّ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ رَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى، فَإِنْ أَبَى رَشَّتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ

---

[১] সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৮৫৭।

[২] সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৮৫৫।

[৩] তবারানী, হাদীস ১১২৭৫; তবারানী, হাদীস ৭২১২ মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস ৭৪৩৭।

"আল্লাহ্ রহমত করুন ঐ স্বামীর প্রতি, যে রাতে জাগ্রত হয়ে নামায পড়ে এবং স্ত্রীকেও জাগ্রত করে; উঠতে না চাইলে চেহারায় পানি ছিটে হলেও ওঠানোর চেষ্টা করে। আল্লাহ্ রহমত করুন ঐ স্ত্রীর প্রতি, যে রাতে জাগ্রত হয়ে নামায পড়ে এবং স্বামীকে জাগিয়ে দেয়; সে উঠতে না চাইলে চেহারায় পানি ছিটে ওঠানোর চেষ্টা করে।"[১]

হ্যাঁ, এমনই হওয়া উচিত মুমিন দম্পতির আখেরাতের ক্ষেত্রে পরস্পরের কল্যাণকামনা ও সহযোগিতা।

একজন মুমিনের সবচে বড় সম্পদ তার ঈমান ও আকীদা। তাই সর্বাগ্রে স্বামীর উচিত স্ত্রীর ঈমানের খোঁজ-খবর নেয়া। সে ইসলামী আকীদাগুলো জানে কি না এবং নিঃসন্দেহে মানে কি না। তার মাঝে ঈমান-বিরোধী

কোনো চিন্তা-দর্শন বা কোনো আমল আছে কি না। শুদ্ধ আকীদা পোষণ করে থাকলে তা তার মধ্যে বদ্ধমূল হয়েছে কি না?

ঈমানের পর তার নামাযের খোঁজ নেয়া। গুরুত্বের সাথে ওয়াক্তমত নামায পড়ে কি না। পড়লে তা সঠিক নিয়মে হচ্ছে কি না। এটা তো বাস্তব যে, আমাদের সমাজে পুরুষরা নামায ইত্যাদি মকতবের উসতায বা ইমাম সাহেব থেকে শিখলেও নারীরা শেখে ঘরের অন্য নারী থেকে। ফলে অনেক সময় দেখা যায়, যে নারী থেকে শিখেছে তার শেখানোটা শুদ্ধ ছিল না। ফলে শেখাটা অসম্পূর্ণ বা অশুদ্ধ থেকে যায়।

নামাযের প্রাণ হলো কুরআন তেলাওয়াত। তাই দেখা দরকার, সে শুদ্ধভাবে তেলাওয়াত করতে পারে কি না। শুদ্ধ হলে প্রাত্যহিক নির্দিষ্ট পরিমাণ তেলাওয়াত করে কি না। তেমনিভাবে নামাযের দুআগুলো- সানা, তাসবীহ, আত্তাহিয়্যাতু, দরূদ, দুআ ইত্যাদি শুদ্ধভাবে পড়তে পারে কি না।

নামাযের দুআগুলো ছাড়াও দৈনন্দিন জীবনে আমলের অনেক দুআ আছে, যা একজন মুমিনের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ; সেগুলো পাঠে মুমিনের দুনিয়া-আখেরাতের বহু কল্যাণ অর্জিত হয়, যাকে আমরা দুআয়ে মাছূরা বা মাসনূন দুআ বলি। এগুলোর মধ্যে কিছু তো আছে নির্দিষ্ট সময় বা আমলের সাথে সম্পৃক্ত, যথা সকাল-সন্ধ্যা, আহার, নিদ্রা-জাগরণ ইত্যাদি সময়ে পঠিত দুআ। আর কিছু আছে ব্যাপক দুআ, নামায বা যে কোনো সময় পড়া যায়। যে মুমিন এসব থেকে মাহরূম হলো সে বহু কল্যাণ থেকে মাহরূম হলো। তাই স্বামীর কর্তব্য, স্ত্রী এসব দুআ পারে কি না বা আমল করে কি না- খোঁজ নেয়া।

পর্দা নারীর স্বভাবজাত বিষয়। শরীয়তেরও বিধান। স্ত্রী তা যথাযথ পালন করছে কি না- তাও খুব গুরুত্ব সহকারে খোঁজ রাখা স্বামীর জন্য জরুরি।

---

[১] ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৩৩৬; আবু দাউদ, হাদীস ১৪৫০।

সর্বোপরি দ্বীন শেখা প্রত্যেক নর-নারীর জন্য আবশ্যক। স্ত্রীর দ্বীনী জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থা করছে কি না? ঘরে তালীম হচ্ছে কি না? দ্বীনী কিতাবাদি সংগ্রহ করে স্ত্রীকে পড়ার সুযোগ করে দিচ্ছে কি না?

আসলে সব দিক এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয় এবং তার প্রয়োজনও নেই। মূলকথা হলো, স্ত্রীর আখেরাতের বিষয়ে ফিকির করা এবং তাকে সার্বিক সহযোগিতা করা।

একজন স্ত্রীরও দায়িত্ব স্বামীর ইবাদত, আমল-আখলাক, লেনদেন, হালাল উপার্জন ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে দৃষ্টি রাখা এবং তাকে সহযোগিতা করা। বিশেষ করে স্বামীর আয়-উপার্জনের বিষয়ে ফিকির করা- তা হালাল কি না। কারণ, খাবার হারাম হলে ইবাদাত-বন্দেগী কবুল হয় না। তাই একজন স্ত্রীর কর্তব্য, স্বামীর আয়-উপার্জনের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা এবং সবর ও অল্পে তুষ্টির মাধ্যমে হালাল উপার্জনের ক্ষেত্রে স্বামীকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা। কিন্তু এমন যেন না হয় যে, স্বামী আখেরাতের পথে চলতে চায় আর স্ত্রী তার বিরোধিতা করে। কিংবা স্বামী নিজ স্ত্রীর দ্বীনদারীতে বাধা দেয়।

মূলকথা, স্বামী-স্ত্রী যেহেতু একে অপরের আখেরাতেরও সহযোগী, তাই প্রত্যেকে নিজের আখেরাতের ফিকিরের সাথে সাথে অপরের আখেরাতের ফিকির করাও আবশ্যক। তাই তাদের মাঝে জাগতিক বিষয়ের আলোচনার ন্যায় আখেরাতের বিষয় নিয়েও আলোচনা হতে হবে। কারও মধ্যে কোনো আমল বা গুণের অভাব থাকলে তা চিহ্নিত করে বাস্তবে আনার চেষ্টা করতে হবে। একজন কোনো ভালো কিছু পড়লে, শুনলে বা জানলে অপরকে জানাবে, একজন একটি নেক কাজ করলে অপরজনকেও শরীক করবে। সর্বদা ঘরে আখেরাতের আলোচনার পরিবেশ রাখবে।

কিন্তু আমাদের অনেকের অবস্থা হলো, তাদের সম্পর্ক শুধু জাগতিক; জাগতিক কাজ-কর্মে একজন আরেকজনের নিত্যসঙ্গী, কিন্তু আখেরাতের ক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা নেই। ফলে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কোনো দ্বীনী আলোচনা নেই, কোনো আমলের কথা নেই, কোনো ভালো কথা শুনলে তা অপরজনকে শুনানো নেই। এমনকি কোনো কোনো পরিবারে স্বামী দ্বীনদার ও দ্বীনী জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রীর দ্বীনদারী ও দ্বীনী জ্ঞান আজীবন ঐ অবস্থায়ই থেকে যায়, যা নিয়ে বিবাহের সময় সে এ ঘরে এসেছে। স্বামী আলেম, কুরআনের পারদর্শী, কিন্তু স্ত্রী কুরআনের ক্ষেত্রে প্রায় অজ্ঞ, না জানে পূর্ণ শুদ্ধ করে তেলাওয়াত করতে, না পারে বুঝতে; এভাবে জীবন কেটে যায়!

লজ্জাশীলতা পূর্ণ ঈমানের জন্য জরুরী

কথায় বলে, লজ্জা নারীর ভূষণ। লজ্জাশীলতার গুণ নারীর চরিত্রে যোগ করে এক ভিন্ন মাত্রা। এ গুণ তাকে পবিত্র ও সুন্দর জীবনের স্বাদ দেয়। কুরআনের কাহিনী। ফেরাউনের রাজপরিষদ একবার নবী হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। সংবাদ পেয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন ফেরাউনের এলাকা ছেড়ে। চলে গেলেন মাদয়ানে, আরেক নবী হযরত শুয়াইব আলাইহিস সালামের এলাকা সেটি। তিনি দেখলেন, মাদয়ানবাসীরা একটি কূপ থেকে তাদের পশুকে পানি খাওয়াচ্ছে। কূপের পাশে রাখাল-জনতার ভিড়। আর একটু দূরে নিজেদের পশু আগলে রেখে দাঁড়িয়ে আছেন দুই নারী। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তাদের কাছে দূরে দাঁড়িয়ে থাকার কারণ জানতে চাইলেন।

তারা জানালেন : 'আমাদের বাবা অতিশয় বৃদ্ধ। তাই পশুগুলোকে পানি খাওয়ানোর জন্যে আমাদের আসতে হয়েছে। কিন্তু রাখালেরা এখান থেকে চলে যাওয়া পর্যন্ত আমরা আমাদের পশুদের পানি খাওয়াতে পারি না।' তারা দুজন ছিলেন হযরত শুয়াইব আলাইহিস সালামের কন্যা। তাদের এ কথা শুনে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তাদের পশুকে পানি খাইয়ে দেন। এরপর তারা চলে যায়। তিনিও সেখান থেকে চলে আসেন এক গাছের ছায়ায়।

এরপর তাদের একজন তাঁর কাছে আবার ফিরে আসে। কুরআনের ভাষায়- 'তখন নারীদ্বয়ের একজন লজ্জা জড়িত চরণে তার নিকট এলো এবং বলল, আমার পিতা আপনাকে আমন্ত্রণ করছেন, আমাদের পশুগুলোকে পানি পান করানোর প্রতিদান দেয়ার জন্যে।'[১]

এই যে রাখালদের ভিড় ছেড়ে দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা, আর বাবার পক্ষ থেকে অচেনা এক পুরুষের নিকট সংবাদ পৌঁছে দেয়ার সময় নিজেকে লজ্জায় আবৃত করে রাখা- এগুলো চিরাচরিত সেই প্রবাদকেই মনে করে দেয়।

সৃষ্টিগতভাবেই নারীর চরিত্রে লজ্জাশীলতা একটু বেশি। এই লজ্জাশীলতা নারীর অহংকার। রূপ-সৌন্দর্যে পিছিয়ে থেকেও এ গুণে নিজেকে গুণান্বিত করে কোনো নারী হয়ে উঠতে পারে সকলের প্রিয়, চোখের মণি। আর চোখ ধাঁধানো সৌন্দর্য নিয়েও যদি কেউ এ থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে সে হয় ধিকৃত, নিন্দার পাত্র।

প্রচলিত প্রবাদে এ লজ্জাশীলতা যদিও নারীর অলংকার, কিন্তু বাস্তবিক অর্থে তা নারী-পুরুষ সকলের জন্যেই অপরিহার্য। লজ্জা একটি মানবিক গুণ। এর পরিচয় হিসেবে বলা যায়, ভালো-মন্দ যে কোনো কাজ করার, যে কোনো পথ বেছে নেয়ার সুযোগ ও সক্ষমতা প্রতিটি মানুষেরই আছে।

এ সুযোগ ও সক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে যারা ভালো পথ বেছে নেয়, ভালো কাজ করে, তারা দুনিয়াতেই পুরস্কৃত হয়, অভিনন্দিত হয় কিংবা প্রশংসিত হয়।

---

[১] সূরা কাসাস : ২৫

আর যারা মন্দ পথ ও মন্দ কাজ বেছে নেয়, তারা লাঞ্ছিত হয়, শাস্তি পায়, অন্তত নিন্দিত ও ধিকৃত তো হয়ই। উপরন্তু ভালো-মন্দ সবকিছুতেই রয়েছে পরকালীন প্রতিদান-বেহেশত কিংবা দোজখ। প্রাথমিক সুযোগ ও সক্ষমতা কাজে লাগিয়ে কেউ যখন কোনো মন্দ পথে পা বাড়ায়, সেটা হতে পারে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মন্দ, কিংবা সামাজিক বা নৈতিক যে কোনো দিক থেকে, তখন যার মাঝে যতটুকু মানবিক বোধ থাকে এবং কাজটিকে সে যতটুকু মন্দ বিবেচনা করে, সে চায় তার এ মন্দ কাজটা ততটাই গোপন থাকুক। অন্য কেউ তার এ মন্দ কাজের কথা না জানুক। কেউ যদি দেখে ফেলে কিংবা জেনে যায় তাহলে সে মনে মনে সংকুচিত হয়। এ সংকুচবোধের নামই লজ্জা।

লজ্জাশীলতা যে কেবল একটি মানবিক বিষয়, এমন নয়। হাদীসের ভাষ্য অনুসারে তা ঈমানের অংশ। নবীজী বলেছেন-

اَلإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ

ঈমানের সত্তরোর্ধ কিংবা ষাটোর্ধ্ব শাখা রয়েছে। এর মাঝে সর্বোত্তম হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা, আর সর্বনিম্নটি হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস ফেলে দেয়া। আর লজ্জাশীলতাও ঈমানের একটি শাখা।[১]

শুধুই কি ঈমানের শাখা? এ লজ্জাশীলতাকে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীন ইসলামের মূল চরিত্র হিসেবেই অভিহিত করেছেন-

প্রতিটি দীনেরই একটি চরিত্র রয়েছে। ইসলামের চরিত্র হলো লজ্জাশীলতা।[২]

লজ্জাশীলতা যার মাঝে যতটুকু থাকে, প্রকাশ্যে কোনো অন্যায় করতে সে ততটাই সংকোচ বোধ করে। এর ফলে সহজেই সে বেঁচে যায় বহু অন্যায় কাজ থেকে। ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, এ লজ্জাশীলতার কারণে তখন বাধ্য হয়েই মন্দ কাজ আর মন্দ পথ পরিহার করে চলতে হয় সুন্দর ও ন্যায়ের পথে। প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কী অর্থপূর্ণ সরল বাণী-

اَلْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ "লজ্জাশীলতা কেবলই কল্যাণ নিয়ে আসে।"[৩]

মানবচরিত্রের এ গুণ কোনো নতুন বিষয় নয়। বরং যখন থেকে মানব-ইতিহাসের যাত্রা, তখন থেকেই লজ্জাশীলতার সূচনা। প্রথম নবী ও প্রথম মানুষ হযরত আদম আলাইহিস সালাম আর তাঁর সঙ্গিনী হযরত হাওয়া রা.-এর ঘটনা তো সবিস্তারে কুরআনেই বর্ণিত হয়েছে-'অতপর যখন তারা সেই বৃক্ষ ফলের

---

[১] মুসলিম শরীফ, হাদীস ৩৫।
[২] ইবনে মাজাহ, হাদীস ৪১৮১।
[৩] বুখারী শরীফ, হাদীস ৬১১৭।

আস্বাদ গ্রহণ করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশিত হয়ে পড়লো এবং তারা জান্নাতের পাতা দিয়ে নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগল।'[১]

নবীজী এ গুণটির প্রাচীনতার কথা বলেছেন- নবুওতের সূচনাকাল থেকে যে বিষয়গুলো মানুষের মাঝে (অবিচ্ছিন্নভাবে) আছে সেসবের অন্যতম হলো- তুমি যখন নির্লজ্জ হয়ে পড়বে তখন যা ইচ্ছা তা-ই করো।[২]

অর্থাৎ লজ্জাশীলতা যদি কারও মাঝে না থাকে, তাহলে সে আর কোনো অন্যায়কেই পরোয়া করবে না। অনৈতিক কিংবা পাপের কোনো কাজ করতে গিয়ে সে মনে মনে সংকুচিত হবে না। কেউ তাকে দেখে ফেলে কি না- এমন কোনো আশংকাও তার মনে থাকবে না। ফলে পাপকর্ম কিংবা অসামাজিক ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থেকে ভালো পথে চলার মতো কোনো প্রেরণা নিজের পক্ষ থেকে সে পাবে না। ভালো-মন্দের বাছ-বিচার হারিয়ে সে তখন যা ইচ্ছা তা-ই করবে। কোনো অসহায়কে দেখে পকেট থেকে টাকা বের করে তার হাতে তুলে দিতে পারে, আবার কারও কাছে টাকা দেখলে সে টাকা লুট করার জন্যে তার ওপর হামলেও পড়তে পারে। কেউ কিছু বলবে কি না, কেউ দেখে ফেলল কি না- এমন কোনো চিন্তা তো আর তার মাথায় নেই। লজ্জাশীলতা এভাবেই মানুষকে কল্যাণের পথে টেনে আনে। লজ্জা বলতে আমরা সাধারণত মানুষে মানুষে পারস্পরিক লজ্জার কথাই বুঝি। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সন্দেহ নেই, কিন্তু রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে লজ্জাশীলতার এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ একটি দিকের নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তোমরা আল্লাহর সঙ্গে যথাযথ লজ্জা অবলম্বন করো। সাহাবায়েকেরাম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আলহামদু লিল্লাহ, আমরা লজ্জা অবলম্বন করি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন-

لَيْسَ ذَاكَ، وَلَكِنِ الاِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ.

"আমি তো এটা বলিনি। বরং আল্লাহর সঙ্গে যথাযথ লজ্জা হবে এমন- তুমি মাথা হেফাযত করবে, মাথা যা কিছু ধারণ করে তাও হেফাযত করবে, পেট হেফাযত করবে, পেট-সংলগ্ন যা কিছু আছে তাও হেফাযত করবে, আর মৃত্যুকে স্মরণ করবে, স্মরণ করবে (মৃত্যু পরবর্তী সময়ে) চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মাটিতে মিশে

---

[১] সূরা আ'রাফ : ২২।

[২] বুখারী শরীফ, হাদীস ৬১২০।

যাওয়াকেও। আর যে পরকাল কামনা করে সে তো দুনিয়ার জৌলুস বর্জন করে। এগুলো যে করতে পারল সে-ই আল্লাহর সঙ্গে যথাযথ লজ্জা অবলম্বন করল।"[১]

হাদীসের বাণী স্পষ্ট। আল্লাহ তাআলার সঙ্গে পূর্ণ লজ্জাশীল আচরণ করতে চাইলে নিজেকে বেঁচে রাখতে হবে সব রকম গোনাহের কাজ থেকে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও সামনে যেমন মাথা নত করা যাবে না, তেমনি রুকু-সেজদা তথা নামায হতে হবে সম্পূর্ণ লৌকিকতা মুক্ত। পাপ থেকে মুক্ত রাখতে হবে মাথার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জিহ্বা চোখ নাক কানকেও। পেটে যেন কোনো হারাম খাবার না ঢুকে সেদিকে যেমন সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে, তেমনি পেট-সংলগ্ন অঙ্গসমূহ যেমন, লজ্জাস্থান হাত পা ইত্যাদিকেও হেফাযত করতে হবে সব রকম নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড থেকে। স্মরণ করতে হবে অনিবার্য মৃত্যুকে, মৃত্যুর পর মাটিতে মিশে যাওয়াকে। মৃত্যুর স্মরণ যদি তাজা থাকে, তাহলে মানুষ পাপ ছাড়তে বাধ্য। সর্বশেষ কথা, পরকালীন সফলতা আর দুনিয়ার চাকচিক্য তো একসঙ্গে থাকতে পারে না। কেউ কেউ তো এ দুটো বিষয়কে দুই সতীনের সঙ্গেই তুলনা করেছেন। পরকালে মুক্তি পেতে হলে দুনিয়ার চাকচিক্য ছাড়তে হবে। এভাবে মাথা থেকে পা পর্যন্ত নিজের প্রতিটি অঙ্গকে যে পাপমুক্ত রাখতে পারবে, কেবল সে-ই তো আল্লাহ তাআলার সঙ্গে লজ্জা অবলম্বন করল।

বিষয়টি আমরা ভিন্নভাবেও বুঝতে পারি। মানুষ যখন কোনো অন্যায় করে আর তা কেউ জেনে যায়, তখনই সে লজ্জায় নীল হয়। কেউ যদি কাউকে কোনো প্রকার অনুগ্রহ করে, বিপদে সহযোগিতা করে, সুখে-দুঃখে পাশে দাঁড়ায়, আর এ অনুগ্রহকারীর কোনো কথা সে রাখতে না পারে তখনো সে লজ্জায় কুঁকড়ে যায়। আর আল্লাহ সম্পর্কে তো আমাদের স্থির বিশ্বাস- তিনি সবকিছু দেখেন, শুনেন। ন্যায়-অন্যায় যা-ই আমরা করি না কেনো, তাঁর অজানা থাকে না কিছুই। যা প্রকাশ্য তাও তিনি জানেন, যা কিছু রাতের অন্ধকারে বাড়ির ভেতরের গোপন কক্ষে করা হয় তাও তিনি জানেন। আবার তিনিই তো সবচেয়ে বড় অনুগ্রহশীল। দুর্যোগে বিপদে তিনিই আমাদের আশ্রয়। তিনি যেহেতু সবকিছুই জানেন, তাই তাঁর সঙ্গে লজ্জা অবলম্বন করতে হলে তো অবশ্যই তাঁর অবাধ্যতা ছাড়তে হবে। কিংবা কোনো পাপে জড়াতে চাইলে এমন কোনো স্থান খুঁজে নিতে হবে, যা তাঁর দৃষ্টির বাইরে। আর এটা যে অসম্ভব- তা কে অস্বীকার করবে? তবে মনে রাখতে হবে, এ লজ্জাশীলতা যতক্ষণ কাউকে পাপ থেকে বিরত রাখবে, অন্যায়-অপকর্ম-অনৈতিকতা থেকে মুক্ত রাখবে, ততক্ষণই তা কল্যাণকর। লজ্জার কারণে যখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাউকে দান করতে হয়, কিংবা কারও প্রতি সহযোগিতার হাত বৃদ্ধি করে দিতে হয় তখনো তা কল্যাণকর। কিন্তু

[১] জামে তিরমিযী, হাদীস ২৪৫৮।

এ লজ্জা যদি কারো কল্যাণের পথে, ন্যায়ের পথে, ইলম অর্জনের পথে, সঠিক পদ্ধতিতে আল্লাহ তা'লার ইবাদতের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে তখন আর তা কল্যাণকর নয়। সাহাবায়েকেরাম তো পবিত্রতা সংক্রান্ত খুঁটিনাটি নানা বিষয় নবীজীকে জিজ্ঞেস করতেন। তিনিও নিঃসঙ্কোচে উত্তর দিতেন। অথচ হাদীসের ভাষ্য অনুসারে, তিনি ছিলেন অন্তঃপুরিকা কুমারীর চেয়েও অধিক লজ্জাশীল।[১]

মেয়ের প্রতি মায়ের দশটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

উমামা বিনতে হারেছ। যেসকল মহীয়সী নারীদের গৌরবগাঁথা আজও ইতিহাসের পাতায় ঝলমল করে তিনি তাদের অন্যতম। সাহিত্যের জগতে ছিল তার পূর্ণ পদচারণা। বিদ্যা-বুদ্ধিতেও তিনি ছিলেন অতুলনীয়। তার মেয়ে উম্মে ইয়াস অত্যন্ত রূপবতী, গুণবতী ও বুদ্ধিমতী মেয়ে। তার জন্য বিয়ের প্রস্তাব আসে কিন্দার বাদশা হারেছ বিন আমরের পক্ষ থেকে। মা-বাবা এ প্রস্তাবটি সাদরেই গ্রহণ করেন এবং তার হাতেই নিজেদের আদরের কন্যাকে তুলে দেন।

বিদায় বেলায় উমামা বিনতে হারেছ অশ্রুসিক্ত নয়নে পরম মমতায় মেয়েকে কাছে টেনে বলেন, আদব-কায়দা সম্পন্ন, শিষ্টাচারী, সদাচারীকে যদি উপদেশ দেয়ার প্রয়োজন না হতো আমি তোমাকে কোনো উপদেশ দিতাম না। তবুও তোমাকে কিছু উপদেশ দিচ্ছি। কারণ, উপদেশ গাফেলদের জন্য হয় স্মারক, তাদের পুনরায় স্মরণ করে দেয়। আর জ্ঞানীদের জন্য হয় সহায়ক। তারা উপদেশের মধ্যে পাথেয় খুঁজে পায়। মাতা-পিতার স্নেহ-মমতা ও অর্থ-ঐশ্বর্যের কারণে যদি মেয়েদের স্বামীর ঘরে যাবার প্রয়োজন না হতো, তাহলে তোমারও প্রয়োজন ছিল না আজ স্বামীর ঘরে যাবার। কিন্তু মেয়েদের স্বামীর ঘরে যেতেই হয়। কেনোনা, আল্লাহ তাআলা নারীদের সৃষ্টি করেছেন পুরুষের জন্য। আর পুরুষদের সৃষ্টি করেছেন নারীদের জন্য।

কেনো! যে ঘরে, যে পরিবেশে ছোট থেকে এই পর্যন্ত তোমার বেড়ে ওঠা, আজ সেই ঘর ও পরিবেশকে ছেড়ে তুমি চলে যাচ্ছ সম্পূর্ণ এক অচেনা-অজানা পরিবেশে। পরিচিত আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের ছেড়ে তুমি পাড়ি জমাচ্ছ এমন একজন মানুষের কাছে, যার সঙ্গে তোমার পূর্ব পরিচয় নেই। আজ থেকে তোমার ওপর তারই পূর্ণ অধিকার। সে-ই তোমার অভিভাবক। তুমি নিজের সর্বস্ব তার জন্য বিলে দাও, তাহলে সেও সবকিছু তোমার জন্য বিলে দেবে।

প্রিয় মেয়ে! তোমাকে আমি দশটি উপদেশ করছি। এগুলো তুমি খুব ভালো করে স্মরণ রাখবে। যেগুলোর দ্বারা একজন জীবনে শান্তি পাবে। যথা-

[১] ইবনে মাজাহ, হাদীস ৪১৮০।

❖ অল্পতেই তুমি সন্তুষ্ট থাকবে। অল্পে তুষ্টি ও পরিতৃপ্তিকে সবর্দা নিজের সঙ্গী বানিয়ে নেবে।

❖ যে কোনো আদেশ পালন করার জন্য সবসময় নিজেকে প্রস্তুত রাখবে।

❖ যে সকল স্থানে সচরাচর চোখ যায় সেদিকে তুমি সতর্ক দৃষ্টি রাখবে! এবং দুর্গন্ধযুক্ত স্থানের দিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখবে! যেন তোমার অপ্রীতিকর কোনো কিছু তার চোখে না পড়ে এবং কোনো দুর্গন্ধ যেন তার নাকে না যায়।

❖ সে যখন খেতে বসবে, তুমি যত্নসহকারে তা দেখবে। আর তার ঘুমের সময় যথা সম্ভব শান্তভাব ও নীরবতা বজায় রাখবে। কারণ, ক্ষুধা মেযাজের মধ্যে উষ্ণতা সৃষ্টি করে আর ঘুমের অভাব ক্রোধের উদ্রেক সৃষ্টি করে।

❖ তার ঘর-বাড়ি ও ধন-সম্পদ আন্তরিকভাবে সংরক্ষণ করবে এবং নিজের ও পরিবারের প্রতি খুব যত্নশীল হবে। কারণ, ধন-সম্পদ সংরক্ষণ করতে পারা উত্তম ব্যবস্থাপনার পরিচায়ক। আর নিজের ও পরিবারের প্রতি যত্ন নিলে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় হয়।

❖ সে হয়ত তোমার কাছে তার একান্ত গোপন কথা বলবে। তুমি কখনো কোনো অবস্থাতেই তার সে গোপন কথাগুলো কারো কাছে প্রকাশ করবে না। যদি প্রকাশ কর, নিজের বিশ্বস্ততা হারাবে।

❖ যদি সে তোমাকে কোনো কাজের আদেশ করে তৎক্ষণাৎ সেটা পালন করার চেষ্টা করবে। তার কোনো আদেশ অমান্য করো না এবং তার কোনো হুকুমের অবাধ্য হয়ো না। যদি তার অবাধ্য হও, সে ক্রোধান্বিত হয়ে তোমার সঙ্গে বিরূপ আচরণ করবে।

❖ তার যখন হৃদয় ভগ্ন থাকবে, সে যখন বিষণ্ন থাকবে তখন তুমি তার সামনে আনন্দ ও খুশি প্রকাশ করো না। এটা খুবই গর্হিত একটা অভ্যাস। আবার সে যখন আনন্দিত ও খুশি থাকবে, তখন তুমি তার সামনে বিষণ্ন থাকুন না। কেনোনা এতে সে ভীষণ বিরক্তি বোধ করবে।

❖ তার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এমন কাজগুলোর প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিবে। তাহলে সেও এমন কাজগুলো করবে, যেগুলোর মাধ্যমে তোমার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

❖ আর যেভাবে চললে সে খুশি হবে, যেভাবে চললে তার মর্জি মাফিক হবে তুমি সেভাবেই চলার চেষ্টা করবে। তাহলে সেও এমনভাবে চলবে, যেভাবে চললে তুমি খুশি হবে। মনে রাখবে! নিজের পছন্দের উপর অন্যের পছন্দকে এবং নিজের বাসনার উপর অন্যের বাসনাকে অগ্রাধিকার দেয়া ছাড়া কেউ কখনো কারো প্রিয় ও ভালোবাসার পাত্র হতে পারে না। অন্যের কাছে নিজেকে প্রিয় ও আপন করার জন্য অনেক কিছুই বিসর্জন দিতে হয়।

এই নেককার রমণী স্বামীর ঘরে গিয়ে মায়ের প্রতিটি উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। এরই বরকতে আল্লাহ তাআলা তাদের সাংসারিক জীবনকে করেছিলেন সুখময়। তার গর্ভে জন্ম নিয়েছিল সাতটি পুত্র সন্তান। তারা সকলেই পর্যাক্রমে ইয়েমেনের বাদশা হয়েছিল।[১]

পিতা-মাতা সন্তানের কল্যাণকামনা করা

স্বাভাবিকভাবে বিবাহের পর সন্তান-সন্ততি হবে। আর সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার ভালোবাসা ও কল্যাণকামনার কোনো তুলনা হয় না। সন্তানের কল্যাণ কামনারও দুটি দিক রয়েছে। এক হলো জাগতিক হিসাবে; আমার সন্তান বড় হবে, আয়-উপার্জন করবে, অনেক বড় সম্পদশালী হবে, নাম-সুনাম কামাবে, আমার সুখ ও সুনাম হবে। আরেকটি হলো, এ সন্তান যেহেতু আল্লাহ দান করেছেন, সুতরাং তাকে খাঁটি আল্লাহর বান্দারূপে গড়ে তুলব। এজন্যই আল্লাহর নবীগণ যখন আল্লাহ তাআলার নিকট সন্তান চাইতেন এ উদ্দেশ্যেই চাইতেন। হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরও আল্লাহর নিকট এ বলে সন্তান চেয়েছেন। হে আল্লাহ! আমার অস্থিরাজি পর্যন্ত দুর্বল হয়ে গেছে, মাথায় বার্ধক্য উজ্জল হয়ে উঠেছে। সুতরাং আপনি আপনার নিকট থেকে এমন এক উত্তরাধিকারী দান করুন, যে আমারও উত্তরাধিকারী হবে এবং ইয়াকুবেরও এবং আপনি তাকে আপনার সন্তুষ্টি প্রাপ্ত বানান।[২]

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সন্তানদের জন্য এভাবে দুআ করেন-

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সালাত কায়েমকারী করুন; এবং আমার বংশধরদের মধ্য হতেও। হে আমাদের প্রতিপালক আমার প্রার্থনা কবুল করুন।[৩]

সন্তানেরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে- হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম এজন্যও সন্তান কামনা করেছেন।[৪]

কুরআন মাজীদে রহমানের বান্দা-এর গুণাগুণ বর্ণনা করে একটি দীর্ঘ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন, সেখানে তাদের একটা গুণ বর্ণিত হয়েছে-

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

'হে আমাদের রব আমাদেরকে চক্ষু শীতলকারী স্ত্রী-সন্তান দান করুন এবং আমাদেরকে বানান মুত্তাকীদের ইমাম-মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণ যোগ্য।[১]

---

[১] আ'লামুন নীসা : ১/৭৪।
[২] সূরা মারইয়াম : ৪ থেকে ৬।
[৩] সূরা ইবরাহীম : ৪০।
[৪] বুখারী 'বাবু মান তালাবাল ওলাদা লিল জিহাদ' অধ্যায়

এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে যে, বিবাহের মধ্যে দুটি দিক রয়েছে, একটি হলো জাগতিক দিক, অন্যটি হলো দ্বীনী বা আখেরাতের দিক। তাই স্বামী-স্ত্রী একে অপরের জাগতিক কল্যাণ নিয়ে যেমন ভাববে, তেমনি আখেরাতের কল্যাণ কামনায়ও ব্যাকুল হবে।

মুসলিম নারী ও বিজ্ঞান

ইসলামী সভ্যতার ইতিহাসে বিজ্ঞান চর্চায় পুরুষদের অবদান সম্পর্কে বিপুল পরিমাণে বিবরণ বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান চর্চায় মুসলমান নারীদের অবদান সেই তুলনায় ঐতিহাসিকদের আলোচনায় আসতে সক্ষম হয়নি।

পুরুষের পাশাপাশি মুসলমান নারীরা ধর্মতত্ত্ব, কাব্য, সাহিত্য, আইন প্রভৃতি বিষয়ের মত বিজ্ঞান চর্চায়ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

রাসূল সা. এর সমকালীন অনেক নারীই চিকিৎসা সেবার সাথে জড়িত ছিলেন। যুদ্ধে আহতদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে তারা রাসূল সা. এর সাথে যুদ্ধেও গমন করেছিলেন।

নুসাইবা বিনতে কাব আল-আনসারী রা. ছিলেন মদীনার একজন প্রখ্যাত নারী চিকিৎসক। উম্মে আম্মারা নামে অধিক খ্যাত এই নারী সাহাবী। যিনি রাসূল সা. এর মদীনায় হিযরতের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। উহুদের যুদ্ধের সময় রাসূল সা. কে প্রতিরক্ষার জন্য তার লড়াইয়ের কারণে তিনি ইতিহাসে অধিক পরিচিত। রুফাইদা বিনতে সাদ আল-আসলামিয়া রা. ছিলেন রাসূল সা. এর সমকালীন মদীনার অপর একজন নারী চিকিৎসক। তাকে "ইসলামের প্রথম নার্স" হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। তিনি মূলত তার চিকিৎসক পিতা সাদ আল-আসলামীর নিকট থেকে চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি চিকিৎসাবিদ্যায় এতই বুৎপত্তি অর্জন করেন যে, রাসূল সা. যুদ্ধে আহত সকল সৈনিককে তার নিকট চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করতেন।

মধ্যযুগেও মুসলমান নারীরা বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফলতার সাথে তাদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। ইবনে আল-জাওযী, ইবনে আল-খতীব বাগদাদী এবং ইবনে কাসীর সহ প্রমুখ ঐতিহাসিক দশম শতাব্দীর একজন নারী গণিতবিদের প্রশংসা করেছেন। সুতাইতা আল-মাহামালি নামের এই নারী গণিতবিদ বাগদাদের এক বিদ্যোৎসাহী পরিবারের সন্তান ছিলেন। তার পিতা ছিলেন বাগদাদের একজন বিচারপতি ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিত্ব। গণিতের বিভিন্ন শাখায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। এছাড়া একইসাথে তিনি আরবী সাহিত্য, হাদীস এবং আইনশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

---

[১] সূরা ফুরকান : ৭৪

মধ্যযুগে আন্দালুসিয়ার উমাইয়া দরবারের একজন শিক্ষাবিদ ছিলেন লুবনা আল-কুরতুবিয়া। তিনি একাধারে গণিত, কাব্য, ব্যাকরণ ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উপর বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তার জ্ঞানগত দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার কারণে তিনি খলীফা ৩য় আবদুর রহমান এবং তার পুত্র ২য় আল-হাকামের দরবারের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

অর্থায়ন : মধ্যযুগে ধনাঢ্য পরিবার থেকে আগত অনেক মুসলমান নারীই শিক্ষা ও বিজ্ঞান গবেষণায় অর্থায়ন করে ইসলামী সমাজ ও সভ্যতার উন্নয়নে অবদান রেখেছেন। খলীফা হারুন আল-রশীদের স্ত্রী যুবাইদা বিনতে জাফর ছিলেন তার সমকালীন ধনাঢ্য ও ক্ষমতাশালী নারী। বাগদাদ থেকে মক্কা যাওয়ার পথে পথিকদের সুপেয় পানি সরবরাহের জন্য নাহরে যুবাইদা (যুবাইদার খান) তারই তৈরি। শিক্ষার বিস্তারের জন্য মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও নির্মাণ করেন।

মরক্কোর ফেজের অধিবাসী ফাতিমা আল-ফিহ্‌রী ছিলেন আরেকজন বিত্তশালী নারী যিনি শিক্ষা বিস্তারে তার অর্থ ব্যয় করেন। বিশ্বের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় আল-কারাউন বিশ্ববিদ্যালয় তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন।

আলেপ্পোর আমীর আল-জহির গাজীর স্ত্রী দাইফা খাতুন আলেপ্পোতে দুইটি বিখ্যাত স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম স্কুলটির নাম মাদরাসা আল-ফেরদাউস। এটি ইসলামী ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামী আইনের শিক্ষা প্রদানের জন্য বিখ্যাত ছিল। এছাড়া তার নির্মিত অপর স্কুলটি আইন ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সংক্রান্ত জ্ঞান প্রদানের জন্য বিখ্যাত ছিল।

সর্বশেষে বলা যায় ওসমানীয় সুলতান সুলাইমানের স্ত্রী হুররেম সুলতানের নাম, শিক্ষা বিস্তারের জন্য যিনি ইস্তানবুলে প্রতিষ্ঠা করেন হাসেকি কুল্লিয়েহ কমপ্লেক্স। একটি মসজিদ, কলেজ এবং লঙ্গরখানার সমন্বয়ে গঠিত পুরো কমপ্লেক্সটি। এছাড়া এখানে নারী ও পুরুষদের জন্য আলাদা ব্যবস্থাপনায় গোসলখানা, হাসপাতাল এবং দুইটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থানও রয়েছে এই কমপ্লেক্সে।

মুসলমান নারীর প্রতিভা যুগে যুগে

মুসলিম খেলাফত অবসানের সাথে সাথে মুসলমান নারী সমাজ যেন হেরেমে বন্দী হলো-এর পর থেকে মুসলিম জাহানে সমাজ-সংস্কৃতি, শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীদের পদচারণা যেন স্তব্দ হয়ে গেল। এ ছাড়াও মুসলমান নারীদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য এতো কম আলোচিত হয়েছে যে, আজকের নবীন বংশধরেরা মনে করতে পারছে না যে, তাদের পূর্ববর্তী মায়েরা ছিলন অতি উচ্চ স্তরের মহিলা- শুধু ধর্মীয় জীবনেই নয়, সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে তাদের ছিল উজ্জ্বল ঈর্ষণীয় ভূমিকা। এই ইতিহাস ও গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য সম্পর্কে অনবহিত

থাকার কারণে আমাদের বর্তমান মা বোনেরা নারী অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে যে সব কথা বার্তা বলেন তার মধ্যে একটি আত্মসমর্পিত মনোভাব ফুটে ওঠে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কালে পশ্চিমা জগতে নারী অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে যে প্রতিক্রিয়া জাগ্রত হয়েছে তার ঢেউয়ে আধুনিক মুসলমান নারী সমাজও যেন তলিয়ে যাচ্ছে। আজ তারা তাদের অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্য ভুলে গিয়ে যেন অপরাধীর কাঠ গড়ায় দাঁড়িয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে স্বস্তি অনুসন্ধান করছে। ব্যাপারটি এ রকম হওয়ার কথা ছিল না। যখন গোটা বিশ্বের নারী সমাজ পিছে ছিলো, তখন ইসলাম নারী সমাজকে সামনে এগিয়ে দিয়েছে, যার পরিণতিতে তারা জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছিল একটি বিশ্ব বিজয়ী জাতি।

হযরত মুহাম্মাদ সা.-এর জীবদ্দশায় ও তাঁর ওফাত পরবর্তীতে হযরত আয়েশা রা. ও হযরত ফাতেমার রা. যে অদম্য সাহসিকতা নিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার খেদমত করেছেন তা বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। হাদীস, ফিকাহ এবং ইলমে তাফসীরের ক্ষেত্রে হযরত আয়েশা রা.-এর অবদান বিশ্বে আলেম সমাজ শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করে। হযরত আয়েশা রা. তাঁর ৬৫ বৎসর জীবদ্দশায় ২২১০টি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি একাধারে ছিলেন সমসাময়িক যুগের অন্যতমা ফকীহা, আলেমা ও বিশেষ মর্যাদার অধিকারিণী। অসংখ্য হাদীস বর্ণনাসহ যুদ্ধের বিবরণ দানে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুনিপুনা। কবিতা আবৃতি ও রচনায়ও তাঁর দক্ষতা ছিল অতি চমৎকার। অসংখ্য সাহাবা ও তাবেয়ী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। উরওয়া ইবনে যুবায়ের ও কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ তাঁর থেকে বেশি রেওয়ায়েত করেছেন। অন্যান্য উম্মুল মুমিনীনগণও বেশ হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা ৩৭৮টি, হযরত হাফসা ৬০টি, উম্মে হাবিবা ৬৫টি, হযরত মাইমুনাহ ৪৬টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়াও হযরত উম্মে হানী ৪৬টি, হযরত আসমা বিনতে আবু বকর ৫৬টি ও উম্মে আতিয়াহ ৪১টি হাদীস রেওয়ায়েত করেন।

ড. মুহাম্মাদ জুবায়ের সিদ্দিকী বলেন, মুসলিম ইতিহাসের প্রত্যেকটি যুগ পর্যায়ে পুরুষ সহযাত্রী মুসলিমদের পাশাপাশি বহু প্রখ্যাত কীর্তিমান মুসলিম রমনী রেওয়ায়েতকার হিসেবে বিদ্যমান ছিলেন।"

এ প্রসঙ্গে আমরা দেখতে পাই পুরুষ মুফাসসিরদের তুলনায় অনেক বেশি উচ্চ শিক্ষিতা নারী ছিলেন উম্মে আল দারদা, যাকে হাসান আল বসরী ও ইবনে শিরিন-এর চেয়েও উচ্চ মর্যাদায় আসীন করে ছিলেন মুসলিম বিদ্যানুরাগীগণ। এ ছাড়াও হাদীস শাস্ত্রে দেখা যায় আমরা নামীয় বিদূষী নারীকে। তাঁর শিক্ষার্থীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মদীনার মহামান্য বিচারক আবুবকর ইবনে হাজম। এ মহিলার পাণ্ডিত্যে বিমোহিত হয়ে খলিফা ওমর ইবনে আবদুল

আজিজ 'আমরা' কে আদেশ দিয়ে ছিলেন তাঁর সংগ্রহীত সমস্ত হাদীস লিপি বদ্ধ করতে। হাদীস শাস্ত্রে জয়নাব বিনতে সুলায়মান ছিলেন আর এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। কারিমা আল মারওয়াজিয়া বুখারীর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য টীকাকার হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন। হেরাতের আলেমগণ তাঁর শিক্ষার্থীদেরকে বুখারীর জ্ঞানার্জন করার জন্য কারিমার দ্বারস্থ হওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ খতিব আল বাগদাদী তাঁর ছাত্র ছিলেন।

উমাইয়া যুগে নারীরা সামাজিক স্বাধীনতা ভোগ করত। "হযরত ইমাম হুসাইনের কন্যা সাঈদা সখিনা, তালহার কন্যা আয়েশা, মক্কার খার্কা এবং ওয়ালিদের মহিসী উম্মুল বানীন ছিলেন ঐ যুগের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী ও প্রতিভা সম্পন্ন মহিলা। খলিফা মুয়াবিয়ার কন্যা আতিকা এবং আবদুল মালিকের স্ত্রী আতিকা খলিফাদের উপরে প্রচুর প্রভাব খাটাতেন। আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রেও নারীগণ পশ্চাদপদ ছিলেন না। এ যুগের তাপসী রাবেয়া সাধ্বী ও সাধিকা রূপে আজও মুসলিম জগতে কীর্তিত হিসেবে আছেন। এ ছাড়াও ঐ যুগের বহু আরব নারী কবিতা রচনা ও আবৃত্তির জন্য খ্যাতি অর্জন করেন।"

উমাইয়া পরবর্তী আব্বাসীয় যুগে পুরুষের সঙ্গে নারীরাও শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতেন। বিশেষত সঙ্গীত বিদ্যায় তারা বিশেষ স্থান অধিকার করে ছিলেন। এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদূষী নারী ছিলেন উবাইদা, শাইখা, শুহদা, যায়নাব, উম্মুল মুয়াইদ। রাজনীতির ক্ষেত্রে হারুণ আর-রশীদের মাতা খাইজুরান এবং মহিয়সী জুবাইদা এবং মামুনের স্ত্রী বুরান আব্বাসীয় যুগের শ্রেষ্ঠ গৌরব স্বরূপ ছিলেন। খলিফা হারুণ আর-রশীদের যোগ্য সহধর্মিনী যুবাইদা ফোরাত হতে মক্কা পর্যন্ত একটি নহর খনন করেন, যা 'নহরে জোবায়দা' নামে আজও মানুষের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ নগরী বিধ্বস্ত হওয়ার পরেও মোঙ্গলগণ সেখানে অনেক মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। হালাকু খানের জননী বুখারাতে দুইটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ গুলির প্রতেকটিতে দৈনিক ১০০০ শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করত। মধ্য এশিয়ার তৈমুর লঙের স্ত্রী একটি মাদরাসা স্থাপন করেন।

তৈমুরের বংশধর মোগলদের হেরেমে অনেক সাহসিনী বিদূষী নারী বর্তমান ছিলেন। সম্রাট বাবরের কন্যা গুলবদন ছিলেন এক উঁচু স্তরের কবি। তিনি বাবর ও হুমায়ুনের উপরে রচনা করেন 'হুমায়ুন নামা'। হুমায়ুনের বোনের কন্য শাহজাদী সেলিমা ছিলেন মোগল হেরেমের অন্যতম উল্লেখ যোগ্য বিদূষী রমনী। ঐতিহাসিক বদায়ুনী সেলিমা বেগমকে একজন জ্ঞানী পন্ডিত ও কবি হিসেবে উল্লেখ করেন। এ ছাড়া নূরজাহান, মমতাজ বেগম ও জাহানারার নাম জানে না এমন লোক খুব কম পাওয়া যাবে। মোগল পরিবারের সবচাইতে বিখ্যাত ছিলেন

জেবুন্নেসা। আওরঙ্গজেবের কন্যা বেগম জেবুন্নেসা ছিলেন সে সময়কার বিখ্যাত কবি। শাহজাদী জেবুন্নেসা 'মখফী' ছদ্ম নামে লিখতেন। তাঁর কবিতা সংগ্রহ 'দেওয়ানে মখফী' ফারসী সাহিত্যের এক বিরাট সম্পদ।

মোগল বংশের শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহ্ জাফর। তাঁর স্ত্রী জিনাত মহল। এই বীর নারীর প্রেরণায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল এ দেশের সিপাহী জনতা। জিনাত মহল শেষ চেষ্টা করেছিলেন মোগল শাসন বেঁচে রাখতে, কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন। যার শেষ পরিণতিতে বার্মার মাটিতে মিশে যেতে হলো মোগল সম্রাজ্ঞী জিনাত মহলকে।

রাজনীতির অঙ্গনে মুসলমান মহিলাদের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। চাঁদ সুলতানা ও সুলতানা রিজিয়ার নাম রাজনীতির ইতিহাসের পাতায় অক্ষয় থাকবে।

ফারসী সাহিত্যে মুসলমান নারীদের রয়েছে বিশেষ অবদান। 'আদিবুল মামালিক' ফারহানী বিশ শতকের প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা কবি। শুধু কাব্য জগতে নয়, নারী স্বাধীনতা ও নারী অধিকার সম্পর্কে তিনি বেশ সংখ্যক প্রবন্ধও রচনা করেন। এ জন্য তাঁকে কালের গৌরব আখ্যায় ভূষিত করা হয়।

বিংশ শতাব্দীর আর একজন বিখ্যাত কবি পারভীন ইতেশামী। ইতেশামী ছিলেন নারী প্রগতিতে বিশ্বাসী। 'দিওয়ান' নামে তাঁর একটি কাব্য সংকলন প্রকাশিত হয়েছে, যার মধ্যে ছয় হাজার চরণের কবিতা রয়েছে।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে আধুনিক নারী সমাজ বেশ সচেতন। পশ্চিমা জগতের মরিয়ম জামিলা এ ক্ষেত্রে এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন ধর্মান্তরিত নও মুসলিম। পশ্চিমা জগত ছেড়ে তিনি পাকিস্তানের স্থায়ী নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। ' ইসলামী চিন্তার জগতে এক বিরাট আন্দোলন সৃষ্টি করেছে।

তার প্রসিদ্ধ কয়েকটি বই হলো- ইসলাম এণ্ড মডার্নিজম, পশ্চিমাকরণ এবং মানবকল্যাণ, ইসলাম বনাম পাশ্চাত্য, ইসলাম বনাম আহলে কিতাব : অতীত ও বর্তমান, ইসলাম ও পশ্চিমা সমাজ, ইসলাম ও আজকের মুসলমান নারী সমাজ, ইসলামী সংস্কৃতিঃ তত্ত্ব ও প্রয়োগ, ইসলাম ও আধুনিক মানুষ, পশ্চিমাকরণ বনাম মুসলিম জনগণ ইত্যাদি। যে অসাধারণ প্রজ্ঞা ও বলিষ্ঠ চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তার প্রতিটি বইয়ে তা এককথায় অসাধারণ। তাঁর অবদানের জন্য মুসলিম উম্মাহ কেয়ামত পর্যন্ত স্মরণ করবে।

জ্ঞানচর্চায় মুসলমান নারীদের অবদান-১

জ্ঞান চর্চায় মহিলাদের মধ্যে আয়েশা রা.-এর নাম সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তিনি কুরআন, হাদীস ইসলামী আইন প্রভৃতি বিষয়ে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। যে আট জন সাহাবী সর্বাধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে আয়েশা রা. তৃতীয়। অনেক বিশিষ্ট সাহাবী ও তাবিয়ী তার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।

'আসমাউর রিজাল' নামক গ্রন্থগুলোতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর লক্ষাধিক সাহাবীর মধ্যে এক হাজার সাহাবীর জীবন বৃত্তান্ত লেখা হয়েছে। তাদের মধ্যে ১৫০ জন মহিলা।

তিনি শুধু নারীদের নয় পুরুষদেরও শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, বড় বড় সাহাবী ও তাবিয়ী তাঁর নিকট হতে হাদীস, তাফসীর ও জরুরী মাসায়েল শিখতেন। হাদীসে এসেছে, "আবু মুসা বলেন, আমরা রাসূলের সাহাবীগণ যখনই কোনো সমস্যায় পতিত হয়ে আয়েশা রা. কে জিজ্ঞাসা করেছি তখনই তাঁর নিকট থেকে সেই বিষয়ে ইলম লাভ করেছি।"

মহিলাদের শিক্ষা প্রশিক্ষণ লাভের সঠিক, উপযুক্ত ও উত্তম ক্ষেত্র হচ্ছে তাদের ঘর ও পারিবারিক পরিবেশ। এ কারণে তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব প্রথমত পিতা-মাতা ও স্বামীর ওপর অর্পণ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একখানা নির্দেশের ভাষা এই- "তোমরা তোমাদের পরিবারবর্গের নিকট চলে যাও, তাদের সঙ্গে বসবাস কর, তাদের জ্ঞান শিক্ষা দাও এবং তদনুযায়ী আমল করার জন্য তাদেরকে আদেশ কর।"

নবীজীর এর পূণ্যশীলা স্ত্রীগণ সকলেই শিক্ষিত ছিলেন। মহিলা সাহাবীগণও শিক্ষিত ছিলেন। তাদেরই প্রজ্জ্বলিত শিক্ষার আলো সমস্ত মুসলিম জাহানের মহিলাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

নবীজীর তিরোধানের পর তার অনুসারীগণ, ইসলামের খলিফাগণ বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্রাটগণ মানুষের মাঝে ইসলামের মহাত্মা প্রচারকে সার্থক করে তোলেন। সমাজের উন্নতি ত্বরাণ্বিত করার মানসে নারীরা পুরুষদের সাথে তাদের কর্তব্য পালনে কর্মসূচী গ্রহণ করেন।

পুরুষরা যেভাবে শিক্ষিত ও জ্ঞানী গুণী হয়ে কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক হয়েছিলেন, যেভাবে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা করে চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদিতে নিবেদিত প্রাণ হয়ে গবেষণা করে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা, তারকারাজীর তত্ত্ব ও তথ্যসহ অন্যান্য বিষয় আবিষ্কার করে তাদের মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন, তেমনই পুরুষের সঙ্গে নারীরাও শিক্ষিত হয়ে সাহিত্যি, সংস্কৃতি, ধর্মীয় শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও রাজনীতির ক্ষেত্রে তাদের অনন্য অবদান রেখে গেছেন।

রাজনীতির ক্ষেত্রে আরব জাহানে ইসলামের অনেক প্রতিভাবতী মহিলার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে, যা ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ। তাদের মধ্যে আয়েশা রা. অন্যতম। প্রথম ও দ্বিতীয় খলিফা আবু বকর রা. ও উমর রা. রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে আয়েশা রা.-এর সঙ্গে পরামর্শ করতেন।

কুরআনের তাফসীর বর্ণনা ও নবীজীর হাদীস বর্ণনায়, হাদীসের ব্যাখ্যায় উম্মূল মু'মিনীন আয়েশা রা. সমস্ত মহিলা সাহাবী-এর তুলনায় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। ৩৭৮ খানা হাদীস হযরত সালমা রা. কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া উম্মে আতিয়া, আসমা বিনতে আবু বকর, উম্মে হানী এবং ফাতিমা বিনতে

কায়েস রা. প্রমুখ মহিলা বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। ফিকহ বিদ্যায় আয়েশা রা. কর্তৃক এত অধিক ফাতওয়া রয়েছে, যা একত্রিত করলে বৃহৎ গ্রন্থ হয়ে যেতে পারে।

অনুরূপ উম্মে সালমা কর্তৃক বর্ণিত ফাতওয়াসমূহও একখানা পুস্তিকার আকার পেতে পারে। ফারায়েয বিষয়ে আয়েশা রা. ও অন্যান্য মহিলা সাহাবী হাদীস, ফিকহ, তাফসীর, ফারায়েয, কিরাআত ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। তারা অনেকে কুরআনের হাফেযা ছিলেন।

হিন্দ বিনতে উবায়েদ, উম্মে ইমাম বিনতে হারিসা, রাবিতা বিনতে হায়্যান, উম্মে সা'দ ইবনে রবী রা. প্রমুখ মহিলা সাহাবী কুরআনের বেশিরভাগ আয়াতের হাফিযা ছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্-কুরআনুল কারীম দারস দিতেন। মুসলিম শরীফে শেষাংশে আয়েশা রা. কর্তৃক তাফসীরের কতকাংশ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত উম্মে সালমা রা., হাফসা রা., সাফিয়া রা., উম্মে হাবিবা রা., জুওয়াইরিয়া রা. মায়মুনা রা., ফাতিমা রা., উম্মে শুরাইক রা., উম্মে আতিয়া, আসমা বিনতে আবু বকর, লায়লা বিনতে কায়েস, খাওলা বিনতে তবীব, উম্মে দারদা, আতিকা বিনতে যায়েদ, সাহল বিনতে সুহাইল, ফাতিমা বিনতে কায়েস, যায়নাব বিনতে আবু সলিমা, উম্মে আয়মান, উম্মে ইউসুফ রা. প্রমুখ যথাক্রমে পূণ্যশীলা মুসলিম জননীগণ, খাতুনে জান্নাত এবং মহিলা সাহাবীগণও বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা একত্রিত করলে কয়েকখান সুবৃহৎ গ্রন্থ হতে পারে। মজলিসে বয়ান ও বক্তৃতায় আসমা বিনতে সাকান রা. যশস্বী ছিলেন। স্বপ্নের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে আসমা বিনতে উমায়েস রা. অনন্য ছিলেন। তাদের মধ্যে আয়েশা রা., হাফসা রা., উম্মে কুলসুম বিনতে উক্‌বা রা., করীমা বিনতে আল্-মিকদাদ রা. ভালো লেখাপড়া জানতেন এবং তারা গভীর জ্ঞানের অধিকারিণী ছিলেন।[১]

মুসলমান নারী ও পুরুষগণ উভয়েই সাধারণ শিক্ষার পর অনেকেই কারিগরী বিদ্যার বিভিন্ন শিল্প কাজে ও বাণিজ্যে, সেলাইয়ের কাজে, দ্রব্যশিল্পে, চামড়া রং এর কাজে, পশু পালনে, এমনকি হিসাব কিতাবে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ঐ সময়ে প্রায় সকল আরব মহিলা সাধারণভাবে নিজ নিজ কাজে মহিলারা অভিজ্ঞ ছিলেন। মুসলিম জননী সওদা রা. তায়েফের চামড়া প্রস্তুত করার পদ্ধতি জানতেন।

নবীজী অসুস্থ হলে আরবের প্রায় সমস্ত তীব্ব বিদ্যার বিশেষজ্ঞরা তাঁর চিকিৎসার ব্যাপার যা আলোচনা করতেন, আয়েশা রা. তাই মনে রাখতেন। এই সময়ে ইবনে বালদা লতা-পাতা দ্বারা বর্তমান যুগের কবিরাজ হেকিমদের মত

---

[১]আবুল হাসান আল্-বালাযুরী, ফতহুল বুলদান, পৃ. ৪৭৭-৪৭৮।

রোগের চিকিৎসা জানতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সংশ্রবে থেকে মুসলিম জননী আয়েশা রা. বিভিন্ন রোগের ওষুধ সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করে পরবর্তীকালে তা মুসলিম মহিলাগণকে শিক্ষা দেন। মহিলাগণ যাঁরা ইলমে তীব্ব ও রোগী শুশ্রুষায় পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন, তাদেরকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে মুজাহিদ সৈন্যদের সেবা-শুশ্রুষার কাজেও নিয়োগ করা হতো।

সাহাবী উরওয়া রা. বলেছেন, "আমি উম্মূল মু'মিনীন আয়েশা রা. থেকে অন্য কোনো মহিলাকে ইলমে তীব্ব ও অস্ত্রপচার বিদ্যার অতীব পারদর্শী হতে দেখিনি। মহিলা সাহাবীগণ তাঁদের যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা, উপলব্ধি ও দূরদৃষ্টি বলেই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষদের পাশাপাশি মুসলমান জাতিকে দিক নির্দেশনা দেয়ার দায়িত্ব পালন করেছেন।

এ প্রসঙ্গে ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেছেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যে সকল সাহাবীর ফতোয়া সংরক্ষিত আছে তাঁদের সংখ্যা একশত ত্রিশের কিছু বেশী হবে। এদের মধ্যে নারী ও পুরুষ উভয়েই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

তাঁদের মধ্যে আবার সাতজনের ফতোয়ার সংখ্যা এত বেশী যে, আল্লামা ইবনে হাযমের মতে তাদের ফতোয়াগুলো পৃথকভাবে একত্র করলে প্রত্যেকেরই একটি করে বিরাট গ্রন্থ হয়ে যাবে। এই সাতজনের মধ্যে উমর রা., আলী রা. এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর মত ব্যক্তির সাথে আয়েশা রা.ও অন্তর্ভুক্ত।

ফতোয়া দানকারী সাহাবীদের দ্বিতীয় সারিতে আবূ বকর রা.. ও উসমান রা.এর সাথে উম্মে সালামা রা.এর মত মহিলা সাহাবীও রয়েছেন।

ফতোয়া দানকারী তৃতীয় আরও একদল সাহাবী আছেন। তাঁদের ফতোয়ার সংখ্যা খুব কম। এসব সাহাবীদের মধ্যে হাসান রা, হুসাইন রা., আবূ যার রা., আবূ উবায়দা রা. প্রমুখের মত ব্যক্তিত্ব রয়েছেন।

জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান পাওয়ার জন্য ছোট ও বড় নারী ও পুরুষ এবং কাছের ও দূরের সব রকমের লোকই মহিলা সাহাবীদের শরণাপন্ন হয়েছেন। মুসলিম উম্মাহ এসব মহীয়িসী নারীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতা সকল সমস্যার সমাধান দিয়ে তাদের সামনে সত্যকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে। নিজেদের জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে আয়েশা রা.-এর কাছে কত লোক যে আসা-যাওয়া করতো আয়েশা বিনতে তালহার বর্ণনা থেকে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি বলেছেন-

كان الناس يأتونها من كل مصر.

"প্রত্যেক শহর ও জনপদ থেকেই আয়েশা রা.-এর কাছে লোক আসতো।"[১]

---

[১] বুখারী, আল্-আদাবুল মুফরাদ, বৈরুতঃ দারুল বাশায়ের আল ইসলামিয়্যাহ্, ১৯৮৯, পৃ. ৩৮২।

হাদীস গ্রন্থসমূহ থেকে জানা যায় যে, আয়েশা রা., উমর, আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর এবং আবূ হুরায়রা রা.-এর মত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী সাহাবীদের ইজতিহাদী রায়েরও সমালোচনা করে তাঁদের চিন্তা ও ধ্যান-ধারণাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন।

সাহাবীদের মধ্যে হাদীসের অনেক বড় বড় হাফেয ছিলেন। আয়েশা রা.ও তাঁদের একজন। আবূ হুরায়রা, আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর এবং আনাস রা. ছাড়া আর কোনো সাহাবীর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা এত অধিক নয়।[১]

আবূ মূসা আশ'আরী রা.-এর মত পন্ডিত ও ফিকহবিদ সাহাবীও আয়েশা রা.-এর জ্ঞান ও পান্ডিত্য সম্পর্কে তাঁর নিজের এবং তাঁর মতই আরও অনেকের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেছেন-

"আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীরা কোনো হাদীস নিয়ে সমস্যায় পড়লে সে বিষয়ে আয়েশা রা.-কে জিজ্ঞাসা করতাম এবং তাঁর কাছ থেকে সে ব্যাপারে কোনো না কোনো জ্ঞান অবশ্যই লাভ করতাম।"[২]

আয়েশা সিদ্দীকা রা. ইসলামী জ্ঞানে ছিলেন অদ্বিতীয়া। এমনকি প্রাচীন আরবের অবস্থা এবং প্রাচীন আরবী কাব্য সম্পর্কে তাঁর অসাধারণ বুৎপত্তি ছিল। উরওয়া বলেন, তাঁর মত অধিক কবিতা মুখস্থকারী আমি আরবে আর কাউকে দেখিনি। তিনি সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে দ্বিতীয়া।

জ্ঞানচর্চায় মুসলমান নারীদের অবদান- ২

মদীনার বিখ্যাত ফকীহ্ উরওয়া ইবনে যুবায়ের এবং প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস কাসিম ইবনে মুহাম্মদ রা. সম্পর্কে ইমাম ইবনুল ইমাদ আলহাম্বলী লিখেছেন, "যাঁরা আয়েশা রা. থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর নিকট থেকে হাদীস সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করেছেন এরা দু'জনও তাদের শামিল। তারা আয়েশা রা.-এর মত ও সিদ্ধান্ত কখনো অগ্রাহ্য করতেন না, বরং তাঁর মতামত ও সিদ্ধান্তের মধ্যে থেকে মাসআলা উদ্ভাবন করতেন।"

হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, "হযরত আয়েশা রা. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনে অনেক কিছু স্মৃতিতে সংরক্ষণ করেছিলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুর পর প্রায় পঞ্চাশ বছর জীবিত ছিলেন। মানুষ তাঁর কাছে থেকে অনেক কিছু জানতে ও শুনতে পেরেছেন এবং অনেক হুকুম-আহকাম ও আদবের কথা তাঁর থেকে বর্ণনা

---

[১] ইবনু ইমাদ হাম্বলী, শাজারাতুয্ যাহাব, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।

[২] তিরমিযী, জামিউত তিরমিযী, ২য় খন্ড, আবওয়াবুল মানাকিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭।

করেছেন। এমনকি বলা হয়ে থাকে যে, শরীয়তের এক চতুর্থাংশ আহকাম তাঁর থেকেই বর্ণিত হয়েছে।"[১]

হাফিয ইবনে হাজার রহ. অন্য এক স্থানে আয়েশা রা. থেকে হাদীস বর্ণনাকারী অষ্টাশিজন লোকের নাম উল্লেখ করার পর লিখেছেন যে, এসব ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও বিপুল সংখ্যক লোক তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এদের মধ্যে আছেন আমর ইবনে আস রা., আবূ মূসা আশ'আরী রা. এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের রা.-এর মত রাজনীতিবিদ এবং আবূ হুরায়রা রা., ইবনে আব্বাস রা. ও ইবনে উমর রা.-এর মত মুহাদ্দিস ও ফকীহ। এদের সাথে আরও রয়েছেন সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিবের মত খ্যাতনামা তাবি'য়ী এবং আলকামা ইবনে কায়েসের মত ফকীহ। তাঁদের মধ্যে যেমন স্বাধীন মানুষ এবং ক্রীতদাস ছিলেন, তেমনি ছিলেন নারী ও পুরুষ।[২]

হযরত আয়েশা রা.-এর অসাধারণ জ্ঞান সম্পর্কে ইমাম যুহরী বলেন, "যদি সকল মানুষের জ্ঞান এবং নবীজীর অন্যান্য পত্নীগণের জ্ঞান একত্র করা হয়, তাহলে এককভাবে আয়েশা রা.-এর জ্ঞান হবে তাদের সকলের জ্ঞানের তুলনায় অধিকতর প্রশস্ত ও ব্যাপক।"

ইমাম যুহরী রহ. অন্যত্র বলেছেন, "আয়েশা রা. সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী ছিলেন। নবীজীর বড় বড় সাহাবীগণও বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন।"

প্রখ্যাত আলেম বদরুদ্দীন যারকাশী রহ. একখানা কিতাব রচনা করেছেন, যাতে একটি বিষয়ই সন্নিবেশিত হয়েছে এবং তা হলো, "অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের মোকাবেলায় আয়েশা রা. এর ভিন্ন মতসমূহ।" কিতাবের নাম দিয়েছেন- "আল্-ইজাবাহ্ লিঈরাদি মাস্তদরাকাত্হু আয়িশা 'আলাস্ সাহাবাহ্"। তিনি কিতাবের ভূমিকায় বলেছেন, এ কিতাবটিতে আমি এমন সব কথা সংকলিত করেছি যে ব্যাপারে আয়েশা সিদ্দীকা রা. অন্যদের তুলনায় ব্যতিক্রমী মত ব্যক্ত করেছেন বা বিরোধী মত পোষণ করেছেন অথবা সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট পদ্ধতি তাঁর জানা ছিল কিংবা নিশ্চিত জ্ঞান তিনি লাভ করেছিলেন। অথবা সে বিষয়ে তিনি সমকালীন আলিমগণের মতামত অগ্রাহ্য করেছেন, কিংবা তাঁর মতের দিকে সমসাময়িক আলিমগণের একটা বড় অংশ ফিরে এসেছেন। অথবা ফতোয়া প্রদান করে সে বিষয়টি তিনি মুক্ত করেছেন বা স্বীয় ধারণা অনুযায়ী শক্তিশালী মতের ভিত্তিতে ইজতিহাদ করেছেন।

উমর ইবনে খাত্তাব, আলী ইবনে আবূ তালিব, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এবং এঁদের মত ২৩ জন শীর্ষস্থানীয় সাহাবা রা.-এর সাথে আয়েশা রা. বিভিন্ন

---

[১] ইবনে হাজার আল্-আসকালানী, ফাতহুল বারী, ৭ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২-৮৩।

[২] ইবনে হাজার আল্-আসকালানী, তাহযীবুত্ তাহযীব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৩।

বিষয়ে যে ভিন্নমত পোষণ করেছেন, ইমাম যারকাশী এ কিতাবে সেগুলো উল্লেখ করেছেন। এসব মতামতের সংখ্যা ঊনপঞ্চাশ পর্যন্ত পৌঁছল।

'আল্-ইজাবাহ্' কিতাবের ব্যাখ্যাতে বিশিষ্ট আলিম সাঈদ আল্-আফগানী বলেছেন, "আমি কয়েক বছর যাবত আয়েশা রা.-এর জীবন সংক্রান্ত গবেষণার কাজে নিয়োজিত ছিলাম। আমি তাঁর মধ্যে এমন অলৌকিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়েছি যা বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই। বিশেষ করে তাঁর জ্ঞান ছিল সমুদ্রতুল্য। জ্ঞানের দিগন্তে তিনি ছিলেন সমুদ্রবক্ষে উদ্বেলিত ঢেউয়ের মত। বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত তাঁর মধ্যে যে বিষয়ের জ্ঞানেরই সন্ধান করতে চান না কেনো, চাই তা ফিকহ্, হাদীস, তাফসীর, ইসলামী বিধান, সাহিত্য, কবিতা, ঘটনাপঞ্জী, বংশ তালিকা, গৌরবগাঁথা, চিকিৎসা বা ইতিহাস, যাই হোক না কেনো, আপনি তাঁর মধ্যে সব বিষয়ের সমাবেশ দেখতে পাবেন। এ ব্যাপারটা আপনাকে হতবাক করে দেবে। আপনি আরও অবাক হবেন, যখন দেখবেন এসব বিষয়ে তাঁর পরিপক্কতা ও পরিপূর্ণতা এমন সময়ে হয়েছিল যখন তাঁর বয়স আঠারো বছর অতিক্রম করে নি।"

হযরত সাফিয়্যা রা.-এর জ্ঞান ভান্ডার হতে মুসলিম উম্মাহ্ কি পরিমাণ লাভবান হয়েছে তা মুহায়রা বিনতে হুদায়রের বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায়। তিনি বলেন, হজ্জ আদায় করার পর আমরা কয়েকজন মহিলা মদীনায় গিয়ে সাফিয়্যা রা.-এর খেদমতে হাযির হলাম। সেখানে পৌঁছে আমরা দেখতে পেলাম যে, কূফার কিছু সংখ্যক মহিলা পূর্বেই তাঁর খেদমতে বসে আছে। আমরা তাঁকে দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় এবং হায়েয ও নাবীযের বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। এভাবে কত জায়গায় কত মানুষ যে তাঁর নিকট হতে শত শত মাসআলা জেনে নিয়েছে তার সীমা সংখ্যা নেই।[১]

উম্মূল মুমেনীন উম্মে সালামার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এরূপ বত্রিশজন রাবীর নাম বর্ণনা করার পর হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেনঃ এ ছাড়া আরও অনেক লোক তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এসব বর্ণনাকারীদের মধ্যে বিখ্যাত সাহাবী ও তাবি'ঈ উভয় শ্রেণির লোকই রয়েছেন।[২]

মারওয়ানের একটি জরুরী বিষয় জানা প্রয়োজন হয়েছিল। তিনি বলেন-

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পত্নীগণ আমাদের মাঝে বর্তমান থাকতে আমরা কোনো বিষয় সম্পর্কে অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করতে যাবো কেমন করে? তাই তিনি লোকের মাধ্যমে উম্মে সালামাকে জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন। তিনি তার সে সমস্যার সমাধান করে দেন।[৩]

---

[১] ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, মুসনাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০।

[২] ইবনে হাজার আল্-আসকালানী, তাহযীবুত্ তাহযীব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৬।

[৩] আহমদ ইবনে হাম্বল, মুসনাদ, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ৩২৩; আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ্, ১ম খন্ড, পৃ. ৩৪৫।

সাহাবীগণের ইলমী মতপার্থক্য দূরীকরণে নবীজীর স্ত্রীগণ বিরাট ও ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছেন।

ইমাম ইবনে কাইয়্যিম রহ. বলেনঃ "সাহাবীগণের মধ্যে কোনো বিষয়ে মত পার্থক্য হলো এবং উম্মুল মু'মিনীনদের কেউ সে বিষয়ে নবীজী থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করলে, তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে তা গ্রহণ করতেন এবং নিজেদের সমস্ত মতো পার্থক্য পরিত্যাগ করে তা আঁকড়ে ধরতেন।"[১]

রুবাই' বিনতে মু'আওয়ায রা.একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মহিলা সাহাবী ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে মাসআলা জানার জন্য আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমরও কখনো কখনো তাঁর নিকট উপস্থিত হতেন। এ থেকেই তাঁর জ্ঞানের মর্তবা সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

রুবাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একুশটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে আয়েশা বিনতে মালেক, সুলায়মান ইবনে ইয়াসার, আবূ সালামা ইবনে আব্দুর রহমান, নাফে', উবাদ ইবনুল ওয়ালীদ, খালিদ ইবনে যাকওয়ান, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান, মুহাম্মদ ইবনে আকীল, আবূ উবায়দা ইবনে মুহাম্মদ এবং আম্মার ইবনে ইয়াসির রা. প্রমুখ রয়েছেন।

ফাতিমা বিনতে কায়েস একজন বিশিষ্ট মহিলা সাহাবী ছিলেন। তাঁর নিকট থেকে চৌত্রিশটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাঁর হাদীসের রাবীদের মধ্যে কাসেম ইবনে মুহাম্মদ, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, উরওয়া ইবনে যুবায়ের এবং আবূ সালামা ইবনে আব্দুর রহমান-এর মত সাহাবীগণ রয়েছেন। এছাড়া সুলাইমান ইবন ইয়াসার এবং শা'বীর মত উচ্চ মর্যাদার তাবি'ঈগণও তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে শামিল আছেন।

উম্মে আতিয়া রা. সম্পর্কে আল্লামা ইবনে আব্দুল বার রহ. লিখেছেন, তিনি মৃতকে গোসল দেয়ার নিয়ম-কানূন শিখেছিলেন। এ ছাড়াও তাঁর থেকে আনাস ইবনে মালিক, মুহাম্মদ ইবনে সিরীন এবং হাফসা বিনতে সিরীন বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন।" সা'আদ ইবনে আবূ ওয়াক্কাসের কন্যা আয়েশা এর শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইমাম মালিক, আইয়ূব সাখতিয়ানী এবং হিকাম ইবনে উতায়বার মত ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণও রয়েছেন।[২]

ইমাম শাফে'য়ী রহ. হাসান রা.-এর নাতনী সাইয়িদা নাফিসা রহ.-এর কাছে গিয়ে হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেছেন।[৩]

---

[১] ইবনু কাইয়্যেম আল জাওযিয়্যা, যাদুল মা'আদ, ৪র্থ খন্ড, রিয়াদঃ দারুস্ সালাম, তা. বি., পৃ. ২২১।

[২] ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযীবুত তাহযীব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৬।

[৩] ইবনু খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, ২য় খন্ড, মিশর: আল্-মাতবা'আতুল আমিরিয়্যাহ্, পৃ. ১২৯।

দ্বীন প্রতিষ্ঠায় মুসলমান নারীর অবদান

ইসলামী আন্দোলনের এই বীজ বপন এবং তা পূর্ণাঙ্গ কালেমার প্রতিষ্ঠা করতে যেয়ে সংঘাত সংঘর্ষের মুখোমুখি হয়ে বুকের তাজা রক্ত দিয়ে, ফাঁসির কাষ্ঠে প্রাণ দিয়ে, রাজপথ রঞ্জিত করে কালেমা তাইয়েবার প্রতিটি শব্দের মূল্য দিয়ে প্রমাণিত হচ্ছে এক লা শরীক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব নিছক কোনো মুখের কথা নয়। চিরন্তন পথ পরিক্রমায় জুলুমবাজরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিটি আঘাতে ক্ষত বিক্ষত করেছে শাহাদতের এই আন্দোলনকে। অবশ্য এর উত্তর দিতে একটুও ভুল করেনি এই আন্দোলনের অগ্রসেনানীরা।

শাশ্বত এই আন্দোলনকে প্রতিষ্ঠা করতে নারীর দায়িত্ববোধের জায়গাও কোনো যুগে কোনো অংশেই কম ছিলো না। বস্তুতঃ গোটা সমাজ ব্যবস্থা এখন ভেতর ও বাহির উভয় দিক থেকেই আক্রান্ত। আমরা আমাদের আদর্শকে সংকুচিত করতে করতে ব্যক্তি ও পরিবার পর্যন্ত নিয়ে আসলেও এখন আর তা এই দুইয়ের মাঝেও ধরে রাখা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমতাবস্থায় শুধু পুরুষের একার মাধ্যমে এই দ্বীনকে বিজয়ী করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন সামগ্রিক ঐক্যবদ্ধ শক্তি।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী পরস্পরের বন্ধু ও সাথী। তারা যাবতীয় ভালো কাজের নির্দেশ দেয়, সব অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে নিজেদের বিরত রাখে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে। এরা এমন লোক যাদের উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজয়ী, সুবিজ্ঞ ও জ্ঞানী। এই মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর সম্পর্কে আল্লাহর ওয়াদা এই যে, তাদের এমন বাগ বাগিচা দান করবেন যার নিচ দিয়ে ঝর্ণাধারা বহমান এবং তারা সেখানে চিরদিন থাকবে চির সবুজ-শ্যামল বাগিচায়। তাদের জন্য পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন বসবাসের জায়গা থাকবে। আর সবচেয়ে বড় কথা এই যে, তারা আল্লাহর সন্তোষ লাভ করবে। এটাই সবচেয়ে বড় সাফল্য।"[১]

মুসলমান মহিলারা আল্লাহ তা'য়ালার এই দায়িত্ব উপলব্ধি করে ত্যাগ ও কুরবানীর অনেক নজির স্থাপন করে গেছেন। আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করতে যেয়ে হযরত খাদিজা রা. তার সম্পদের সবটুকুই দিয়ে দিলেন। আল্লাহর রাসূল সা. যে সমাজে প্রথম দাওয়াতের কাজ শুরু করেন সেই সমাজে দাওয়াত গ্রহণ করার অর্থ কি ছিলো তা সবাই জানত। অবর্ণনীয় বিপদ মসিবতের এই সময়ে প্রথম সাক্ষ্যদানকারী হিসেবে সাড়া দেন খাদিজা রা.। সাথে সাথে আল্লাহর রাসূলকে দেন অদৃশ্য সাহায্য লাভের আশ্বাস।

---

[১] সূরা তাওবা:৭১ ও ৭২।

সুমাইয়া রা. এর উপর নির্যাতনের পাহাড় ভেঙ্গে পড়লেও তিনি ছিলেন আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থাশীল। হযরত খানসা রা. যুদ্ধের ময়দানে পুত্রদের ঠেলে দিয়েছিলেন শহীদ হওয়ার জন্য।

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর এর কাহিনী আরো বিস্ময়কর। তিনি পুত্রকে বলেন, "তুমি জয়ী হয়ে ফিরে আসলে আনন্দিত হবো। কিন্তু তুমি আমার কোলে ফিরে না আসলেও আল্লাহর শোকর আদায় করবো।"

এভাবে শুধু নিজের জীবন দিয়ে নয়, প্রাণ প্রিয় কলিজার সন্তানকে গরম তেলের ডেকচিতে ভেজে ঈমানের সত্যতার প্রমাণ দিয়ে বাতিলের সামনে খাড়া মস্তিষ্কে বিবি আসিয়া রা.। হযরত সাফিয়া রা. যুদ্ধের ময়দানে প্রাণাধিক প্রিয় ভাইয়ের লাশ দেখে মরিয়া হওয়ার পরিবর্তে মন্তব্য করেছিলেনঃ "আল্লাহর রাস্তায় এটা কোনো বড় কুরবানী নয়।" এই জয় মুসলিম নারীর ইতিহাস। যারা প্রকৃত ঈমানের স্বাদ পেয়েছেন তারা কখনোই একটা মুহূর্তের জন্য বাতিলের কাছে নিজেকে সপেঁ দিতে পারে না। তারা জানে বাতিলের মসনদকে ভেঙ্গে ফেলার জন্য দৃঢ় ঈমানী শক্তি নিয়ে ত্যাগ ও কুরবানীর নজরানা দিয়ে এগিয়ে গিয়ে প্রভুর সন্তুষ্টি কিভাবে অর্জন করতে হয়। আর এই সম্প্রদায় যতদিন পর্যন্ত না হযরত আসমা রা. এর পদাঙ্ক অনুসরণ না করবে, ততদিন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. এর মত বীর সেনানী কিভাবে জন্ম নেবে? ইসলামের জন্য শূলে আরোহণ রত ছেলেকে দেখেও যে মা বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না, বরং ছেলেকে অবিচল থাকতে বলেন।

ইসলামের সোনালী যুগের যুদ্ধ বিগ্রহে পুরুষেরা যেখানে তীর বর্শা নিক্ষেপ করে, তরবারি চালিয়ে যুদ্ধ করছে, হতাহত হয়েছে, সেখানে নারীরা আহতদের পানি খাইয়েছে, ব্যান্ডেজ করেছে, এমনকি নিজের অর্থসম্পদ ও গহনাপাতি পর্যন্ত দিয়ে দ্বীনের সাহায্য করেছেন। যতই প্রিয় জিনিস হোক না কেনো, এই পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালে তারা সেই বাধাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতো। প্রিয়তম স্বামীও বেদ্বীন হলে সে আমলের মুসলমান নারীদের চোখ বিকৃত হতো। যদি স্বামী ইসলামের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করতো, তৎক্ষণাৎ সে স্বামীর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতো।

আল্লাহর ভালোবাসা তাদের কাছে এতটাই প্রবল ছিল যে, তা পাহাড়সম শক্তি দিয়েও তাদের এই নরম হৃদয়ে এতটুকু আঁচও ফেলতে পারেনি।

যুদ্ধের ময়দানেও মহিলা মহাবীরদের ভূমিকা ছিল অনেক অবর্ণনীয়। উম্মে আম্মার রা.-এর শরীরে ওহুদ যুদ্ধের সময় কমপক্ষে বারোটি আঘাতের চিহ্ন ছিল। আল্লাহর মনোনীত জীবন বিধান দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য হাসিমুখে সহ্য করেছিলেন শত্রুর তীর ও বর্শার আঘাত। ওহুদের ময়দানে মুসলমান সৈন্যরা ওলট পালট হয়ে গেলেও তিনি ছিলেন দৃঢ়পদ। আল্লাহর রাসূল সা.

তাকে দেখে বলেছিলেন, "হে বাইয়াত গ্রহণকারী! আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন।" এভাবে অসংখ্য মহিলা সাহাবীর অসীম আত্মত্যাগ ও দৃঢ়তা দিয়ে এই দ্বীন প্রতিষ্ঠিত রূপ পরিগ্রহ করেছে।

মূলত ব্যক্তি ও সমাজ গঠনের দায়িত্ব রাষ্ট্রের হলেও নানা ক্ষেত্রে রাষ্ট্র যখন নিজেই নিজের স্বার্থ চর্চায় মৌলিক দায়িত্ব থেকে হাত গুটায় তখন ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার মত একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে সমাজের অর্ধাঙ্গী হিসেবে গুরুত্ব সহকারে ভূমিকা রাখা কি অনস্বীকার্য নয়? যদি এমনও হয় যে দ্বীন প্রতিষ্ঠার দিকটা তুলনামূলক অনেক বেশি মনে হয়। তাহলে যে অধিকার আদায়ের জন্য এত ক্যানভাসে ভেসে যাচ্ছে এই নারী জাতি, সেই অধিকার কি অনৈসলামীক সমাজ প্রতিষ্ঠিত থাকলে লাভ করা সম্ভব? সেখানে তাকে সমস্ত ভোগ্য পণ্যের মাধ্যম করা হয়। অনেকেই মনে করেন এত মহামারী যেখানে চলছে সেখানে আসলে কি করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতে পারে? হ্যাঁ এটা ঠিক যে সমাজে জীবনের প্রতিটি ছিদ্র পথই অনৈসলামিক ব্যবস্থায় পরিপূর্ণ, কিন্তু ভাববার বিষয় হচ্ছে কোনো আক্রান্ত অংশে যদি ঔষুধ সরবরাহ না করা হয়, তাহলে এটা খুব দ্রুত সংক্রামিত হওয়া কি স্বাভাবিক নয়? আবার বাস্তবতাকেও উপেক্ষা করছি না যে, সমাজের এই অংশের চিকিৎসায় নেমে স্বাভাবিক পন্থায় সংস্কার হয়ে যাবে। বরং প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এর বাস্তব নমুনা আমাদের কাছে আছে। রাসূল সা. এর সময় শুধু অশ্লীলতা নয় বরং পশুবৃত্তিক পৈশাচিক অধঃপতিত সেই সমাজ থেকেও সর্বোচ্চ আল্লাহভীতি মানুষ তৈরী হলো। তৈরি হলো পৃথিবীর উন্নত শ্রেষ্ঠ পরিচয়সম্পন্ন মানুষ যাদের সততা, পবিত্রতা, বিশ্বস্ততার সমস্ত পৃথিবী তাদের কাছে মাথা নত করলো।

এখানে যদি কার্যকারণ কর্মতৎপরতার দিকে তাকাই তাহলে যে বিষয়টি একবাক্যে বলতে হয়, সেটি হলো উন্নত দক্ষ ও যোগ্য এক দল সংস্কারবাদীদের অকুতোভয়ী সম্মিলিত প্রয়াস। এ রকম নারী-পুরুষ সংস্কারক না থাকলে সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তন করা কখনোই সম্ভব হতো না। তৈরি হতো না হযরত আসিয়া, সুমাইয়া আর বর্তমান যয়নাব ইমাম গাজ্জালীর মত বিপ্লবী নারী।

ইসলামী দর্শনে নারী শিক্ষার গুরুত্ব

সুস্থ পারিবারিক, সামাজিক ও নাগরিক জীবন গঠনের জন্য প্রত্যেক মানুষের মধ্যে নৈতিকতাবোধ জাগ্রত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। উপযুক্ত শিক্ষালাভই এ লক্ষ্য অর্জনে প্রথম পদক্ষেপ। তাই ইসলাম ধর্মে শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

আল্লাহ আদি মানব হযরত আদম সা. কে সৃষ্টি করে ধূলির ধরায় তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে পাঠানোর পূর্বে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন। কুরআনের সর্ব প্রথম প্রত্যাদেশ পাঠ কর, তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে

রক্তপিণ্ড হতে। পাঠ কর। তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি অতি দানশীল। তিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন; শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।[১] এভাবে বিশ্ব প্রভু মানুষকে সর্বাগ্রে লেখাপড়া শেখার আদেশ দিয়েছেন।

হযরত মুহাম্মাদ সা. ও তাঁর অনুসারীদের জ্ঞানার্জনের জন্য কঠোর সাধনায় ব্রতী হতে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ কর। তিনি তাঁর আরও অনেক বাণীতে জ্ঞান সাধনার জন্য মানুষ জাতিকে অনুপ্রাণিত করে গেছেন। যেমন নবীর ঘোষণা :

❖ যে জ্ঞানান্বেষণ করে সে আল্লাহকে অন্বেষণ করে ❖ যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণে বহির্গত হয় সে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় থাকে

❖ ইসলাম শুধুমাত্র একটি আচার সর্বস্ব ধর্ম নয়। এটি বরং এক সুসংহত ও মহান জীবন বিধান। তাই ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি জাগতিক শিক্ষার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেছে ইসলাম।

নবীর ঘোষণা ছিল, ইহকাল পরকালের শস্যক্ষেত্র। তাই এ শস্য ক্ষেত্রের সদ্ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত জাগতিক জ্ঞান আহরণ অত্যাবশ্যক। আত্মপরিচয় ও অস্তিত্ব রক্ষায় ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব যেমন অপরিসীম তেমনি উন্নত ও মর্যাদা সম্পন্ন নাগরিক জীবন গঠনের জন্য সাধারণ শিক্ষা ক্ষেত্রেও উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা গ্রহণ অপরিহার্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূলের সে মহান বাণী অতিশয় প্রাসঙ্গিক- জ্ঞান অন্বেষণ কর, যদিও তার জন্য সুদূর চীন দেশে যেতে হয়। অর্থাৎ জ্ঞান বিজ্ঞানের উচ্চতর পঠন-পাঠনের জন্য প্রয়োজনে বিদেশ ভ্রমণ করতেও নির্দেশ করে গেছেন বিশ্বনবী সা.।

আর যে শিক্ষায় মানুষের কোনো কল্যাণ সাধিত হয় না, যে শিক্ষায় মানুষ পথভ্রষ্ট হয়, সে শিক্ষা ইসলামের শিক্ষা নয়। তাই মহানবী সাবধান- বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, লেখক কর্মীর তুল্য। শিক্ষিত মানুষের মধ্যে তারা সর্বাপেক্ষা অধম। এভাবে কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন বাণীতে মানব জাতিকে কল্যাণমুখী শিক্ষার মাধ্যমে উন্নত জীবন গড়ে তুলতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ইসলামি জীবন দর্শনে নারী জাতিকে কখনও বৈষম্যমূলক দৃষ্টিতে দেখা হয়নি। বরং সর্বত্র নারী ও পুরুষের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা হয়েছে। কুরআন স্বামী-স্ত্রীকে পরপরের সমতুল্য করে ঘোষণা করে বলেছেন-তোমরা একে অপরের ভূষণ স্বরূপ। অধিকন্তু স্ত্রীর সম্মানে নবীর বাণী- তোমাদের মধ্যে তারাই সর্বোত্তম যারা তাদের নিজ নিজ স্ত্রীর কাছে সর্বোত্তম। আবার মায়ের মর্যাদা প্রদান করে রাসূল সা. ঘোষণা করেছেন, তোমাদের বেহেস্ত তোমাদের নিজ নিজ মায়ের পদতলে। নারী-পুরুষ পারস্পরিক অবস্থান সম্পর্কে কুরআনে অনেক বাণী রয়েছে।

যেমন- ❖ তিনি সৃষ্টি করেছেন যুগল পুরুষ ও নারী খলিত শুক্রবিন্দু থেকে।[২]

---

[১] সূরা আলাক : ১থেকে ৫।

[২] সূরা নজম : ৪৫, ৪৬।

❖ বিশ্বাসী হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকর্ম করবে আমি তাকে নিশ্চয়ই আনন্দপূর্ণ জীবন দান করবো। আর তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করবো।[১]

❖ আমি তোমাদের মধ্যে কোনো কর্মনিষ্ঠ পুরুষের বা নারীর কর্ম বিফল করি না। তোমরা পরপর সমান।[২] ❖ পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য আর নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য।[৩] ❖ বিশ্বাসী নর-নারী একে অপরের বন্ধু।[৪]

❖ আল্লাহ্ বিশ্বাসী নর ও নারীকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।[৫]

কুরআনে বারবার মানুষকে পড়াশোনা করতে, জ্ঞানার্জনে ব্রতী হয়ে আল্লাহর সৃষ্টিকে গভীরভাবে অনুধাবন করতে বলা হয়েছে, কিন্তু কোথাও জ্ঞান শিক্ষার যোগ্যতা এককভাবে পুরুষদের দেয়া হয়নি। আর সে জন্য বিশ্বনবী দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করেছেন, প্রত্যেক মুসলমান নর ও নারীর জন্য জ্ঞানার্জন করা ফরজ (অবশ্য কর্তব্য)। তাঁর অনুসারীরা মূর্খ হোক এমনটা কামনা করেননি আল্লাহর রাসূল। তাই তিনি সাবধান করে বলেছিলেন-মূর্খতা অপেক্ষা বড় দারিদ্র্য আর নেই। জ্ঞানীর নিদ্রা মূর্খের উপাসনা অপেক্ষা উত্তম।

আমাদের দেশে মাত্র ক'বছর আগে ছয় থেকে চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত সকল ছেলে-মেয়েদের জন্য সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। অথচ ১৪০০ বছর আগে আরবের মাটিতে উম্মী নবী নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষা গ্রহণকে ফরজ বলে ঘোষণা করেছেন ও শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীর অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগের বিদূষী নারীরা শিক্ষা ক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। রাসূলুল্লাহ্ সা. কে শিক্ষানুরাগী মহিলারা একবার বললেন, আপনি জ্ঞান শিক্ষা দেয়ার জন্য সব সময় পুরুষদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকেন। তাই আমাদের জন্য একদিন নির্দিষ্ট করলে ভালো হয়। মহানবী তদানুসারে তাদের জন্য শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করেছিলেন, এমনকি তিনি প্রতিনিধি পাঠিয়েও নারীদের শিক্ষা দিতেন। ফল স্বরূপ অনেক মহিলা পন্ডিতের উদয় হয়েছিল যারা ইসলামের মহান শিক্ষা প্রচারে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্যরা হলেন- হযরত আয়েশা, উম্মে সালমা, ফাতিমা বিনতে কায়েস, সাফিয়া, সৈয়েদা নাফিসা, উম্মে আদদারদা, আয়শা বিনতে সাদ, জয়নাব বিনতে সালমা, রাসূলের কন্যা ফাতেমা জোহরা, উম্মে আতিয়া, শিমা, সাকিনা, উম্মে সারিক, উম্মেহ উসুফ প্রমুখ। ইসলামী দর্শন ছাড়া অন্যান্য বিষয়েও পারদর্শী ছিলেন তখনকার অনেক মহিলা। এমনকি চিকিৎসা বিজ্ঞানেও মহিলাদের যথেষ্ট অবদান ছিল। খলিফাদের শাসনকালেও নারীরা

---

[১] সূরা নাহল : ৯৭।

[২] সূরা আলে ইমরান : ১৯৫।

[৩] সূরা নিসা : ৩২।

[৪] সূরা তাওবা : ৭১।

[৫] সূরা তাওবা : ৭২।

শিক্ষা-দীক্ষা, সাহিত্য ও কাব্য চর্চা এমনকি সমাজ সেবায়ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। হিজরী পঞ্চম শতাব্দীতে শয়খা শুহ্দা যিনি ফখরুন্নেসা (নারী কুলের গৌরব) উপাধি পেয়েছিলেন, বাগদাদের কেন্দ্রীয় মসজিদে বিশাল জনসমাবেশে সাহিত্য, অলঙ্কার শাস্ত্র ও কাব্য সম্পর্কে বক্তৃতা করেছিলেন।

অতএব, এটা দিবা লোকের মতো স্পষ্ট যে ইসলামী দর্শন নারী শিক্ষার উৎসাহ দাতা ও পথ প্রদর্শক। ইসলামে নারী শিক্ষার সুযোগ সীমিত-এমন বহুল প্রচারিত ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। মানব জাতির অর্ধাংশ নারী জাতিকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে রেখে কোনো জাতি এগিয়ে যেতে পারে না। কারণ নারী ও পুরুষ এ মানব সমাজেরই চাকা, তাই এক চাকা দুর্বল হলে তার গতি শ্লথ হতে বাধ্য। নিজেদের অজ্ঞানতা হেতু এ উপমহাদেশের মুসলমান সমাজ ইসলামের প্রাথমিক যুগের নারীদের শিক্ষা ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণের উজ্জ্বল ইতিহাস বিস্মৃত হয়ে যায়। তাই এ দেশে নারী শিক্ষা বলতে অর্থ না বুঝে তোতাপাখির মতো কুরআন পাঠই মুসলমান নারীর শিক্ষার মানদণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষভাবে অযোগ্য সমাজ কর্তাদের দূরদর্শিতার অভাবে এ দেশে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে ইসলামী আর্দশের যথোপযুক্ত মূল্যায়ন হয়নি। ফল স্বরূপ অগণিত মুসলিম মহিলা অজ্ঞানতার নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে এক করুণ জীবন-যাপন করছেন এবং সমগ্র সমাজকে পশ্চাৎ দিকে টেনে ধরে রেখেছেন। এরা সমাজের নিকট এমন বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছেন যে এদেরকে সঙ্গে নেয়াও যাচ্ছে না, ফেলে দেয়াও যাচ্ছে না। আধুনিক যুগে মানুষের মেধা ও কর্মক্ষমতাকে সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অতএব নারীদের উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত রাখা নিঃসন্দেহে মানব সম্পদের অপচয়।

নারী- পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তার জন্য যথোপযুক্ত শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক। অথচ আল্লাহর দাসীদের জ্ঞানশিক্ষা থেকে বঞ্চিত রেখে যুগ যুগ ধরে অজ্ঞানতার অন্ধকারে রাখা হয়েছে যা এক ধরনের জাতীয় অপরাধ বললে বোধ হয় ভুল হবে না। উপযুক্ত মানুষ হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ নারীর ন্যায্য অধিকার, যা ইসলামী পরিভাষায় হক্কুল এবাদত- এর পর্যায়ে বিবেচনা করা সমীচীন বলে মনে হয়। সুস্থ মাতৃত্ব, সন্তান পালন, সন্তানের শিক্ষা, পরিবার পরিচালনার জন্য নারীকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতেও শিক্ষার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। মুসলমান সমাজেও মহিলা শিক্ষক, অধ্যাপক, চিকিৎসক, আইনজীবী, শিক্ষাবিদ, বাস্তুকার, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, প্রযুক্তিবিদ ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা কি অস্বীকার করা যায়? সুতরাং যতদূর সম্ভব ইসলামী জীবন বিধান প্রদত্ত সীমারেখা ও অনুশাসন মেনে নারীর জন্য উপযুক্ত শিক্ষা তথা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত। ধর্মীয় শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য কুরআন তফসীর, হাদীস, ফিক্বাহ ইত্যাদি শাখায় তাদের জন্য পঠন-পাঠনের বিশেষ ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন।

অনেকে ভাবেন, পর্দাপ্রথা নারী শিক্ষা, নারী প্রগতির অন্তরায়। কিন্তু ইসলামের পর্দা নারীর মান, সম্মান সম্ভ্রম ও ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। কিন্তু যখন থেকে পর্দার নামে অবরোধ প্রথা চালু করে নারীদের গৃহবন্দী করে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত করা হলো তখন থেকে মুসলমান জাতির অগ্রগতি ব্যাহত হলো এবং কালক্রমে তারা পশ্চাদপদ জাতিতে পরিণত হতে লাগলো। গণমানুষের কবি কাজী নজরুলের ভাষায়-আঁধার হেরেমে বন্দিনী হলো সহসা আলোর মেয়ে সেই দিন হতে ইসলাম গেল গ্লানির কালিতে ছেয়ে।

পর্দা প্রথার দোহাই দিয়ে মুসলমান নারী সমাজকে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত করা ইসলামের অনিন্দ্যসুন্দর জীবন বিধানের অবজ্ঞা করা বৈ কিছুই নয়। নারীদের মূর্খ রেখে মুসলমান সম্প্রদায়কে দরিদ্র, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অনগ্রসর তথা অনুন্নত শ্রেণিতে পরিণত করার অধিকার সমাজ কর্তাদের দেয়নি মানবধর্ম ইসলাম। মুসলমান নারী সমাজে কুরআন নির্দেশিত পর্দা প্রথার প্রচলন অত্যাবশ্যক। আধুনিকতার নামে উলঙ্গপনা নয়, কুরআনের শিক্ষার আলোকে শালীনতাপূর্ণ পোশাক পরিধান করে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে যথাযোগ্য অংশগ্রহণ করার মধ্যে রয়েছে মুসলমান নারীর প্রকৃত মুক্তি। দ্রুত পরিবর্তনশীল আধুনিক সমাজে মুসলমান নারীদেরও চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তনের ঢেউ লেগেছে। তাই সামাজিক কুসংস্কারকে ঝেড়ে ফেলে মুসলমান নারীরাও আজ স্কুল, কলেজ এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়েও পর্দাপণ করছে। তবে অনেক ক্ষেত্রে নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ শিক্ষার অভাব হেতু আরেক নতুন সংকট সৃষ্টি হতে চলেছে। কারণ আদর্শহীন ও নৈতিকতা বর্জিত শিক্ষিত পুরুষদের মতো শিক্ষিত নারীও সমাজের কাম্য নয়।

নারী শিক্ষায় ইসলামের নির্দেশনা

কুরআনে বারবার মানুষকে পড়াশোনা করতে, জ্ঞানার্জনে ব্রতী হয়ে আল্লাহর সৃষ্টিকে গভীরভাবে অনুধাবন করতে বলা হয়েছে। কিন্তু কোথাও জ্ঞান শিক্ষার যোগ্যতা এককভাবে পুরুষদের দেয়া হয়নি। আর সে জন্য মহানবী সা. ঘোষণা করেছেন ‘প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য জ্ঞানার্জন করা ফরজ। অবশ্য কর্তব্য। তাঁর অনুসারীরা মূর্খ হোক এমন কামনা করেননি আল্লাহর রাসুল। তাই তিনি সাবধান করে বলেছিলেন, ‘মূর্খতা অপেক্ষা বড় দরিদ্রতা আর নেই।’ ‘জ্ঞানীর নিদ্রা মূর্খের উপাসনা অপেক্ষা উত্তম।’ সম্প্রতি আমাদের দেশে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগের নারীরা শিক্ষাক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। হযরত মুহাম্মদ সা. কে শিক্ষানুরাগী মহিলারা একবার বললেন, ‘আপনি জ্ঞানশিক্ষা দেয়ার জন্য সবসময় পুরুষদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকেন। তাই আমাদের জন্য একদিন নির্দিষ্ট করুন।’ মহানবী তদনুসারে তাদের শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। এমনকি তিনি প্রতিনিধি পাঠিয়েও নারীদের শিক্ষা

দিতেন। ফলস্বরূপ অনেক মহিলা পণ্ডিতের উদয় হয়েছিল, যারা ইসলামের মহান শিক্ষা প্রচারে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্যরা হলেন– হযরত আয়েশা সাফিয়া, উম্মে সালমা, ফাতেমা বিনতে কায়েস, সৈয়িদা নাফিসা, উম্মে আদদারদা, আয়শা বিনতে সাদ, যয়নাব বিনতে সালমা, রসুলের কন্যা ফাতেমা জোহরা, উম্মে আতিয়া, শিমা, সাকিনা, উম্মে হাবিবা, উম্মে সারিক, উম্মে ইউসুফ প্রমুখ। ইসলামি দর্শন ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন তখনকার মহিলারা। এমনকি চিকিৎসা বিজ্ঞানেও মহিলাদের অসামান্য অবদান ছিল। খলিফাদের শাসনকালেও নারীরা শিক্ষাদীক্ষা, সাহিত্য, কাব্যচর্চা ও সমাজ সেবায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, ইসলামী দর্শন নারী শিক্ষার উৎসাহদাতা ও পথপ্রদর্শক। ইসলামে নারী শিক্ষার সুযোগ সীমিত এমন বহুল প্রচারিত ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। মানবজাতির অর্ধাংশ নারী জাতিকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে রেখে কোনো জাতি এগিয়ে যেতে পারে না। কারণ নারী ও পুরুষের সমন্বয়ে গঠিত দ্বিচক্র বিশিষ্ট এ মানব সমাজের এক চাকা দুর্বল হলে তার গতি শ্লথ হতে বাধ্য। নিজেদের অজ্ঞানতা হেতু এ উপমহাদেশের মুসলিম সমাজ ইসলামের প্রাথমিক যুগের নারীদের শিক্ষা ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণের উজ্জ্বল ইতিহাস বিস্মৃত হয়ে যান। তাই এদেশে নারী শিক্ষা বলতে অর্থ না বুঝে তোতা পাখির মতো কুরআন পাঠই মুসলমান নারীর শিক্ষার মানদণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষভাবে অযোগ্য সমাজপতিদের দূরদর্শিতার অভাবে এদেশে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শের যথোপযুক্ত মূল্যায়ন হয়নি। ফলস্বরূপ অগণিত মুসলিম মহিলা অজ্ঞানতার নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে এক করুণ জীবনযাপন করছেন এবং সমগ্র সমাজকে পশ্চাৎদিকে টেনে ধরে রেখেছেন। এরা সমাজের কাছে এমন বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছেন যে, এদের সঙ্গে নেয়া যাচ্ছে না, ফেলে দেয়াও যাচ্ছে না। আধুনিক যুগে মানুষের মেধা ও কর্মক্ষমতাকে সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অতএব নারীদের অশিক্ষিত রাখা নিঃসন্দেহে মানব সম্পদের অপচয়।

নারী পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই তার জন্য যথোপযুক্ত শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক। অথচ আল্লাহর দাসীদের জ্ঞান শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রেখে যুগযুগ ধরে অজ্ঞানতার অন্ধকারে রাখা হয়েছে, যা এক ধরনের জাতীয় অপরাধ বললে ভুল হবে না। উপযুক্ত মানুষ হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা নারীর ন্যায্য অধিকার। সুস্থ মাতৃত্ব, সন্তান পালন, সন্তানের শিক্ষা, পরিবার পরিচালনার জন্য নারীকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতেও শিক্ষার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। মুসলিম সমাজেও মহিলা শিক্ষক, অধ্যাপক, আইনজীবী, শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক, বাস্তুকার, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, প্রযুক্তিবিদ ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা কি অস্বীকার করা যায়? সুতরাং যতদূর সম্ভব ইসলামী জীবনবিধান

প্রদত্ত সীমারেখা ও অনুশাসন মেনে নারীর জন্য উপযুক্ত শিক্ষা তথা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত। ধর্মীয় শিক্ষায় উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষালাভের জন্য কুরআন তাফসির, হাদীস ফেকাহ ইত্যাদি শাখায় তাদের জন্য পঠন-পাঠনের বিশেষ ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। এমনকি সুস্থ মাতৃত্বের জন্য মেয়েদের পৃথক শিক্ষারও প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের দেশে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নারীর উপস্থিতি অতিশয় নগণ্য। মুসলমান নারীর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় শিক্ষার বিশেষ কোনো উদ্যোগ সরকারি পর্যায়ে নেই বললেও চলে। শুধু শৈশব তথা বাল্য অবস্থায় মসজিদ-মক্তবে সামান্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। তাও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অপরিকল্পিত ও অসংগঠিত। কিন্তু পুরুষদের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি, বেসরকারি উভয় পর্যায়ে রয়েছে। তাই ধর্মীয় শিক্ষায় সুশিক্ষিত নারী সমাজ গঠনের জন্য সরকারি পর্যায়ে ইংরেজিসহ মহিলা মাদরাসা স্থাপন আবশ্যক। কারণ দেখা যাচ্ছে অনেক মহিলা বিদেশে কর্মস্থলে গিয়ে বা সাংসারিক কাজ-কর্মে ইংরেজি না জানার জন্য অসুবিধায় পড়ছেন। চাকরি করে টাকাও কম পাচ্ছেন। এমনকি সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত মহিলাদের জন্য ইসলামী শিক্ষার সুযোগ করে দিতে বিশেষ পাঠক্রম চালু করা যেতে পারে।

নারী শিক্ষার প্রধান বাধা হলো উপযুক্ত পরিবেশের অভাব। নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে কোনো ধরনের শিক্ষাকে ইসলাম সমর্থন করে না। কিন্তু পরিবেশের দোহাই দিয়ে জাতির অর্ধাংশকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে রাখা আত্মঘাতী বলা যায়। পরিবেশ তো আপনা থেকে সৃষ্টি হয় না। পরিবেশ গড়তে হয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- 'যদি কোনো সম্প্রদায় নিজের অবস্থার পরিবর্তন না করে তবে আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তাদের যে সম্পদ দান করেন তা পরিবর্তন করবেন।'[১]

অনেকে ভাবেন পর্দা প্রথা ও নারী শিক্ষা নারী প্রগতির প্রধান অন্তরায়। কিন্তু ইসলামের পর্দা নারীর মান, সম্মান, সম্ভ্রম ও ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। নারীদের মূর্খ রেখে মুসলমান সম্প্রদায়কে দরিদ্র, কুসংস্কারাচ্ছন্ন অনগ্রসর তথা অনুন্নত শ্রেণিতে পরিণত করার অধিকার সমাজ কর্তাদের দেয়নি মানবধর্ম ইসলাম। তাই নারী সমাজে কুরআন নির্দেশিত পর্দার প্রচলন অত্যাবশ্যক।

দ্রুত পরিবর্তনশীল আধুনিক সমাজে মুসলমান নারীদের চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তনের ঢেউ লেগেছে। তাই সমাজকর্তাদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে মুসলিম নারীরাও আজ স্কুল, কলেজ তথা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্পণ করছে। পুরুষরাও প্রয়োজন অনুসারে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে। তবে অনেক

---

[১] সূরা আনফাল : ৫৩।

ক্ষেত্রে নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ শিক্ষার অভাবহেতু সমাজে আরেক নতুন সংকট সৃষ্টি হতে চলছে। কারণ আদর্শহীন এবং নৈতিকতা বর্জিত শিক্ষিত পুরুষের মতো শিক্ষিত নারীও সমাজের কাম্য নয়। এক শিক্ষা-বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য– 'কুশিক্ষিত হওয়ার চেয়ে অশিক্ষিত থাকাই ভালো।' তাই সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামি মূল্যবোধ শিক্ষায় মুসলমান নারীদের উদ্বুদ্ধ করা ও এর জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া আজ সময়ের আহ্বান বলা যায়।

ইহকাল ও পরকালের সুপথ রচনা করার জন্য সুশিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানবজাতির জন্য জীবনের সর্বক্ষেত্রে শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়েছে ইসলাম।

হযরত মুহাম্মদের সা.-এর উপদেশ– 'রোগীর সেবার জন্য এক মাইল যাও, দুই ব্যক্তির বিবাদ মীমাংসা করার জন্য দুই মাইল যাও, তোমার এক বিশ্বাসী ভাইয়ের সাক্ষাতের জন্য তিন মাইল যাও এবং জ্ঞানের একটি কথা শেখার জন্য ছয় মাইল যাও।'

নারীর যে পরিমাণ ইলেম শিখা জরুরী

নারীর কর্মপরিধি অনুযায়ী তার ইসলামী জ্ঞানের পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে। হাদীসে এসেছে- হযরত ইবন উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল (রক্ষণাবেক্ষণকারী), আর তোমাদের দায়িত্ব অনুযায়ী জবাবদিহি করতে হবে। ইমাম (রাষ্ট্রের নেতা, কর্মকর্তা ও মসজিদের ইমাম) একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি; তাকে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। পুরুষ তার পরিবারবর্গের অভিভাবক, তাকে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। নারী তার স্বামী-গৃহের কর্ত্রী, তাকে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। খাদেম তার মনিবের ধন-সম্পদের রক্ষক, তাকে তার মনিবের ধন-সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।"

হযরত ইবনে উমর রা. বলেন: আমার মনে হয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন: "পুত্র তার পিতার ধন-সম্পদের রক্ষক এবং এগুলো সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। তোমরা সবাই রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং সবাইকে তাদের অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে"।[১]

এ হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যে নারী যত বড় দায়িত্বশীল তার ইসলামী জ্ঞানের পরিধিও ততবেশী প্রয়োজন। স্বাভাবিকভাবে যে সব নারীরা নিজ গৃহের দায়িত্বশীলা তাকে গৃহ পরিচালনা, সন্তান সন্ততি, স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব

---

[১] বুখারী ও মুসলিম শরীফ।

ও কর্তব্য, অন্যের প্রতি দায়িত্ব ও অধিকার, প্রাত্যহিক জীবনে চলার জন্য যে সব অর্পিত ইবাদত (যেমনঃ পবিত্রতা, নামায, রোযা প্রভৃতি) আছে ইত্যাদি সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান থাকা ফরয।

আর কোনো নারী যদি চাকুরী বা ব্যবসা করে তবে তাকে উপরোক্ত জ্ঞানের পাশাপাশি এ সংক্রান্ত ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা ফরয। আবার কেউ যদি সমাজের দায়িত্বশীল হন, তবে তাকে জনগণের অধিকার ও ইসলামে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জ্ঞান থাকাও ফরয।

নারীদের জন্যে পৃথকভাবে ইলেম শেখার ব্যবস্থা করা

যে সব বাড়িতে নারীদের বসার আলাদা জায়গা রয়েছে সে সব বাড়িতে তাদের জন্য মাঝে মধ্যে আলাদা আলোচনার ব্যবস্থা করা উচিত। এসব বিশেষ সভায় নারীদের একান্ত প্রয়োজনীয় মাস'আলা-মাসায়েল আলোচনা করা প্রয়োজন। ইমাম সাহেবের স্ত্রী বা নিকটাত্মীয় মহিলা যদি ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হন তবে তাদের দ্বারা আলোচনা সভার আয়োজন করা উত্তম।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন, নারীগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, পুরুষেরা আপনার বিষয়ে আমাদেরকে পিছনে ফেলেছে। সুতরাং আপনি আমাদের জন্য আপনার পক্ষ হতে একটি দিন নির্ধারণ করুন। তখন তিনি তাদের জন্য একটি দিন নির্ধারণ করলেন এবং ওই দিন তাদের সাথে সাক্ষাত করলেন। অনন্তর তাদেরকে উপদেশ এবং আদেশ দিলেন।

তিনি তাদেরকে যা বললেন, তন্মধ্যে একটি কথা এই, তোমাদের যে কোন মহিলা, তিনটি সন্তান অগ্রবর্তী করবে, তা তার জন্য জাহান্নাম হতে আড়াল হবে। জনৈকা স্ত্রীলোক প্রশ্ন করল, দুইটি? তিনি বললেন? দুইটিও।[১]

এইরূপ অন্য ঘটনায় আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে-

তিনি বলিলেন 'তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাতের স্থান হলো অমুক স্ত্রীলোকের বাড়ী। অতঃপর তিনি তাদের কাছে গেলেন এবং আলোচনা করলেন।'

এই হাদীস হতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, সাহাবায়ে কেরামের সময় নারী-সমাজের মধ্যে ইলমের কী পরিমাণ চাহিদা ছিল। উম্মাহাতুল মুমিনীনের মাধ্যমে তো তারা ইলম অর্জন করতেনই, এমনকি মসজিদের দরজায় এসে হযরত বিলাল রা.-এর মাধ্যমেও প্রশ্ন পাঠাতেন, এমনকি নবীজী নিজের উদ্যোগেও নারীগণকে একত্র করে উপদেশ ও শিক্ষাদান করেছেন। কিন্তু তাদের ইলমের চাহিদা ও পিপাসা তাতেও নিবারণ হতো না। তারা অধিক ইলম অর্জন করবার জন্য নবীজীর কাছে বলেছেন, যেন তিনি তাদের জন্য আলাদা দিন নির্ধারণ করে

---

[১]বুখারী শরীফ, কিতাবুল ইলম, হাদীস : ১০১।

দেন, যখন শুধু তারা প্রয়োজনীয় ইলম শিক্ষা করবেন। নবীজী সানন্দে তাদের ইলেম শিক্ষার কথা গ্রহণ করেছেন। বস্তুত এতে বর্তমান যুগের নারী-পুরুষ সকলেরই জন্য শিক্ষা ও চিন্তার বিষয় রয়েছে।

সন্তানের মৃত্যু মাতৃহৃদয়ের জন্য কত যে কঠিন শোক ও যন্ত্রণার কারণ তা রহমতের নবী ছাড়া আর কে বুঝবে? তাই তো তিনি এই ভাবে সান্ত্বনা দিতে পারছেন। হযরত আনাস রা.-এর আম্মা উম্মে সুলায়ম এবং আরও কতিপয় আনসারী নারী প্রশ্ন করে ছিলেন, দুইটি সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্য্যধারণ করলে কী হবে? অন্য বর্ণনায় আছে, হযরত উম্মে আয়মান রা. একটি সন্তান সম্পর্কেও প্রশ্ন করেছিলেন, আর নবীজী বলেছেন, একটি সন্তানের মৃত্যুতেও একই প্রতিদান পাওয়া যাবে। আমাদের কত মা সন্তান শোকে অসঙ্গত বিলাপ করে, কিন্তু এই হাদীসটি তাদেরকে জন্যও।।

প্রচলিত সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী শিক্ষাকে গুরুত্ব দেয়া

আমাদের দেশে প্রচলিত সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় ইতিপূর্বে ইসলামী শিক্ষাকে গুরুত্বের সাথে পড়ানো হত। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় বর্তমানে এ বিষয়টিকে অনেকটা অবহেলার ছলে পড়ানো হয়, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য খুবই হুমকি স্বরূপ হয়ে দাড়াবে। স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষাকে গুরুত্বের সাথে পড়ানো হলে আজ আমাদের নারীরা ইসলামী জ্ঞান থেকে এতটা দূরে থাকত না। বর্তমান সংস্কারকৃত শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী শিক্ষাকে যেভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে ভবিষ্যতে মানুষ আল্লাহ-রাসুলকে চিনবে কি না তা বলাই দুস্কর। মনে রাখতে হবে ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া আদর্শ মানুষ নারী-পুরুষ গঠন করা কখনো সম্ভব নয়।

হক্কানি ওলামায়ে কিরামদের ওয়াজ শোনা

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

"আপনি তাদেরকে উপদেশ স্মরণ করে দিন (বোঝাতে থাকেন), কেননা উপদেশ স্মরণ করে দেয়া মু'মিনদের উপকারে আসবে"।[১]

তাই উলামা কিরামদের ওয়াজ মাহফিল শোনা খুবই দরকার। এতে মানুষের মন নরম হয় ও ভালো কাজের প্রতি আগ্রহী হয়। বর্তমানে ঘরে বসে পর্দা রক্ষা করে রেডিও, মোবাইল ও ইন্টারনেট থেকে এ সব আলোচনা শুনা একদম সহজ। গান-বাজনা ও সিনেমা দেখে নিজের আমলনামা ভারী না করে এ সব ইসলামী আলোচনা শুনে নিজেকে পরকালের জন্য তৈরি করাই বুদ্ধিমানের কাজ।
বি:দ্র: ওয়াজ শোনার সময় নারীরা বক্তার চেহারা দেখে ওয়াজ শোনতে পারবে না।

[১] সূরা যারিয়াত : ৫৫।

আমলী আলেমদের ইসলামী বিভিন্ন বই পড়া

শিখতে হলে পড়তে হবে। বইই হলো মানুষের পরম বন্ধু। তাই বাংলায় ইসলামী বই পড়ে নিজেদের জ্ঞান গরিমা বৃদ্ধি করা প্রত্যেক নারী পুরুষের কর্তব্য। তবে বই নির্ধারনের ক্ষেত্রে একজন ভালো হক্কানি আলেমের পরামর্শ নেয়া অতিজরুরী। কেননা অল্প শিক্ষিত মানুষের জন্য সব ধরনের বই পড়া সমুচিন নয়। বিশুদ্ধ আক্বিদা ও সহীহ হাদীস নির্ভর বই পুস্তক পড়া উচিত। যে সব কিতাব ফেতনা ফাসাদ ছড়ায় তা বিশেষজ্ঞ আলেম ছাড়া অন্যরা না পড়াই শ্রেয়। তাছাড়া যে সব কিতাব অধিকাংশ জাল ও দুর্বল হাদীস নির্ভর তা থেকে সাধারণ মানুষের বিরত থাকাই উত্তম। কেনোনা সে হয়ত কোনটা সঠিক আর কোনটা ভুল তা নির্ণয় করতে পারবে না।

দ্বীনদার আলেম পাত্র-পাত্রীর সাথে ছেলে-মেয়ের বিবাহ দেয়া

জামে তিরমিযীতে আবু হাতেম আল মুযানী রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- "যখন তোমাদের নিকট এমন পাত্র আসবে যার দ্বীনদারীতা ও চরিত্রের ব্যাপারে তোমরা সন্তুষ্ট হবে, তবে তাঁর সাথে তোমাদের কন্যাকে বিবাহ দাও। আর যদি তোমরা তা না কর, তবে জমিনে ফেতনা ফাসাদ ছড়িয়ে পড়বে।"

একজন আলেমের নিকট মেয়ের বিবাহ হলে সেও তার ইসলামী জ্ঞান থেকে একটু একটু করে শিখতে পারবে। আলেমের সাহচর্যে থেকে তার পরিবারটি ইসলামী আলোয় জ্বলে উঠবে আর আগত শিশুটি একটি ইসলামী পরিবেশে বেড়ে উঠে আদর্শবান হবে।

মূলকথা- ইসলামই হচ্ছে মানবতার একমাত্র শান্তির মডেল। পূর্ণ ইসলামী বিধি-বিধান চর্চাই হচ্ছে মু'মিনের একমাত্র লক্ষ্য। পার্থিব জীবনের সামান্য ভোগবিলাসের জন্য অনন্ত জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করা থেকে ভুলে থাকা জ্ঞানীর কাজ নয়। নিজে সত্যিকারের মুসলমান হই ও পরিবারকে এ পথে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করি। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কবুল করুন। আমীন!

মুসলমান নারীদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কীর্তি ও অবদান

সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাসে নির্যাতিত নারীর পাশে ইসলামই সর্বপ্রথম দাঁড়িয়েছে। এ বিষয়ে বিতর্কের সুযোগ গৌণ ও সীমিত। সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন একজন নারী খাদিজা রা.। সর্বপ্রথম ইসলামের জন্য শহীদও হয়েছেন একজন নারী সুমাইয়া রা.। এগুলো সৎসিদ্ধ ও বিখ্যাত ঘটনা। কিন্তু ইতিহাস গবেষণা করলে দেখা যায় এর বাইরেও পূর্ণাঙ্গ ইসলামী পদ্ধতিতে জীবনযাপন করে মুসলমান নারীরা পেশাদারিত্বের ক্ষেত্রে অনুপম ও উজ্জ্বল কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাদের তালিকাও বেশ দীর্ঘ।

কয়েকজনের নাম এখানে উপস্থাপন করা হলো-

হযরত আয়েশা রা.; হাদীস বর্ণনা, ইসলামী আইন, ফিকহ, ইতিহাস, বংশলতিকা, কবিতা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। হযরত আসমা বিনতে আবি বকর রা. ও হযরত উম্মে আবিদুল্লাহ বিন জুবায়ের; তারা উভয়েই হাদীস বর্ণনায় দক্ষ ও পারদর্শী ছিলেন।

হযরত আয়েশা বিনতে তালহা; তিনি কবিতা, সাহিত্য, জ্যোতিষশাস্ত্র ও নভোমন্ডল বিষয়ে অত্যন্ত পারঙ্গমতার পরিচয় দিয়ে ছিলেন। সাকিনা বিনতে হুসাইন ও খানসা; তারা কাব্য ও সাহিত্যে প্রবাদ তুল্য ছিলেন।

হযরত মায়মুনা বিনতে সাদ রা.; হাদীসশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী রা.ও তার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত কারিমা মারজিয়া রহ.; হাদিসের বিজ্ঞ পন্ডিত ছিলেন। ইমাম বুখারী রহ. তার কাছ থেকে হাদীস সংগ্রহ করেছেন।

হযরত ফাতিমা বিনতে আব্বাস; প্রখ্যাত ইসলামী আইনবিদ। তিনি মিসর ও দামেশকের প্রভাবশালী নেত্রী ছিলেন। হযরত উখত মজনি রহ.; তিনি ছিলেন ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর শিক্ষক। আল্লামা মারাদিয়ি রহ. তাঁর কাছ থেকে জাকাত বিষয়ক মাসআলা বর্ণনা করেছেন।

হযরত হুজায়মা বিনতে হায়ই রহ. প্রখ্যাত তাবেয়ি ও হাদীসবিদ ছিলেন। ইমাম তিরমিজি ও ইবনে মাজাহ রহ. তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হযরত আয়েশা বিনতে আহমদ বিন কাদিম স্পেনের অধিবাসী ছিলেন। ক্যালিওগ্রাফিতে অনন্যতার পরিচয় দিয়েছেন। লুবনি রহ. ভাষাবিদ হওয়ার পাশাপাশি আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রে প্রাজ্ঞ ছিলেন।

হযরত ফাতিমা বিনতে আলী বিন হুসাইন বিন হামজাহ ছিলেন হাম্বলি মাজহাবের পন্ডিত। সমসাময়িক আলেমরা তার কাছ থেকে হাদীস শিখেছেন এবং প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ দারেমি শরীফের সনদের অনুমতি নিয়েছেন। হযরত রাবিয়া কসিসাহ সুপ্রসিদ্ধ বক্তা ছিলেন। হাসান বসরি রহ.ও তার কাছ থেকে বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়েছেন।[১]

শায়েখ আলাউদ্দিন সমরকন্দি রহ. 'তুহফাতুল ফুকাহা' নামে একটি কিতাব লিখেছেন। এটির ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন তারই ছাত্র আবু বকর ইবনে মাসউদ কাস্তানি রহ.। ব্যাখ্যাগ্রন্থটির নাম 'বাদায়েউস সানায়ি'। ইসলামী ফিকহশাস্ত্রে এটি নজিরবিহীন কিতাব। এটা দেখে শিক্ষক তার ছাত্রের কাছে নিজ মেয়েকে বিয়ে দেন। মেয়েটির নাম ফাতিমা। সমকালীন রাজা-বাদশাহরা

---

[১] তাবকাতে ইবনে সাদ : ৮/৪৫-৪৮; আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া : ৫/৭৮।

মেয়েটিকে বিবাহ করতে আগ্রহী ছিলেন। সে মেয়ে ছিলেন মুফতী। তার স্বাক্ষরিত অসংখ্য ফতোয়া প্রকাশিত হয়েছে।[১]

ইবনে কায়েসের বর্ণনায় দেখা যায়, প্রায় বাইশ জন নারী সাহাবী ফতোয়া ও ইসলামী আইনশাস্ত্রে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাদের মধ্যে সাতজন নবী পত্নী ছিলেন। এগারো শতাব্দীতে মামলুক শাসনামলে তৎকালীন মুসলিম নারীরা দামেশকে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় ও বারোটি জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সম্পূর্ণরূপে মুসলমান নারীদের দ্বারা পরিচালিত হতো।

যুদ্ধ-সংগ্রামে নারী সাহাবীগণের আমল

হযরত আয়েশা রা. ও হযরত উম্মে সালমা রা. ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। নবী সা.-এর ফুফু হযরত সুফিয়া বিনতে আবদিল মুত্তালিব রা. খায়বর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হযরত উম্মুল খায়ের, হযরত জুরকা বিনতে আদি, হযরত ইকরামা বিনতে আতরাশ ও হযরত উম্মে সিনান অসংখ্য যুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক কাজে সহযোগিতা করেন।

হযরত আজরা বিনতে হারিস বিন কালদা সেনাদলের নেতৃত্ব প্রদান ও আহলে বিসানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। হযরত উম্মে আম্মারা রা. ওহুদের যুদ্ধে মহানবী সা.-এর জীবন রক্ষায় প্রতিরক্ষা বলয় তৈরি করে ছিলেন। নবী সা. তাকে 'খাতুনে ওহুদ' উপাধি দিয়ে ছিলেন।

ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম সামুদ্রিক অভিযানে প্রথম শাহাদাত বরণ করেন হযরত উম্মে হারাম বিনতে মিলহান রা.। হযরত উম্মে আতিয়া আনসারী রা. নবী সা.-এর সঙ্গে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হযরত উমাইয়া বিনতে কায়েস কিফারিয়া খায়বর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। হযরত উম্মে হাকিম বিনতে হারিস রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। হযরত উম্মে আয়মন হাবশি রা. ওহুদ, হুনাইন, খায়বর ও মোতার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। হযরত উম্মে সুলাইম রা. খায়বর ও হুনাইনের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। হযরত উম্মে হারাম বিনতে মিলহান ইসলামের প্রথম নারী নৌযোদ্ধা। হযরত রাবি বিনতে মুয়াওয়াজ রা. বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। হযরত নাসিবাহ বিনতে কাব আনসারিয়া ওহুদ, বনি কুরাইজা, হুদায়বিয়া, খায়বর, হুনাইন ও ইয়ামার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।[২]

---

[১] ফতোয়ায়ে শামী : ১/১০০।

[২] তাবকাতে ইবনে সাদ : ৮/৪১৫; দালায়িলুন নবুয়্যাহ : ২/৭১২।

ইসলামের দৃষ্টিতে নারীদের উপার্জন

নানাবিধ কারণে বর্তমানে নারীর উপার্জন বিষয়ে প্রচুর আলোচনা-সমালোচনা ও তর্ক-বিতর্ক চলছে। অতি রক্ষণশীলরা নারীদের উপাজর্নের বিষয়টি এখনও মেনে নিতে পারেননি। অবশ্য মধ্যপন্থীদের অভিমত হলো, নারী তার স্বকীয়তা, আলাদা বৈশিষ্ট্য ও মান-সম্মান বজায় রেখে আয় উপার্জনের পথ বেছে নিতে পারবেন। উদাহরণস্বরূপ তারা নবী সা.-এর আমলের বেশ কয়েকজন মহিলা সাহাবীর কথা উল্লেখ করেন।

ওই সাহাবীরা মদীনার বাজারে বিভিন্ন ব্যবসা করত এমনকি অনেকে কৃষি কাজও করেছেন। সেসব অবশ্য ভিন্ন প্রসঙ্গ।

একটি উন্নয়নশীল দেশ বাংলাদেশ। বাংলাদেশের গার্মেন্টস কারখানাসহ অন্যান্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও কাজ করেন। এই কর্মজীবি নারীদের উপার্জন সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে যা অনস্বীকার্য।

ইসলাম সর্বদা নারীদের শালীন পরিবেশে শিক্ষা, কাজ ও চলাফেরার কথা বলে। শরিয়ত নির্ধারিত গন্ডির মধ্যে থেকে নারীরা অবশ্যই শিক্ষা অর্জনসহ অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ করতে পারবে। ইসলাম কোথাও নারীকে বন্দি করে রাখার কথা বলেনি। ইসলাম নারী শিক্ষার প্রতি যেমন গুরুত্বারোপ করেছে তেমনি নারী-পুরুষের ভোটাধিকারেও কোনো ধরনের পার্থক্য সৃষ্টি করেনি। এমনকি ইসলাম নারীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে কাজ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকারও প্রদান করেছে।

সূরা বাকারার ১৮৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'আমি ব্যবসাকে হালাল করেছি এবং সুদকে হারাম করেছি।' এই আয়াতে ব্যবসা হালাল হওয়া এবং সুদ হারাম হওয়া নারী-পুরুষের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। একজন পুরুষ হালাল পন্থায় যেসব ব্যবসা করতে পারবে। নারীও সে ধরনের ব্যবসা করতে পারবে। সে বিবাহিত হোক কিংবা অবিবাহিত হোক। সে তার অর্জিত সম্পদের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণকারী। সে কোনো বিধিনিষেধ ছাড়াই তার সম্পত্তির ব্যাপারে সব ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে, যা একজন পুরুষের জন্যও প্রযোজ্য।

কুরআন ও হাদীসের কোনো স্থানে নারীর কাজকর্মের ব্যাপারে কোনো বিধিনিষেধ আরোপিত হয়নি। শুধু দু'টি বিষয়ের প্রতি সঙ্গত কারণে নির্দেশ দিয়েছে। শর্ত দু'টি হলো প্রথমত, ব্যবসা হতে হবে হালাল পদ্ধতিতে ও শরীয়ত নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে।

দ্বিতীয়ত, পর্দা রক্ষা করতে হবে। তাছাড়া ইসলাম নারীদের সৌন্দর্য প্রদর্শনকারী কোনো পেশায় নিয়োজিত হতেও নিষেধ করেছে।

এ ছাড়া শরিয়ত অনুমোদিত সব ব্যবসা বা কাজ করার অনুমতি দিয়েছে ইসলাম। এখানে ভুল বোঝাবুঝির কোনো অবকাশ নেই । এখানে একটি কথা বলে রাখা ভালো, ইসলাম কিন্তু নারীদের কোনো আয়-রোজগারের দায়িত্ব দেয়নি। দেয়নি পরিবার লালন-পালন ও ভরণ-পোষণের কর্তব্য। ইসলামের পারিবারিক ব্যবস্থায় গোটা পরিবারের অর্থনৈতিক প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণের দায়িত্ব একমাত্র পুরুষের। ইসলামের পারিবারিক ব্যবস্থায় নারীর আয়ের অনেক উৎস ও মাধ্যম থাকলেও ব্যয়ের বাধ্যতামূলক কোনো খাত নেই। ইসলাম নারীর ওপর অর্থনৈতিক কোনো দায়-দায়িত্ব চাপায়নি। পরিবারের যাবতীয় আর্থিক দায়-দায়িত্ব বহন করা পুরুষের ওপর অর্পিত হয়েছে। সেহেতু নারীকে তার জীবিকার জন্য চাকরি করার প্রয়োজন নেই, তাই নারীর চাকরি তার ইচ্ছাধীন। তবে পুরুষের উপার্জনে যদি সংসার চালানোর জন্য যথেষ্ট না হয় এবং প্রকৃত অভাবের সময়, সঙ্কটকালে উভয়েরই চাকরি করার প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে চাকরির বিষয়ে নারীর স্বাধীনতা রয়েছে। ইচ্ছা করলে সে চাকরি করতে পারে, ইচ্ছা করলে নাও করতে পারে। এটাই ইসলামের বিধান।

যোগ্য নারীর শিক্ষা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়েও হয়

স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দ্বীন কোথায় শিখবে, কীভাবে শিখবে- এটি এখন আমাদের মুসলিম সমাজের এক জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসাই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থার অবক্ষয় প্রমাণ করছে। একটি মুসলিম সমাজের এই অবস্থাটা কি স্বাভাবিক যে, এর অধিকাংশ শিক্ষার্থীর জন্যেই ইসলাম শিক্ষার মানসম্মত কোনো ব্যবস্থা নেই? এই আরোপিত ও অস্বাভাবিক অবস্থা থেকে বের হয়ে আসার উপায় কী? আর যে পর্যন্ত এ অবস্থা থেকে মুক্তি না ঘটছে ঐ পর্যন্ত কি দ্বীন শেখার কোনো উপায়ই তাদের হবে না? এ বিষয়গুলো ভাবা দরকার।

উন্নতি ও উত্তরণের জন্য সবার আগে প্রয়োজন দুর্দশার উপলব্ধি। ইসলামী শিক্ষার অভাবে আমাদের সমাজ আজ আস্তে আস্তে কোথায় নেমে এসেছে তা চিন্তা করলেও শিহরিত হতে হয়। শিক্ষা-সংস্কৃতি, অর্থ-বাণিজ্য, নৈতিকতা-রাজনীতির কোন ক্ষেত্রটি এমন আছে, যা ভেতরে বাইরে চূড়ান্ত অবক্ষয়ের শিকার হয়নি? এই অবক্ষয়-অস্বাভাবিকতা থেকে উত্তরণের জন্য নারীদের ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের কোনোই বিকল্প নেই- এই উপলব্ধি অতি প্রয়োজন। কিন্তু এই উপলব্ধির পথেও আছে বাধা-বিপত্তি। ব্যাপক প্রচার-প্রপাগান্ডা ও চিন্তাগত বিভ্রান্তির কারণে এই সঠিক উপলব্ধিও অনেকের মনে জাগছে না, জাগলেও তা এড়িয়ে যাওয়ারই তাড়না বোধ করছে।

কারো চিন্তা- 'সবাই কি মাওলানা সাহেব হয়ে যাবে? সমাজে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারেরও তো প্রয়োজন আছে!' কিন্তু কে না জানে যে, এখানে সবাইকে মাওলানা সাহেব হওয়ার কথা বলা হচ্ছে না, বলা হচ্ছে মুসলমান হওয়ার কথা, ভালো মানুষ হওয়ার কথা। ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার যারা হবেন তাদেরও কি সত্যিকারের মুসলমান হতে হবে না, ভালো মানুষ হতে হবে না? সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির ইসলামী শাস্ত্র-বিশারদ হওয়া ফরয নয়, ফরয হচ্ছে যথাযথ মুসলমান হওয়া এবং মুসলিম হিসেবে জীবনযাপনের জন্য যতটুকু জ্ঞান দরকার ততটুকু অর্জন করা। কেউ হয়তো বলবেন, ধর্ম শিক্ষার একটা ব্যাপার তো আমাদের জাতীয় শিক্ষাক্রমেও আছে। ধর্ম ও নৈতিকতার মৌলিক জ্ঞান অর্জনের জন্য কি তা যথেষ্ট নয়? এই প্রশ্নের উত্তর আমি নিজে না দিয়ে ঐ অঙ্গনের একজনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরা সমীচীন মনে করছি।

১১ জানুয়ারি ২০১৯ শুক্রবার দৈনিক কালের কণ্ঠের 'ইসলামী জীবন' পাতায় কাপাসিয়া ডিগ্রি কলেজের ইসলামিক স্টাডিজের বিভাগীয় প্রধান জনাব মো. আলী এরশাদ হোসেন আজাদ এ বিষয়ে কিছু কথা বলেছেন। 'স্কুল-কলেজে ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব কমছে' শীর্ষক নিবন্ধে এক জায়গায় তিনি লেখেন- "অজ্ঞাত কারণে স্কুল-কলেজ পর্যায়ে 'ইসলাম শিক্ষা' অযত্ন-অবহেলার শিকার। স্কুলে 'ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা' বইটি 'ইসলাম ধর্ম শিক্ষা' নামে প্রচলন করা গেলে হয়তো শিশু-কিশোর মননে 'ধর্মচিন্তা' স্পষ্টতর হবে। স্কুলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই লাস্ট পিরিয়ডে থাকে 'ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা' ক্লাস। শুধু এ কারণেই অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় 'এ প্লাস' পায় না। এর ফলে অনেকে 'গোল্ডেন' থেকে বঞ্চিত হয়। এমন অবহেলায় নতুন প্রজন্মের কাছে অপরিচিত থেকে যায় ধর্মীয় চেতনাবোধ।" "কলেজ পর্যায়েও ইসলাম শিক্ষার অবস্থা ভালো নেই। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বিষয় বিন্যাস আরো হতাশা জনক। নীতিমালা অনুযায়ী 'ইসলাম শিক্ষা' স্রেফ ঐচ্ছিক। এতে আশঙ্কাজনক হারে সব কলেজেই ইসলাম শিক্ষায় শিক্ষার্থী সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে! বোর্ডগুলোতে ২০১৩/২০১৪ এবং ২০১৫/২০১৬-এর পরীক্ষার্থী সংখ্যা দেখলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। ২০১২-২০১৩ শিক্ষাবর্ষেও বিষয়টি তৃতীয় বা চতুর্থ হিসেবে নেয়ার সুযোগ ছিল ('ক', 'খ' গুচ্ছ বিন্যাস অনুসারে)। আমি অধ্যাপনার ২৬ বছরের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, আগে সব গ্রুপের সবাই বিষয়টি নিতো। বিশেষত, ১৯৯৮ বা আরো আগে বিষয়টি আবশ্যিকের গুরুত্ব রাখত। ডিগ্রি পর্যায়েও নানা নিয়মের প্রতিবন্ধকতা ও সুযোগ সংকুচিত হওয়ার ফলে ইচ্ছা থাকলেও অনেকেই 'ইসলামিক স্টাডিজ' নিতে পারে না।"

এ কথাগুলোর সাথে স্কুল-কলেজের পরিবেশ-পরিস্থিতি ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে আরো অনেক কথাই বলা যায়। সচেতন ব্যক্তিদের তা অজানাও নয়। এ

অবস্থায় কি দাবি করা যায়, আমাদের জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় সত্যিই ইসলামী শিক্ষার ব্যবস্থা আছে? প্রশ্নটি আরেকটু স্পষ্ট করে করা হলে উত্তর দিতে হয়তো কারোই অসুবিধা হবে না। আমাদের জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় কি মুসলিম শিক্ষার্থীদের মুসলিম হওয়ার ও মুসলিম থাকার ব্যবস্থা আছে?

এই প্রশ্নের উত্তরেও যদি অস্পষ্টতা বোধ হয় তাহলে সেটাও কি আসলে ইসলামী শিক্ষার বিস্তৃতি সম্পর্কে অজ্ঞতাজনিতই হবে না?

যাই হোক, সমস্যা মোটামুটি পরিষ্কার। এখন উত্তরণের চেষ্টা কীভাবে হতে পারে সেই চিন্তা প্রয়োজন। আর এক্ষেত্রে ব্যক্তি থেকে সমাজ প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু করণীয় আছে।

আমাদের প্রত্যেককেই মুসলিম হিসেবে জীবন যাপনের জন্য যতটুকু শেখা দরকার তা শিখতে হবে এবং নিজেকে ইসলামের বিধান মোতাবেক চালানোর চেষ্টা করে যেতে হবে। তা আমরা যে পেশার বা যে বয়সেরই হই না কেন।

এরপর নিজেরসন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনের দ্বীনী শিক্ষার উপায় অনুসন্ধান করতে হবে। সন্তানের পার্থিব শিক্ষার জন্য আমাদের অনেকেই কত উদ্বিগ্ন ও তৎপর। সেই তুলনায় তার দ্বীন ও ঈমান শিক্ষার বিষয়ে আমাদের উদ্যোগ আয়োজন কতটুকু? সামাজিকভাবেও আমাদের এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের মসজিদগুলোতে শিশু ও বয়স্কদের দ্বীনী শিক্ষার যে আয়োজন আছে তা মানসম্পন্ন ও জোরদার করার চেষ্টা করতে হবে। যেখানে নেই সেখানে এ ব্যবস্থা চালু করতে হবে। এর বাইরেও গ্রামে গ্রামে সর্বস্তরের মানুষের প্রয়োজনীয় দ্বীন শিক্ষার ছোট ছোট কেন্দ্র গড়ে তোলা এখন সময়ের দাবি। এর পাঠক্রম ও প্রয়োজনীয় বই-পুস্তক রচনায় আমাদের যোগ্য ও উদ্যমী আলেমদের এগিয়ে আসার পাশাপাশি এই সকল কেন্দ্রে শিক্ষকতা ও প্রশিক্ষণের জন্যেও প্রস্তুত হতে হবে একদল ত্যাগী, নিবেদিত আলেমকে।

বিভিন্ন পাড়া-মহল্লায় অনেক ছোট ছোট মাদরাসা বা দ্বীনী প্রতিষ্ঠান আছে, সেগুলো মূলত আলেম হওয়ার লক্ষ্যে যে শিশুরা মাদরাসায় আসে তাদের জন্য। এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে যদি স্কুলগামী শিশুদের জন্য একটি এবং নানা পেশার বয়স্ক মানুষের জন্য একটি-অন্তত এই দুইটি বিভাগ খোলা হয় এবং প্রতিষ্ঠানের মৌলিক বিভাগের মতো গুরুত্ব দিয়ে যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও প্রশিক্ষকের মাধ্যমে পরিচালিত করা হয় তাহলেও কিছু সুফল আশা করা যায়।

তবে একথা বলাই বাহুল্য যে, শুধু এই ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাই যথেষ্ট নয়, জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা ও সমাজ-ব্যবস্থা থেকেও অধর্মের অপচ্ছায়া অপসারিত করার জন্য বিস্তৃত দাওয়াতী কার্যক্রমও প্রয়োজন। সকলে হাতে হাত ধরে আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে এগিয়ে যাই।

وَ لَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ.

"তোমাদের মৃত্যু যেন এমন অবস্থায়ই আসে যে, তোমরা মুসলমান।"

যবানের হেফাযত দ্বারা বেহেশত পাওয়া যায়

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

مَنْ يَضْمَنْ لِيْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ

"যে তার যবান ও লজ্জাস্থান হেফাযতের দায়িত্ব দিতে পারবে, আমি তার জান্নাতের যামিন হবো।"[১]

বাকশক্তি আল্লাহ তাআলার বড় নেয়ামত ও মহা দান। বান্দার বহুবিধ কল্যাণ এতে নিহিত। বহুমুখী প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে তিনি এ নেয়ামত বান্দাকে দান করেছেন। অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে এসব প্রয়োজন পূরণ করা সম্ভব নয়। যবানের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হলে অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এর প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। কোনো কিছুই যবানের বিকল্প হতে পারে না।

মানুষের মনের ভাব, দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা, আনন্দ-উল্লাস প্রকাশে যবান অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। বলতে গেলে যবান সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মুখপাত্র। বোবার মনের কত দুঃখ-কষ্ট, কত আনন্দ-বেদনা, কিন্তু কাউকে জানাতে পারে না, জীবনের প্রতিটি ধাপে যার বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যে বাকশক্তি হারিয়েছে সে-ই উপলব্ধি করতে পারে- যবান কত বড় নেয়ামত!

সাধারণত যার মুখে জড়তা আছে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা বলতে পারে না তার জীবনেই তো কত সমস্যা। কত কষ্ট পেতে হয় তাকে। কত জায়গায় লজ্জা পেতে হয়। অথচ আমরা নির্বিচারে যত্রতত্র যবানের অপব্যবহার করে চলেছি। বস্তুত এত বড় নিআমতের উপলব্ধি আমাদের মাঝে না থাকার কারণ হলো, বিনামূল্যে কোনো কষ্ট স্বীকার ছাড়াই এ নেয়ামত আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দান করেছেন।

হায়! আমরা যদি একটু বুঝতাম, কত দামী এ নেয়ামত! রব্বে কারীমের কত বড় দান! একটু ভেবেছি কি- কীভাবে কথা বলছি? এত সুন্দর আওয়াজ কীভাবে বের হয়? কোথা থেকে এ ধ্বনিগুলো উচ্চারিত হয়? আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কত বড় নেয়ামত দান করেছেন আর আমরা তাঁর নাফরমানিতে লিপ্ত। এ যবানের কত অপব্যবহার করছি হিসাবও নেই। কত পাপ এ যবান দিয়ে হচ্ছে, আমাদের অনুভূতিও নেই। একটু ভেবেছি কি, কথা বলার জন্য যদি মিনিট হিসাব করে বিল পরিশোধ করতে হত, তাহলে জীবনটা কত দুর্বিষহ হত।

আল্লাহ আমাদের এই নেয়ামত এমনিতেই দিয়ে দিয়েছেন। কথা বলতে কোনো কষ্টও পোহাতে হয় না। তাই অনেক বেশি শুকরিয়া আদায় করা প্রয়োজন। অথচ আমরা নির্বিচারে যবানের প্রতি জুলুম করে যাচ্ছি। নাফরমানির কাজে

---

[১] বুখারী, হাদীস ৬৪৭৪।

ব্যবহার করছি। এ যবান দিয়ে খালেকের বিরুদ্ধাচরণ করছি। এমনকি শিরকী-কুফরী কথাও যারা বলছে এই যবান ব্যবহার করেই বলছে। অনুভূতি-অনুশোচনাও নেই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- অর্থাৎ বান্দা চিন্তা-ভাবনা ছাড়া এমন কথা বলে ফেলে, যার কারণে সে (পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্ব পরিমাণ) জাহান্নামের অতলে নিক্ষিপ্ত হবে।[১]

বহু ক্ষেত্রে যবানের অপব্যবহার গভীর সম্পর্ককেও তছনছ করে দেয়। নিবিড় বন্ধুত্বের মাঝেও ফাটল ধরায়। দীর্ঘদিনের আত্মীয়তাকে মুহূর্তে শেষ করে দেয়। হৃদয়কে জর্জরিত করে। অন্তরকে ক্ষত বিক্ষত করে, যা কখনও মানুষ ভুলতে পারে না। কারণ, যবানের আঘাতের ঘা শুকায় না।

কবি বলেছেন- বর্শার ফলার আঘাতের উপশম হয়। তবে যবানের আঘাতের কোনো উপশম নেই।

যবানের সঠিক ব্যবহার যেমন প্রভূত কল্যাণ বয়ে আনে তেমনি এর অপব্যবহার ধ্বংস ডেকে আনে। এজন্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের যবানের ব্যবহার নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন হতেন।

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ:قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ؟ قَالَ: فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ: هَذَا

হযরত সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ আসসাকাফী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, আমার কোনো বিষয়ে আপনি সবচেয়ে বেশি আশংকা করেন। তখন তিনি নিজ জিহ্বা ধরলেন এরপর বললেন, এটা।[২]

যবান খুব দামী নেয়ামত। সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাঝে যবানের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। পরস্পরিক কথাবার্তা, লেনদেন, আলাপ-আলোচনা, সব কিছুতেই মুখের ভূমিকা অপরিসীম। এটা সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতিনিধি ও মুখপাত্র।

যবানের যথাযথ ব্যবহারের দ্বারা দুনিয়া-আখেরাতে মানুষ যেভাবে উপকৃত হতে পারে তদ্রূপ এর অপব্যবহার দ্বারা ডেকে আনতে পারে ধ্বংস। এই যবান যেমন সত্তর বছরের বৃদ্ধকে ঈমানের স্বীকারোক্তি দ্বারা জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেয় তেমনি কুফরের উচ্চারণ দ্বারা তা মানুষকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে।

যার বাকশক্তি মজবুত এবং যে সুন্দর উপস্থাপনে পারঙ্গম যবানের অপব্যবহারে তার ক্ষতির আশংকাও ততো বেশি। তাই তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

---

[১] বুখারী, হাদীস ৬৪৭৭।

[২] মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৫৪১৯।

উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি নবীজী থেকে বর্ণনা করেন, একবার নবীজী ঘরের দরজায় কিছু মানুষকে বিবাদে লিপ্ত দেখে বললেন-

আমিও মানুষ। আমার কাছে (বিচার নিয়ে) বাদী-বিবাদী আসে। কখনো এমন হয় যে, তোমাদের একজনের চেয়ে অপরজন দলীল উপস্থাপনে বেশি পারঙ্গম। ফলে (দলীল উপস্থাপন থেকে) আমি কাউকে সত্যবাদী মনে করি আর (সেই ভিত্তিতে) কারো পক্ষে সিদ্ধান্ত করি। কখনো যদি এমন ঘটে- আমি অপর মুসলিমের হক কারো জন্য সিদ্ধান্ত করে দিলাম তাহলে (শুনে রাখ) তা হবে জাহান্নামের আগুনের একটি টুকরা। (এখন তার ইচ্ছা, হলে) সে তা গ্রহণ করুক অথবা তা থেকে নিজেকে রক্ষা করুক।[১]

প্রাঞ্জল ও স্পষ্ট ভাষা আল্লাহর মহা দান। তেমনি এর সঠিক ও যথার্থ ব্যবহার অত্যাবশ্যক। নতুবা জাহান্নামের আগুনই হবে ঠিকানা।

সাধারণত আমাদের কথা চার ধরনের হয়।

❖ পুরো কথাই কল্যাণকর। ❖ পুরো কথাই ক্ষতিকর।

❖ যে কথাতে কল্যাণ-অকল্যাণ মিশ্রিত থাকে।

❖ যে কথাতে দুনিয়া-আখেরাতের লাভ-ক্ষতি কিছুই নেই। অর্থাৎ অনর্থক কথা।

কল্যাণকর কথার ক্ষেত্রে শরয়ী বিধান হলো পুরোপুরি জেনেশুনে কথা বলা। অনুমান করে কথাবার্তা বলবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ اِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا

যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার পিছে পড়ো না। জেনে রেখো, কান, চোখ হৃদয়- এর প্রতিটি সম্পর্কে (তোমাদেরকে) জিজ্ঞেস করা হবে।[২]

আমাদের অনেকের মাঝেই একটি প্রবণতা খুব লক্ষ করা যায়। আমরা যা শুনি তাই বিশ্বাস করি এবং প্রচার করতে শুরু করি। যাচাই বাছাইয়ের প্রয়োজন বোধ করি না। কোনো সংবাদ বর্ণনা করার আগে যাচাই-বাছাই করা কর্তব্য। অন্যথায় মিথ্যা হওয়ার প্রবল আশংকা থাকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

كَفٰى بِالْمَرْءِ كَذِبًا اَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

"ব্যক্তি যা শুনে তা বর্ণনা করা মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট।"[৩]

যাচাই-বাছাই ছাড়া কথা বলতে থাকা কিংবা সে অনুযায়ী কর্মনীতি নির্ধারণ করতে থাকা চরম বোকামী। পরিণামে তা আক্ষেপের কারণ হয় এবং ভয়াবহ বিপদ ডেকে আনে।

---

[১] বুখারী, হাদীস ৭১৮১।

[২] সূরা বনী ইসরাঈল : ৩৬।

[৩] মুসলিম শরীফ, হাদীস ৪।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًاۢ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ.

"হে মুমিনগণ! কোনো ফাসেক যদি তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তবে ভালোভাবে যাচাই করে দেখবে, যাতে তোমরা অজ্ঞতাবশত কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে না বস। ফলে নিজেদের কৃতকর্মের কারণে তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হয়।"[১]

যে কথায় কল্যাণ-অকল্যাণ উভয়টাই রয়েছে, বিশেষ প্রয়োজনে তা বলা যাবে। যেমন, বললে কারো গীবত হয়, না বললে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয়- এমন কথা।

ক্ষতিকর ও অনর্থক কথা থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। মুমিন তো ক্ষতিকর কথা বলতেই পারে না। এসব বলে মুমিন কেন জাহান্নামে যাবে? মুমিন তো অনর্থক কথা থেকেও বেঁচে থাকে। এজন্যে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন- وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে।[২]

বিজ্ঞজনের উক্তি- 'যবানের দুটি বিপদ। কথার বিপদ ও চুপ থাকার বিপদ! একটি থেকে মুক্তি পেলেও অপরটি থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন।'

কখনো একটি আরেকটির চেয়ে বড় বিপদ হয়ে সামনে আসে। সত্য থেকে যে চুপ থাকে সেও তো অপরাধী। আর যে বাতিল কথা বলে সে আল্লাহর অবাধ্য, শয়তানের মুখপাত্র।

মায়ের শিক্ষা জন্য সন্তানের সারা জীবনের পাথেয়

কিছুদিন আগের কথা। এক ভদ্র মহিলার সামনে তার সাত আট বছরের সন্তান চিপ্স খাচ্ছে। ডান হাতে চিপ্সের প্যাকেট, বাম হাত দিয়ে নিয়ে নিয়ে খাচ্ছে। মা দেখছেন, কিছু বলছেন না বা বিষয়টি খেয়াল করছেন না। আমার মনে হলো, আমিই শিশুটিকে বলি, বাবা! ডান হাত দিয়ে খাও।

মনে পড়ে গেল ছোট্ট বালক ওমর ইবনে আবি সালামা রা.-এর কথা। তিনি খাচ্ছিলেন নবীজীর দস্তরখানে। ছোট্ট বালক বলে কথা, সে তো এদিক সেদিক করবেই! তেমনি হযরত ওমর ইবনে আবি সালামা রা.-ও একবার খাচ্ছিলেন পাত্রের এপাশ থেকে আরেকবার ওপাশ থেকে। এ দেখে নবীজী কী করলেন? ওমর ইবনে আবি সালামা রা.-এর মুখ থেকেই শোনা যাক। তিনি বলেন, আমি নবীজীর তত্ত্বাবধানে ছিলাম। আমি ছিলাম ছোট্ট বালক। একদিন নবীজীর সাথে

---

[১] সূরা হুজুরাত : ৬।
[২] সূরা মুমিনূন : ৩।

খানা খাচ্ছিলাম। আমার হাত পাত্রের এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছিল। তা দেখে নবীজী (আমাকে খাওয়ার আদব শেখালেন।) বললেন, বৎস! বিসমিল্লাহ বল। ডান হাতে খাও এবং তোমার কাছ থেকে খাও।

হযরত ওমর ইবনে আবি সালামা রা. বলেন, নবীজী আমাকে শেখানোর পর থেকে সারা জীবন আমি ওভাবেই খেয়েছি।[1]

নবীজী একবার মাত্র শিখিয়েছেন। সেই ছোট্ট বেলায়। এটা তার সারা জীবনের পাথেয় হয়ে রয়েছে। ছোটদের বিষয়টি এমনই। ছোট বেলা মায়ের অথবা বাবার শেখানো দুআ-আদব সারা জীবনের পাথেয় হয়ে থাকে, জীবনের শেষ পর্যন্ত মনে থাকে, আমল চলতে থাকে।

এখানে বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় হলো, নবীজী তাকে ওভাবে খেতে দেখে এটা ভাবেননি যে, ছোট্ট বালকই তো; বড় হলে ঠিক হয়ে যাবে। বরং তাকে শিখিয়েছেন। কারণ, বালক বয়স আদব-আখলাক শেখার বয়স। এ সময় শিশুর মাঝে গ্রহণের ও অনুকরণের একটি প্রবণতা থাকে।

সাত বছর বয়স তো বালক বয়সই। এ সময়টাই তো শিশুর নামায শেখার এবং নামাযের অভ্যাস করার বয়স। সন্তানের সাত বছর বয়স হলেই তো নবীজী তাদেরকে নামাযের নির্দেশ দিতে বলেছেন; অভ্যাস করাতে বলেছেন। সুতরাং এ বয়সটাতে জীবনের অন্যান্য আদব-আখলাক শেখানোর প্রতিও যত্নবান হতে হবে।

এর দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, সাত বছরের আগে শেখাতে হবে না; আরো আগ থেকেই শেখাতে হবে। বরং বোল ফোটার পর থেকেই শেখাতে হবে কালিমা। খাওয়ার সময় বলতে হবে- আব্বু বিসমিল্লাহ বল, আলহামদুলিল্লাহ বল। কেউ কিছু দিলে- বল জাযাকাল্লাহ।

আমি তো কোনো কোনো দ্বীনদার মা'কে দেখেছি। তার কোলের শিশুকে খাওয়াচ্ছেন তো খাওয়ানো শুরু করার সময় বলছেন, বিসমিল্লাহ। পোশাক পরাচ্ছেন; বলছেন, বিসমিল্লাহ। পোশাক ডান দিক থেকে পরাচ্ছেন। কোলের শিশু এ থেকে হয়তো কিছুই শিখবে না, বুঝবে না। কিন্তু এটা পরোক্ষভাবে তার জীবনের উপর প্রভাব ফেলবে। সন্তান নেক হতে সহায়তা করবে।

অনেক শিশুরই ঘুমের দুআ, ঘুম থেকে ওঠার দুআ, খাওয়ার দুআ-আদব ইত্যাদি দৈনন্দিনের দুআ-আমল মাদরাসায় এসে শেখা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়নি, বরং 'মায়ের মাদরাসা' থেকেই শিখে ফেলেছে। এ জন্য মা'কে আলাদা আয়োজন করতে হয় না। খাওয়ার সময় খাওয়ার দুআ ও সুন্নত; মা বলবেন- বিসমিল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ তো শিশু অবচেতনেই শিখে যাবে বা একটু খেয়াল করে সন্তানের মুখে লোকমা তুলে দেয়ার সময় যদি বলেন- আব্বু! বল,

---

[1] বুখারী শরীফ, হাদীস ৫৩৭৬; মুসলিম শরীফ, হাদীস ২০২২।

বিসমিল্লাহ। খাওয়া শেষ হলে- আব্বু বল তো, আলহামদু লিল্লাহ। ঘুমানোর সময়- আব্বু বল তো ঘুমের দুআটা কী? এভাবে আয়োজন ছাড়াই মায়ের মাদরাসায় শিশু দৈনন্দিন জীবনের দুআ ও সুন্নত শিখে যেতে পারে।
আর মায়ের কাছ থেকে শিশু যত দুআ-আমল শিখবে। সে অনুযায়ী জীবনে যত আমল করবে, এর একটি অংশ মায়ের আমল নামায়ও যুক্ত হতে থাকবে।
তবে মনে রাখতে হবে, সন্তানকে দুআ-আমল শেখাতে গিয়ে চাপাচাপি করা উচিত নয়। আগ্রহের সাথে যেন সে শিখতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে। একই বিষয়ে একেক জনের ক্ষেত্রে একেক ফর্মূলা কার্যকর। সকলের ক্ষেত্রে একই পন্থা চলে না। কিন্তু তার শেখাটা যেন আগ্রহের সাথে হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে, তাহলে এ শিক্ষার ফলাফল সুদূরপ্রসারী হবে।
সন্তান সহজে যাতে দৈনন্দিন জীবনের দুআ-সুন্নত শিখে নিতে পারে এ জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এক পরিবারে দেখেছি, খাওয়ার টেবিলের পাশের দেয়ালে খাওয়ার দুআ লিখে কালার পেন্সিল দিয়ে সুন্দর করে রং করে লটকিয়ে রেখেছে। তেমনি ঘরের দরজায় ঘর থেকে বের হওয়ার দুআ, বাথরুমের কাছাকাছি কোনো স্থানে বাথরুমের দুআ। এভাবে আকর্ষণীয়ভাবে পেশ করাতে সন্তানেরা আগ্রহের সাথে সহজে শিখে ফেলেছে।
এ সবকিছুর সাথে সাথে সবচেয়ে বড় কার্যকরি যে বিষয়টি তা হলো, দৈনন্দিন আমলের দুআ-সুন্নতের ব্যাপারে মা-বাবাকে যত্নবান হতে হবে। এটা বেশি ফলপ্রসূ। শিশু তখন মা-বাবাকে দেখতে দেখতে ভাববে- এভাবেই খেতে হয়, এভাবেই চলতে হয়।

বিয়ে অর্ধেক দ্বীন

দ্রুত বিয়ের জন্য অবিভাবকদের এগিয়ে আসতে হবে আগে। সমাজ কি বলবে, ছেলে বা মেয়ে এখনো ছোট, মেয়ের স্টাডি শেষ হোক, ছেলে নিজের পায়ে দাড়াক। এরপর মেয়ে চায় কিছু একটা করতে, আর ছেলে চায় ব্যাংক ব্যালেন্স বাড়াতে। এভাবে চলে যায় ৩৫-৪০। এর মধ্যে শয়তান সুযোগ বুঝে যেনায় লিপ্ত করে। অবশেষে ছেলে বা মেয়েদের সন্তান জন্মদান ক্ষমতা হ্রাস পায়। সবশেষে হতভাগ্য সেই অবিভাবকদের কপালে নাতি বা পোতার মুখ দেখার সৌভাগ্য হয়ে উঠে না।
পুরুষগণ নিম্নে বর্ণিত চৌদ্দ শ্রেণির মহিলাদের সাথে দেখা সাক্ষাত করতে পারবে এবং তাদেরকে বিবাহ করা হারাম।
১) আপন মা। ২) আপন দাদী, নানী ও তাদের ঊর্ধ্বতন মহিলাগণ।
৩) সহোদর বোন, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় বোন।

৪) আপন মেয়ে, ছেলের মেয়ে, মেয়ের মেয়ে এবং তাদের গর্ভজাত যে কোন কন্যা সন্তান ও আপন ছেলে সন্তানদের স্ত্রী।

৫) যে স্ত্রীর সঙ্গে দৈহিক মিলন সংঘটিত হয়েছে তার পূর্ববর্তী বা পরবর্তী স্বামীর কন্যা সন্তান এবং স্ত্রীর মা অর্থাৎ, শাশুড়ী, নানী শাশুড়ী ও দাদী শাশুড়ী।

৬) ফুফু অর্থাৎ, পিতার সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় বোন।

৭) খালা অর্থাৎ, মায়ের সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় বোন।

৮) ভাতিজী অর্থাৎ, সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাইয়ের মেয়ে ও তাদের অধঃস্তন কন্যা সন্তান।

৯) ভাগ্নী অর্থাৎ, সহোদর, বৈমাত্রেয়, বৈপিত্রেয় বোনের মেয়ে ও তাদের অধঃস্তন কন্যা সন্তান।

১০) দুধ সম্পর্কীয় মেয়ে, মেয়ের মেয়ে, ছেলের মেয়ে ও তাদের অধঃস্তন কোন কন্যা সন্তান এবং দুধ সম্পর্কীয় ছেলের স্ত্রী।

১১) দুধ সম্পর্কীয় মা, খালা, ফুফু, নানী, দাদী ও তাদের ঊর্ধ্বতন মহিলাগণ।

১২) দুধ সম্পর্কীয় বোন, দুধ বোনের মেয়ে, দুধ ভাইয়ের মেয়ে এবং তাদের গর্ভজাত যে কোন কন্যা সন্তান।

১৩) যৌন শক্তিহীন এমন বৃদ্ধা, যার প্রতি পুরুষের কোন প্রকার আকর্ষণ নেই।

১৪) অপ্রাপ্ত বয়স্কা এমন বালিকা, যার প্রতি পুরুষদের এখনো যৌন আকর্ষণ সৃষ্টি হয়নি। উল্লেখ্য, ১৩ ও ১৪ নং বর্ণিত মেয়েদের সাথে বিবাহ জায়েয আছে।

উপরোক্ত মহিলাগণ ব্যতীত পুরুষের জন্য অন্য কোন মহিলার সাথে দেখা-সাক্ষাত মোটেও জায়েয নয়, বরং সম্পূর্ণ নাজায়েয ও হারাম।[১]

মহিলাগণ কোন ধরনের পুরুষের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারবে

মহিলাগণ নিম্নে বর্ণিত চৌদ্দ শ্রেণির পুরুষদের সাথে দেখা-সাক্ষাত করতে পারবে এবং তাদের সাথে বিবাহ হারাম।

১) পিতা, দাদা, নানা ও তাদের ঊর্ধ্বতন পুরুষগণ।

২) সহোদর ভাই, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাই।

৩) শ্বশুর, আপন দাদা শ্বশুর ও নানা শ্বশুর এবং তাদের ঊর্ধ্বতন পুরুষগণ।

৪) আপন ছেলে, ছেলের ছেলে, মেয়ের ছেলে এবং তাদের ঔরসজাত পুত্র সন্তান।

৫) স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র।

৬) ভাতিজা অর্থাৎ, সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাইয়ের ছেলে ও তাদের অধঃস্তন কোন ছেলে।

---

[১] সূরা নিসা ২৩, মা'আরিফুল কুরআন, ২/৩৫৬-৩৬১।

৭) ভাগিনা অর্থাৎ, সহোদর, বৈমাত্রেয়, বৈপিত্রেয় বোনের ছেলে ও তাদের অধঃস্তন কোন ছেলে।

৮) আপন চাচা অর্থাৎ বাপের সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাই।

৯) আপন মামা অর্থাৎ, বাপের সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাই।

১০) দুধ সম্পর্কীয় ছেলে, উক্ত ছেলের ছেলে, দুধ সম্পর্কীয় মেয়ের ছেলে ও তাদের ঔরসজাত যে কোন পুত্র সন্তান এবং দুধ সম্পর্কীয় মেয়েদের স্বামী।

১১) দুধ সম্পর্কীয় বাপ, চাচা, মামা, দাদা, নানা ও তাদের ঊর্ধ্বতন পুরুষ।

১২) দুধ সম্পর্কীয় ভাই, দুধ ভাইয়ের ছেলে, দুধ বোনের ছেলে এবং তাদের ঔরসজাত যে কোন পুত্র সন্তান।

১৩) যৌন শক্তিহীন এমন বৃদ্ধ, যার মহিলাদের প্রতি কোনো আকর্ষণ নেই এবং তার প্রতি মহিলাদেরও কোন আকর্ষণ নেই।

১৪) অপ্রাপ্ত বয়স্ক এমন বালক, যার এখনও যৌন আকর্ষণ সৃষ্টি হয়নি।

উল্লেখ্য, ১৩ ও ১৪ নং বর্ণিত পুরুষদের সাথে বিবাহ জায়েয।

মহিলার জন্য উপরোক্ত পুরুষগণ ব্যতীত অন্য কোন পুরুষের সাথে দেখা-সাক্ষাত করা জায়েয নেই, বরং তা সম্পূর্ণ নাজায়েয ও হারাম।

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ রা. বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- দু'প্রকার লোক জাহান্নামী হবে। আমি তাদেরকে দেখিনি।

এক প্রকার ঐ সব লোক যাদের কাছে গরুর লেজের ন্যায় ছড়ি থাকবে। তারা এর দ্বারা লোকেদের পিটাবে।

দ্বিতীয় প্রকার, ঐ শ্রেণির মহিলা, যারা কাপড় পরিহিতা কিন্তু উলঙ্গ প্রায়, মানুষকে আকৃষ্টকারিণী এবং নিজে আকৃষ্ট হয়। যাদের মাথার খোপা বুখতী উটের পিঠের উঁচু কুজোর ন্যায়। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং জান্নাতের গন্ধও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধি অনেক দূর থেকে পাওয়া যায়।[1]

আশ্চর্যের ব্যাপার! মুসলিম মেয়েটি বাড়ীর বাইরে বা বাজারে গেলে, স্কুল বা কলেজে গেলে বোরকা পরে যায় পূর্ণ পর্দা পালন করে যায়। অথচ তার বিয়ের দিন গোটা বাড়ীটা যখন একটা বাজারে পরিণত হয় সেদিন সে পর্দাহীন ভাবে অতি সাজগোজের সামনে সবার চোখের সামনে উপস্থিত হয়! "তোমরা জাহেলী যুগের (মূর্খতা যুগের) অনুরূপ (নারীদের মতো রূপ-যৌবনের) নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না।"[2]

---

[1] মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ৭০৮৬।

[2] সূরা আহযাব : ৩৩।

"হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা (নিজেদের গুনাহ্ খাতার জন্যে) আল্লাহর দরবারে তাওবা করো, একান্ত খাঁটি তাওবা। আশা করা যায় আল্লাহ তায়ালা (এর ফলে) তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন।"[১]

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

"সুতরাং যদি তারা যদি মুখ ফিরে নেই, তাহলে তোমার দায়িত্ব তো শুধু স্পষ্টভাবে পৌছে দেয়া।"[২]

প্রসঙ্গ- মাথায় এক টুকরো কাপড় বা ত্যানা প্যাচানো হিজাব!

"প্রিয় বোন! হিজাবের প্রকৃত সংজ্ঞা এখনো হয়তো আপনি বুঝতে পারেননি। ওয়াল্লাহি, এটা কখনোই হিজাবের সংজ্ঞা নয়! মাথায় আধাহাত ত্যানা প্যাঁচানো কক্ষনোই হিজাব হতে পারেনা!

একজন বালেগা মেয়ের সমস্ত সৌন্দর্যকে গাইরে মাহরামের দৃষ্টি থেকে আবৃত রাখার নাম হিজাব! মুখে ময়দার প্রলেপ দিয়ে, মাথায় উটের কুঁজের মত করে বেঁধে, কাপড়কে বিভিন্নভাবে ভাঁজ করে, কপালে টিকলি ঝুলিয়ে যে হিজাব পরা হয়, সেটা হিজাব নয়, সেটা আল্লাহর হুকুমের সাথে তামাশা করা!

নারীকে পণ্য মনে করা বিকৃত মানসিকতার অধিকারীরা যখন দেখে, পূর্ণপর্দা নারীর কমনীয় দেহবল্লরীর ভাঁজে ভাঁজে লুকায়িত সৌন্দর্য অবলোকন করে অবৈধ আনন্দ পেতে চাওয়ার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়, তখন সুকৌশলে তারা হিজাবের নামে নিত্য-নতুন ফ্যাশন চালু করলো।

সহজ-সরল কিছু বোনকে ঘোল খাইয়ে বুঝালো এক টুকরা কাপড়ে মাথার চুল ঢাকাই হিজাব! তুমি যতো খুশী সাজো, টাইটফিট আবেদনময়ী পোশাক পরো, নিজেকে লাবণ্যময়ী হিসেবে উপস্থাপন করো, কোনো সমস্যা নেই, তুমিতো মাথা ঢেকেছোই! (নাউজুবিল্লাহি!)

কন্যা সন্তান পরিবারের বরকতের কারণ। কন্যা সন্তানের প্রতিপালন করা অশেষ মর্যাদার বিষয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে নবী সা. বলেন, 'যে ব্যক্তি দু'টি কন্যাকে তারা সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করবে, কিয়ামতের দিন আমি এবং সে এ দু'টি আঙ্গুলের মতো পাশাপাশি আসবো (অতঃপর তিনি তার আঙ্গুলগুলি মিলিত করে দেখালেন)।'[৩]

---

[১] সূরা তাহরীম : আয়াত-৮।

[২] সূরা নাহল : আয়াত ৮২।

[৩] মুসলিম শরীফ, হাদীস নং: ২৬৩১।

দ্বীনদার স্বামী-স্ত্রী

একটি দ্বীনদার পরিবার, দ্বীনদার সন্তান-সন্ততি ও বংশধরের জন্য সর্বপ্রথম যে বিষয়টি লক্ষ্যণীয় তা হলো, দ্বীনদার স্বামী-স্ত্রী। এজন্য বিবাহের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবার আগে এ বিষয়টি লক্ষ রাখতে বলেছেন।

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

"নারীদেরকে দ্বীনদার-নেককার পুরুষের নিকট বিবাহ দাও, আর পুরুষদেরকে সালেহা (দ্বীনদার-নেককার) নারীর সাথে বিবাহ দাও; ফলশ্রুতিতে তাদের যে সন্তান হবে তারা হবে উত্তম (নেককার)।"[১]

যেমন হবে বিবাহ ও দাম্পত্য জীবন

বিবাহ মানুষের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষঙ্গ। স্বাভাবিক জীবনের অনিবার্য একটি প্রয়োজন। একজন মানুষ যখন শিশু হিসেবে ভূমিষ্ঠ হয় তখনই তার মাঝে খাবারের চাহিদা থাকে; বরং মাতৃগর্ভে প্রাণ সঞ্চারের পর থেকেই তার মাঝে খাবারের চাহিদা সৃষ্টি হয়। এ সময় তার মাঝে মানবজীবনের অন্য অনেক সাধারণ চাহিদা থাকে না। সে ভূমিষ্ঠ হয়ে ধীরে ধীরে যখন বড় হতে থাকে তখন পর্যায়ক্রমে তার অনেক প্রয়োজন দেখা দিতে থাকে। যখন সে আরো বড় হয়, পরিণত বয়সে উপনীত হয় তখন তার বিবাহের প্রয়োজন হয়। ব্যক্তিভেদে মানুষের জীবনে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজন থাকতে পারে, তবে কিছু প্রয়োজন এমন রয়েছে, যা প্রায় প্রতিটি মানুষের মাঝেই বিদ্যমান। বিবাহ তারই একটি।

কুরআন মাজীদে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং একে মানবজাতির প্রতি অনুগ্রহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যেহেতু সমগ্র জগৎ আল্লাহরই সৃষ্টি, জগতের নিয়ম-নীতি তিনিই তৈরি করেছেন, মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি তাঁরই সৃষ্টি, তাই প্রত্যেক সৃষ্টির মাঝে এমন উপাদান তিনি দান করেছেন, যার মাধ্যমে জগৎটা সুন্দরভাবে পরিচালিত হতে পারে। এ ব্যবস্থা তাঁরই দেয়া। তাঁরই হিকমত।

আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্য থেকে এটি একটি যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গীণীকে, যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি লাভ করতে পার এবং তোমাদের (স্বামী-স্ত্রীর) পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে বহু নিদর্শন রয়েছে, সেইসব লোকের জন্য, যারা চিন্তা-ভাবনা করে।[২]

---

[১] সুনানে দারিমী, হাদীস ২২২৭।

[২] সূরা রূম : ২১।

هُوَ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا

"তিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর থেকেই তাঁর স্ত্রীকে বানিয়েছেন, যাতে সে তার নিকট প্রশান্তি লাভ করতে পারে।"[১]

একসময় মানুষ ছিল না। আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করতে চাইলেন। উদ্দেশ্য, তারা তাঁর ইবাদত করবে, তাঁর হেদায়েত মত চলবে। আল্লাহ কীভাবে মানুষ সৃষ্টি করলেন? একসাথে? না, বরং প্রথমে একজন, অতপর তার থেকে তার স্ত্রী, অতপর তাদের থেকে সকল মানুষকে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً.

"হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে এবং তারই থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, আর তাদের থেকে বহু নর-নারী ছড়েছেন।"[২]

মানুষের মাঝে বিবাহরীতি আল্লাহই দান করেছেন। আর আল্লাহ প্রদত্ত এ বিবাহরীতিতে শুধু জাগতিক দিকটিই মুখ্য নয়; বরং তাতে দ্বীনী বা ধর্মীয় দিকটিও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইসলাম এ বিধানের হাকীকত ও উদ্দেশ্য এবং এর নীতিমালাকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে আলোচনা করেছে।

আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে সৃষ্টি করে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। তাদের মূল লক্ষ্য আখেরাতের জীবন। দুনিয়ায় সুশৃঙ্খল জীবনের সাথে সাথে আখেরাতে কীভাবে তারা সফল হবে, সেজন্য তিনি তাদের দিয়েছেন বিস্তারিত পথনির্দেশ। তাই সব কাজে আখেরাতকে স্মরণ রাখা মানুষের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। সুতরাং জাগতিক বিষয়গুলোও সে এমনভাবে সম্পাদন করবে, যা দ্বারা সে আখেরাতে সফল হবে। এটাই শরীয়তে কাম্য এবং বিবেকের দাবি।

বিবাহের প্রসঙ্গটিও এমন। বিবাহকে শরীয়ত নিতান্তই জাগতিক বিষয় বিবেচনা করে না; বরং সেটাকে স্বামী-স্ত্রী এবং তৎপরবর্তী সন্তান-সন্ততি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পরকালের সফলতার মাধ্যমও বিবেচনা করে।

প্রাধান্য দ্বীনদারীকেই দিতে হবে

বিবাহের ক্ষেত্রে কোনো বিষয়কে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেয়া হবে। সৌন্দর্য! তা তো দুই দিনের। সম্পদ! তা তো যখন-তখন হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। এজন্য নবীজী নির্দেশনা দিয়েছেন- তুমি দ্বীনদারীকে প্রাধান্য দাও। তিনি বলেছেন- নারীকে বিবাহ করা হয় চারটি জিনিস দেখে। তার সম্পদ দেখে,

---

[১] সূরা আরাফ- ১৮৯।

[২] সূরা নিসা : ১।

বংশমর্যাদা দেখে। রূপ দেখে এবং দ্বীনদারী দেখে। (হে মুমিন!) তুমি দ্বীনদার নারী বিবাহ করে ধন্য হয়ে যাও।[১]

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- নারীকে বিবাহ করা হয়ে থাকে তার অর্থ সম্পদের জন্য, রূপের জন্য, তার দ্বীনের জন্য। তুমি দ্বীনদার-চরিত্রবান নারীকে বিবাহ করে ধন্য হও।[২]

পুরুষ নারীর রূপ ও সৌন্দর্যে আকৃষ্ট না হওয়া

অনেক সময় কারো বাহ্যিক রূপ ও সৌন্দর্যে মানুষ এতটাই মুগ্ধ হয় যে, দ্বীনদারী ও অন্যান্য উত্তম গুণাবলীর কথা মনে থাকে না। বা বাহ্যিক রূপ-সৌন্দর্যকেই সব মনে করে। ভুলে যায় দুনিয়ার বিপদসংকুল দীর্ঘ পথের কথা; যে পথ চলতে প্রয়োজন নেককার, চরিত্রবান ও ধৈর্যধারণকারী জীবনসঙ্গীর। শুধু সৌন্দর্যে কাবু হয়ে গেলে অনেক ক্ষেত্রেই মানুষ বিস্মৃত হয়ে যায় এসকল অত্যাবশ্যকীয় গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা। ফলে বিবাহ পরবর্তী সামান্য কিছু দিন যেতেই যখন জীবনের বাস্তবতার সম্মুখীন হয় এবং রূপ-সৌন্দর্যের ঘোর কেটে যায়, তখন আক্ষেপ-আফসোসই হয় তার নিত্যসঙ্গী। আর যদি স্বয়ং ঈমানই হয় রূপ-সৌন্দর্যের বলি, তাহলে তো সবই হারালো। তাই আল্লাহ মুমিনকে সতর্ক করেছেন- তোমরা মুশরিক নারীকে বিবাহ করো না যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। মুশরিক নারী তোমাদেরকে মুগ্ধ করলেও (জেনে রাখো,) একজন মুমিন বাদীও (স্বাধীন) মুশরিক নারী থেকে উত্তম। এবং ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা মুশরিক পুরুষদের সাথে বিবাহ দিয়ো না; মুশরিক পুরুষ তোমাদেরকে মুগ্ধ করলেও। একজন মুমিন গোলামও (স্বাধীন) মুশরিক থেকে উত্তম। তারা ডাকে জাহান্নামের দিকে আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তোমাদেরকে ডাকেন জান্নাত এবং ক্ষমার দিকে। তিনি স্বীয় বিধানাবলী মানুষের জন্য সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।[৩]

নারী-পুরুষ পরস্পরে আখেরাতের সহযোগী হবে

বিবাহের মাধ্যমে দুটি জীবন একসাথে পথচলা শুরু করে। তাই সবক্ষেত্রে একে অপরের সহযোগী, উভয়ে উভয়ের কল্যাণকামী। আর দুনিয়ার কল্যাণ ও আখেরাতের কল্যাণ- এ দুয়ে মিলেই মুমিনের কল্যাণ। কারণ, মুমিন দুআ করে-

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ.

---

[১] বুখারী, হাদীস ৫০৯০; মুসলিম শরীফ, হাদীস ১৪৬৬।

[২] ইবনে হিব্বান, হাদীস ৪০৩৭; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১১৭৬৫।

[৩] সূরা বাকারা : ২২১।

"হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখেরাতে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা কর।"[১]

তাই মুমিন দম্পতি দুনিয়ার ক্ষেত্রে যেমন একে অপরের সহযোগী ও কল্যাণকামী তেমনি আখেরাতের ক্ষেত্রেও। এটাই মুমিন দম্পতির জীবনের স্বাভাবিক ধারা। নবীজী সাহাবী হযরত মুআয রা. কে বলেন-

يَا مُعَاذُ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا، وَزَوْجَةً صَالِحَةً تُعِينُكَ عَلَى أَمْرِ دُنْيَاكَ وَ دِيْنِكَ خَيْرُ مَا اكْتَسَبَهُ النَّاسُ

হে মুআয, মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন হলো, শোকরকারী অন্তর, যিকিরকারী জিহ্বা, সালেহা (দ্বীনদার) স্ত্রী, যে তাকে দুনিয়া ও দ্বীনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে।[২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا، كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا، وَالذَّاكِرَاتِ.

'যখন কোনো পুরুষ রাতে জাগ্রত হয় অতপর তার স্ত্রীকেও জাগ্রত করে, অতপর উভয়ে দুই রাকাত নামায আদায় করে, তাদেরকে 'যাকিরীন' ও 'যাকিরাত'-এর তালিকাভুক্ত করা হয়।'[৩]

হযরত উসমান ইবনু আবিল আস রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে-

كَانَ لِدَاوُدَ نَبِيِّ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةٌ يُوقِظُ فِيهَا أَهْلَهُ فَيَقُولُ: يَا آلَ دَاوُدَ قُومُوا فَصَلُّوا فَإِنَّ هٰذِهِ سَاعَةٌ يَسْتَجِيبُ اللهُ فِيهَا الدُّعَاءَ.

হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম রাতের এক সময়ে জাগ্রত হয়ে পরিবারের সকলকে জাগিয়ে দিতেন এবং বলতেন, হে দাউদ- পরিবার! ওঠ এবং নামায পড়। কেননা এটা এমন এক সময় যখন আল্লাহ তাআলা দুআ কবুল করেন।[৪]

আশা করি, উল্লেখিত আয়াত-হাদীসসমূহে বিবাহের মাকসাদ কী, তাতে কী কী বিষয় লক্ষণীয় এবং দাম্পত্য জীবনে কী কী করণীয়- এর কিছু দিক আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে এসেছে। এখন দেখার বিষয় হলো, আমরা এসব বিষয়ের প্রতি কতটুকু লক্ষ রাখছি।

একটু চিন্তা করি- মুমিনের সকল বিষয়ের মতো বিবাহের ক্ষেত্রেও সূচনাতেই দ্বীনদারী তথা আখেরাতের দিকটি বিবেচনায় রেখে অগ্রসর হতে বলা হয়েছে। আমরা তা করছি কি? সর্বাগ্রে পাত্র-পাত্রীর দ্বীনদারী লক্ষ করার কথা বলা হয়েছে;

---

১ সূরা বাকারা : ২০১।

২ তবারানী, হাদীস ৭৮২৮; মাযমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস ৭৪৩৮।

৩ আবু দাউদ, হাদীস ১৪৫১; ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৩৩৫।

৪ মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৬২৮১; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস ৪৪৭১।

আমাদের সমাজে তা করা হয় কি না? বাহ্যিক রূপ-সৌন্দর্য ও সহায়-সম্পত্তি বা জাগতিক অন্য কিছুকে দ্বীনের উপর প্রাধান্য দিচ্ছি না তো! কোনো পাত্র বা পাত্রীর জাগতিক কিছু নেই বা তুলনামূলক কম আছে; কিন্তু তার দ্বীনদারী, উত্তম চরিত্র ও দ্বীনী জ্ঞান অন্যান্য বিষয় থেকে অনেক বেশি, সেক্ষেত্রে আমরা দ্বীনদারী ও আখলাকের বিশেষ মূল্যায়ন করছি কি? শরীয়তে দ্বীনদারীকে প্রাধান্য দিতে বলা হয়েছে। আমরা অন্যগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে দ্বীনদারীকে পিছে ঠেলছি না তো!

নবীজীর প্রতি নারী সাহাবীদের ভালোবাসা

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসা ঈমানের অঙ্গ। এছাড়া ঈমান পূর্ণতা পায় না। ঈমানের পূর্ণতার জন্য নবীজীকে শুধু আল্লাহর প্রেরিত রাসূল হিসেবে মেনে নেয়াটাই যথেষ্ট নয়। সেইসাথে নবীজীকে ভালোবাসতে হবে হৃদয় থেকে। এ ভালোবাসা ঈমানের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে। ঈমানকে সজীব ও জীবন্ত করে তোলে। সেইসাথে শরীয়তের আহকাম ও বিধি-বিধান মানাও সহজ করে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ

তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা-মাতা, সন্তান ও সকল মানুষ থেকে প্রিয় হবো।[১]

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ বাণীকে সাহাবায়েকেরাম রা. হৃদয় দিয়ে বরণ করেছিলেন এবং বাস্তব জীবনে এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

নবীজীকে ভালোবাসার ক্ষেত্রে নারী সাহাবীগণও ছিলেন অগ্রগামী। তারাও নবীজীকে ভালোবেসেছেন হৃদয় থেকে। সে ভালোবাসা কখনো মুখে উচ্চারিত হতো। কখনো বিভিন্ন কর্ম ও আচরণে প্রকাশ পেত। নিম্নে নারী সাহাবীদের ভালোবাসার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হলো- উহুদ যুদ্ধে প্রাথমিক জয়ের পর এক পর্যায়ে মুসলমানগণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। একে একে শহীদ হতে থাকেন অসংখ্য সাহাবী। মদীনা তখন শোকে স্তব্ধ। কারো বাবা নেই। কারো ভাই নেই। কেউবা স্বামী হারিয়েছেন।

বনু দীনারের এক নারী। উহুদ যুদ্ধে তার স্বামী, বাবা ও ভাই শহীদ হন। এসব আপনজনদের শাহাদাতের সংবাদ তাকে দেয়া হলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, রাসূলুল্লাহ কেমন আছেন? উত্তরে বলা হলো, তিনি ভালো আছেন। এরপর এ নারী সাহাবী যা বললেন, তা আজ ১৪০০ বছর পরও আলো ও সৌরভ ছড়াচ্ছে ইতিহাসের পাতায়। নবীজীর সুস্থতার খবর শুনে সেই নারী সাহাবী বলেছিলেন-

كُلُّ مُصِيْبَةٍ بَعْدَكَ جَلَلٌ! নবীজী ভালো আছেন। সুস্থ ও জীবিত আছেন। তাহলে মনে আর দুঃখ নেই। সব অশান্তিই তাহলে তুচ্ছ![১]

---

[১] বুখারী, হাদীস ১৫।

সুবহানাল্লাহ! কী দীপ্ত উচ্চারণ! ভালোবাসার কী গভীর অনুসরণ!! বাবা নেই, ভাই নেই, স্বামীকেও হারিয়েছেন। একসাথে এত আপনজন হারিয়ে মানুষ কতটা শোকসন্তপ্ত ও বিধ্বস্ত হতে পারে তা কল্পনা করাও কঠিন।

নারীরা যেভাবে আল্লাহ্ ওয়ালা হবেন

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- আমার বান্দা নফলের মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হতে থাকে। একপর্যায়ে সে আমার ভালোবাসার পাত্র হও।[২]

হাদীসে কুদসীতে বলা হয়, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিন্তু নিসবত করেন আল্লাহ তাআলার দিকে। দুনিয়ার গোলাম মনিবের কাছে এসে বসতে পারে না। দূরে দূরে বসে। মনিবের পাশে ঘেষে বসার সুযোগ পায় না। আর আল্লাহ তা'য়ালা বলছেন, আমার বান্দা আমার গোলাম, আমার করীব হয়ে যায়। আমার নিকটে পৌছে যায়। যদিও সে আমার গোলাম, তথাপি সে আমার ভালোবাসার পাত্র হয়ে যায়। কিসের দ্বারা? নফল ইবাদতের দ্বারা। ফরয ইবাদত তো আমরা সবাই করি। কিন্তু নফল ইবাদতের অভ্যাস হয়ত নেই। যদি আমরা নফল পড়ার অভ্যাস করতে পারি, তাহলে আমরা আল্লাহর গোলাম থেকে হয়ে যাব আল্লাহর ও প্রিয়। কেমন প্রিয় হবো? আল্লাহ্ বলেছেন, বান্দার হাত-পা দেখতে বান্দার হাত-পা হলেও যার নফল ইবাদতের অভ্যাস আছে, আমি সেই বান্দার হাত পা হয়ে যাই। অর্থাৎ তার হাত আমার মর্জির খেলাফ নড়ে না। তার পা আমার দ্বীনে বিপরীত চলে না।

যারা মাদরাসায় পড়ি বা পড়াই, এই পড়া বা পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ফরজ তো পড়িই, এটা তো না পড়লে উপায় নেই, কিন্তু নফলের অভ্যাসটা গড়া হয়নি। এখন থেকে নফল পড়ার অভ্যাসও করা উচিৎ। দিন রাতে কয়েক প্রকার নফল নামায রয়েছে।

❖ **এশরাক-এর নামায :** ৩৬৫ দিনে এক বছর। প্রতি দিনই যদি একটি হজ্ব এবং একটি উমরার সওয়াব অর্জন হয়, তাহলে এক বছরে কতগুলো হজ্ব ও উমরার সওয়াব হবে ভেবে দেখেছেন? এই বিরাট সওয়াব আমরা এশরাকের নামাযের মাধ্যমে খুব সহজে অর্জন করতে পারি। ফজরের নামাযের কিছুক্ষণ পর সূর্যোদয় হয়। সেই সময় যদি দুই রাকাত নামায পড়ি, তাহলে আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে একটি হজ্ব এবং একটি উমরার সওয়াব দান করবেন।[৩]

---

[১] সীরাতে ইবনে হিশাম ৩/৬২।

[২] বুখারী শরীফ ২/৯৬৩।

[৩] তিরমিযী শরীফ ১/১৩০।

আরেকটি হাদীসে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ রাববুল আলামীন বলেন, বান্দা যদি চার রাকাত নামায সকালে পড়ে, সন্ধ্যা পর্যন্ত বান্দার যত কাজ আছে আমি আল্লাহ তার সকল কাজের যিম্মাদার হয়ে যাই।[১]

এশরাকের দুই রাকাতের সঙ্গে আরো দুই রাকাত মিলালে চার রাকাত হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকল কাজের যিম্মাদার হয়ে যাবেন। হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ. এশরাকের দুই রাকাতের সঙ্গে আরও দুই রাকাত মিলে চার রাকাত পুরা করতেন। তালিবুল ইলম ভাইদেরকে বিশেষভাবে বলছি, ৩৬৫ দিন একদিনও যেন এমন না যায়, যেদিন আপনারা এশরাক পড়েন নাই। চেষ্টা করুন। চেষ্টা করলে আল্লাহ তা'য়ালা সাহায্য করবেন।

❖ **যাওয়ালের নামায :** ক্যালেন্ডারের সময় অনুযায়ী যখন যোহরের সময় হয় যেমন বর্তমানে সোয়া ১২টায় যোহরের ওয়াক্ত হয়ে যায়। এই সময় হওয়া মাত্রই সকালের অনুরূপ চার রাকাত নামায পড়ে নিবো। এটাকে যাওয়ালের নামায বলা হয়।

❖ **চাশতের নামায :** যদি সম্ভব হয়, তাহলে সালাতুল ইশরাক ও যাওয়ালের মাঝামাঝি সময় অর্থাৎ সকাল ৯টা থেকে ১১ টার ভিতর চাশতের নামায পড়বো। আট রাকাতের কথা রেওয়ায়েতে এসেছে। চার রাকাতের কথাও এসেছে। দুই রাকাত পড়লেও হবে ইনশাআল্লাহ। সময় কম, সবক আছে, মুতালাআ আছে। সুতরাং একেবারে বাদ দিবো না, দুই রাকাত হলেও পড়া।

❖ **আওয়াবীন :** মাগরিবের নামাযের পর আওয়াবীন পড়বো। সালাতুল আওয়াবীন সম্পর্কে দুই রেওয়ায়েত আছে। ছয় রাকাত ও বিশ রাকাত। বিশ রাকাতের রেওয়ায়েতের সনদে দুর্বলতা তুলনামূলক কম। ছয় রাকাতের সনদ আরেকটু দুর্বল। (কিন্তু মাগরিব ও এশার মাঝে নফল নামায একাধিক সহীহ আছার দ্বারা প্রমাণিত। আর একটি হাসান পর্যায়ের হাদীসে এই নামাযকে সালাতুল আওয়াবীন বলা হয়েছে।) মাদরাসা খোলা থাকা অবস্থায় মাগরিবের পর বিশ রাকাত পড়তে পারবো না। তখন ছয় রাকাতের রেওয়ায়েতের উপর আমল করবো। হাফেজ্জী হুজুর রহ. বলতেন, ছয় রাকাত পড়তে না পাড়লে চার রাকাত পড়বে। দুই রাকাত সুন্নতে মোয়াক্কাদা তো আমরা পড়ছি। তার সঙ্গে চার রাকাত মিলিয়ে নিলে ছয় রাকাত হয়ে যাবে। এই ছয় রাকাতের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা বার বৎসর নফল ইবাদত করার সওয়াব দান করবেন।[২]

❖ **তাহাজ্জুদ :** সবচে' গুরুত্বপূর্ণ হলো তাহাজ্জুদের নামায। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ফরয নামাযের পর শ্রেষ্ঠ নামায হলো, রাতের নামায (তাহাজ্জুদ)।[৩]

---

[১] তিরমিযী শরীফ ১/১০৮।
[২] জামে তিরমিযী ১/৯৮।
[৩] জামে তিরমিযী ১/৯৯।

যোগ্য হাফেযা ও হাফেয হওয়ার সহজ উপায়

হেফযখানার বিশেষ পরিভাষাসমূহ

❖ **হেফয ঃ** অর্থ সংরক্ষণ করা, মুখস্থ করা, মনো রাখা ইত্যাদি।

❖ **হাফেয ঃ** অর্থ সংরক্ষণকারী। অর্থাৎ যিনি কুরআন মুখস্থ করে বক্ষে ধারণ করেন বা সংরক্ষণ করেন তাকে হাফেয বলে।

❖ **হেফজখানা ঃ** হিফজখানা উর্দূ শব্দ। বাংলাতে অর্থ দাড়ায় সংরক্ষণশালা বা সংরক্ষণালয়। অর্থাৎ যেখানে কুরআনের সংরক্ষণ করা হয়।

❖ **নাযেরা ঃ** আরবী শব্দ। অর্থ-দেখা বা দৃষ্টি দেয়া অর্থাৎ দেখে দেখে তেলাওয়াত করা।

❖ **সবক ঃ** সবক আরবী শব্দ, ফার্সিতেও ব্যবহার হয়। সবক অর্থ পাঠ বা পড়া। হিফযের পরিভাষায় নতুন পাঠকে সবক বলে। যা মাগরিবের পর হিফযের সবকী ছাত্ররা পড়ে।

❖ **সাতসবক ঃ** সাতদিনের নতুন সবককে সাতসবক বলে। অর্থাৎ সবকের পেছনের সাত দিনের সবককে সাতসবক বলা হয়। সাতদিনে যত পৃষ্ঠা মুখস্ত করা হবে সবটাই সাতসবক হিসেবে গণ্য।

❖ **আমুখতা ঃ** আমুখতা ফার্সি শব্দ। অর্থ-শেখা বা শিক্ষা করা। অর্থাৎ যে পড়া একবার শেখা হয়েছে তা পুনরায় ভালোভাবে মুখস্থ করা। হিফযের পরিভাষায় সবকের পারার পিছনের পারা যা সাতসবকের পরে নির্দিষ্ট পরিমানে শুনানো হয় তা-ই আমুখতা।

❖ **শবিনাহ ঃ** এটি ফার্সি শব-ইয়াহ (شب ينه) থেকে উদ্ভুত। তবে হিফযের পরিভাষায় প্রতি সপ্তাহে একবার পূর্বের আমুখতাসহ দুই বা ততোধিক শিক্ষার্থী একত্রে বসে একে অপরকে মুখস্থ তেলাওয়াত শোনাকে শবিনাহ বলে। সাপ্তাহিক শবিনাহতে বিগত সপ্তাহের আমুখতাসহ এবং মাসিক শবিনাতে বিগত মাসের আমুখতাসমুহ শোনানোই নিয়ম।

❖ **দাওর ঃ** আরবী শব্দ। অর্থ হচ্ছে ঘূর্ণন, পালা, দফা ইত্যাদি। অর্থাৎ নির্ধারিত নিয়মে একে অপরকে পড়া শুনানো।

❖ **তেলাওয়াত ঃ** আরবী শব্দ। অর্থ হচ্ছে পাঠ বা আবৃত্তি। পরিভাষায় তাজভীদসম্মত যে কোন পদ্ধতিতে কুরআন পাঠ করাকে তেলাওয়াত বলে।

❖ **তর্জ ঃ** এটি আরবী শব্দ। অর্থ হচ্ছে গতি, ঢং, ধরণ, পদ্ধতি ইত্যাদি। অর্থাৎ তেলাওয়াতের ধরণকে তর্জ বলে।

❖ **তর্জ তিন প্রকার।** যথা- ১। তারতিল (তাজভীদসম্মত ধীরগতির তেলাওয়াত) ২। তাদবীর (তাজভীদসম্মত মধ্যগতির তেলাওয়াত)
৩। হদর (তাজভীদসম্মত দ্রুতগতির তেলাওয়াত।)

❖ **লাহন ঃ** অর্থ ছন্দ বা সুর। তেলাওয়াতের সুরকে লাহন বলে। ব্যবহারভেদে একই শব্দের দুটি অর্থ। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে ভাষাগত ভুল। অর্থাৎ তাজভীদের বিপরিত অশুদ্ধ পড়াকে লাহন বলে।

লাহন দুই প্রকার। যথা ঃ ১। লাহনে জলি। ২। লাহনে খফি।

❖ **মুশাবাহ ঃ** আরবী শব্দ। অর্থ সাদৃশ্য বা মিল। হিফযের পরিভাষায় একই রকম আয়াত বা আয়াতাংশ একটি অপরটির সাদৃশ্য বা মিল থাকার কারণে হিফযের সময় এক আয়াতের সঙ্গে অন্য আয়াতের সংমিশ্রণ হওয়াকে মুশাব্বাহ বলা হয়।

হেফজখানার প্রতিদিন যা যা করা প্রয়োজন

❖ হাজিরা ডাকা ❖ পাঠ পরিকল্পনা ❖ মশকের ব্যবস্থা করা।

হেফজখানার প্রতি সপ্তাহে যা যা করা প্রয়োজন

❖ পড়ার হিসাব নেয়া ❖ শরীর পরিষ্কার করা❖ পনেরো দিন পর ছুটি দেয়া।

হেফজখানার প্রতি মাসে যা যা করা প্রয়োজন

❖ শফিনা ❖ বেতন ❖ পারিবারিক হিসাব ❖ পরিচালক।

শিক্ষার্থীরা যেভাবে হেফজ শুরু করবে

❖ আপনার মেধা ও স্মরণশক্তি অনুপাতে প্রতিদিন একটি নির্ধারিত পরিমাণ মুখস্থ করুন। সর্বনিম্ন পাঁচ লাইন মুখস্থ করার চেষ্টা করুন।

❖ প্রতিদিন সকালে ও বিকেলে দুইবার হিফজের জন্য সময় দিন। সকালে নির্ধারিত পরিমাণ মুখস্থ করুন এবং সারা দিন মনে মনে আবৃত্তি করুন। রাতে দেখে তা আরো ভালোভাবে আত্মস্থ করুন। সকাল ও সন্ধ্যায় কমপক্ষে ৪০ মিনিট করে সময় দেয়ার চেষ্টা করুন।

❖ পরের দিন একজন কুরআনের হাফেজ বা যাঁর কুরআন তেলাওয়াত বিশুদ্ধ তাঁকে মুখস্থ করা অংশটুকু শোনান। কোনো স্থানে কোনো ভুল থাকলে তা সংশোধন করে নিন এবং পরের দিন তা আবার শোনান।

যেকোনো মুসলিম সহজে কুরআন মুখস্থ করতে পারবে

❖ প্রথমে মনে সাহস রাখুন ❖ এত পৃষ্ঠা কিভাবে শেষ করবেন এ কথা না ভেবে প্রতিদিন পাঁচ লাইন করে মুখস্থ করুন। এতে তিন দিনে এক পৃষ্ঠা মুখস্থ করতে পারবেন এবং ৬০ দিনে এক পারা মুখস্থ করা সম্ভব।

❖ যদি প্রতিদিন মাত্র পাঁচ লাইনও মুখস্থ করেন, তবু মাত্র পাঁচ বছরে পুরো কুরআন মুখস্থ করা সম্ভব। আর সাধারণ রীতি অনুযায়ী মুখস্থ শুরু করলে আপনি দিনে পাঁচ লাইনের চেয়েও বেশি মুখস্থ করতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে তিন থেকে সাড়ে তিন বছরে কুরআন মুখস্থ হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ! হিফজ শুরুর আগে যা করণীয় প্রথমে একজন শিক্ষকের কাছে আরবী বর্ণ ও শব্দের সঠিক উচ্চারণ শিখি এবং তাঁর কাছে কুরআন দেখে পড়ার অনুশীলন করি। সম্ভব হলে কুরআনের কয়েকটি সূরা মুখস্থ করে তাঁকে শোনাই যেন দেখে মুখস্থ করার ক্ষেত্রে আপনার ত্রুটিগুলো তিনি চিহ্নিত করতে পারেন। সর্বোপরি আল্লাহর সাহায্য কামনা করুন।

পূর্বের পড়া যেভাবে মনে রাখবেন

❖ প্রতিদিন নতুন অংশ মুখস্থ করা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি পেছনের অংশ মুখস্থ রাখাও গুরুত্বপূর্ণ। তাই সুযোগ মতো পেছনের অংশ বারবার তেলাওয়াত করতে হবে।

❖ কুরআন শরীফ মুখস্থ রাখার সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হলো তা নামাজে তেলাওয়াত করা। যতটুকু মুখস্থ হয়েছে, তা ধারাবাহিকভাবে পাঁচ ওয়াক্তের নামাজে তেলাওয়াত করুন। তাহাজ্জুদ, ইশরাক ও আউয়াবিনের অভ্যাস থাকলে সে সময়ও কিছু অংশ তেলাওয়াত করুন।

❖ নামাজে তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে নতুন ও পুরাতন অংশের সমন্বয়ও হতে পারে।

❖ রাতে-দিনে বিশ্রামের সময় মনে মনে তেলাওয়াত করুন। বিশেষত ঘুমানোর আগে প্রতিদিনের নতুন মুখস্থ করা অংশটি আগের দিনের অংশের সঙ্গে মিলিয়ে তেলাওয়াত করুন।

❖ একাধিক পারা মুখস্থ হওয়ার পর সম্ভব হলে ধারাবাহিকভাবে পেছনের এক পারা করে একবার দেখে তেলাওয়াত করুন এবং তারপর একবার না দেখে তেলাওয়াত করুন।

❖ দেখে তেলাওয়াত করার সময় ভুলগুলো চিহ্নিত করুন।

কুরআনুল কারিম শিক্ষাদানকারীর আদব

আল্লাহ তা'আলা যেরূপ কুরআন নাযিল করেছেন, অনুরূপ তা শিক্ষা দেওয়ার কতিপয় আদব নাযিল করেছেন, যা প্রত্যেক শিক্ষক বা শিক্ষিকার জানা জরুরি। কারণ, আদব হচ্ছে শিক্ষক-ছাত্রের মধ্যকার বন্ধন ও যোগসূত্র। আদব যেরূপ গভীর ও অকপট হয়, তাদের মধ্যকার সম্পর্ক সেরূপ দৃঢ় ও মজবুত হয়। আদব সুন্দর হলে শিক্ষার আদান-প্রদান সুন্দর, ব্যাপক ও বরকতময় হয়। তাই নিম্নে শিক্ষক বা শিক্ষিকার কতিপয় আদব।

❖ **কুরআনুল কারিমকে আদর্শ বানানো :** কুরআনুল কারিমের শিক্ষক সর্বপ্রথম নিজেকে কুরআনুল কারিমের আখলাক দ্বারা সজ্জিত করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা তা পাঠ করে যথার্থভাবে।"

ইবনে আব্বাস রা. এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তারা যথাযথভাবে কুরআনুল কারিম অনুসরণ করে।"

হযরত আয়েশা রা. কে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়ে ছিল, তিনি বলেন- "তার আখলাক ছিল কুরআন"। অতএব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ন্যায় কুরআনকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা তার উত্তরসূরির প্রথম কাজ।

❖ **উপযুক্ত জায়গায় তালিম দেয়া-** কুরআনুল কারিম শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত জায়গা নির্বাচন করা জরুরি। শিক্ষার্থীর সাথে সম্পৃক্ত বা তার মালিকানাধীন জায়গায় তালিম না দেয়া, শাসক কিংবা ধনাঢ্য ব্যক্তির বাড়িতে পাঠদান থেকে বিরত থাকা শ্রেয়। আমাদের আদর্শ পূর্বপুরুষগণ শিক্ষার্থীর সাথে সম্পৃক্ত জায়গায় বসে দীনি শিক্ষা প্রদান করেননি। এটা অহংকার নয়, বরং ইলমের মর্যাদার সুরক্ষা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- "নিজেকে অসম্মান করা কোনো মুমিনের পক্ষে সমীচীন নয়।"

অপর হাদিসে তিনি বলেন- "তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম ব্যক্তি যে-কুরআন শিখে ও তা শিখায়।"

❖ **শিক্ষার্থীর প্রতি পরিপূর্ণ মনোযোগ প্রদান করা-** শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষক বা শিক্ষিকার পূর্ণ মনোনিবেশ করা, তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা, কেউ অনুপস্থিত থাকলে তার খবরা-খবর নেয়া শিক্ষক বা শিক্ষিকার বিশেষ গুণ। পাঠদানের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন কথা বা কাজে মগ্ন না হওয়া, পরিপূর্ণ মনোযোগসহ সবার তেলাওয়াত শ্রবণ করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন- "যখন কুরআন তেলাওয়াত করা হয়, তোমরা মনোযোগসহ শ্রবণ কর ও তার জন্য চুপ থাক, তাহলে তোমাদের উপর রহম করা হবে"।[১]

❖ **শিক্ষার্থীদের মাঝে ইনসাফ ও সমতা বজায় রাখা-** ছোট-বড়, ধনী-গরীব সবার ক্ষেত্রে ইনসাফ বজায় রাখা, প্রত্যেককে তাদের অধিকার পাইয়ে দেয়া। কুরআন শিক্ষাদানকারীর পক্ষে সমীচীন নয় ধনীকে কাছে নেয়া, গরীবকে দূরে ঠেলে দেয়া, ধনীর জন্য বিনয়ী হওয়া ও গরীবের জন্য কঠোর হওয়া। উপযুক্ত কারণ ব্যতীত কাউকে কারো উপর প্রাধান্য না দেয়া। কাউকে সম্বোধন করে কাউকে পরিত্যাগ না করা, সবার প্রতি সমান দৃষ্টি ও সমান মনোযোগ প্রদান করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন- "হে মুমিনগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর জন্য সাক্ষীরূপে।"[২]

❖ **ধৈর্যধারণ করা-** কারো থেকে ভুল বা অসংলগ্নতা প্রকাশ পেলে ধৈর্যধারণ করা, তিরস্কার ও অসম্মান না করা। শিক্ষার্থীদের ঘনিষ্ঠ হওয়া, তারা যেন শিক্ষক বা শিক্ষিকা পেয়ে খুশি হয়। বেশী রূঢ় বা বেশী শিথিল না হওয়া, বরং মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- "নিশ্চয় আল্লাহ সহনশীল, সহনশীলতা পছন্দ করেন এবং তিনি সহনশীলতার বিনিময়ে যা প্রদান করেন, তা কখনো কঠোরতার বিনিময়ে প্রদান করেন না"।

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনা রয়েছে: "কোনো বস্তুতে নম্রতা অবস্থান করে না, তবে অবশ্যই নম্রতা ঐ বস্তুকে সুন্দর করে এবং কোনো বস্তু হতে নম্রতা অপসারণ করা হয় না, তবে অবশ্যই নম্রতার অনুপস্থিতি ঐ বস্তুকে বিনষ্ট করে"। আইয়ুব সাখতিয়ানী রহ. বলেন: "আলেমের উচিত আল্লাহর প্রতি বিনয় ও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ নিজের মাথার উপর মাটি রাখা।"

---

[১] সূরা আরাফ :২০৪।
[২] সূরা নিসা :১৩৫।

❖ **শিক্ষার্থীদের কল্যাণ কামনা করা ঃ** কুরআন পড়তে আসা শিক্ষার্থীকে স্বাগত জানানো ও তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করা বিশেষ এক আদব। আবু হারুন আবাদি রহ. বলেন, আমরা আবু সাঈদ খুদরি রা-এর নিকট আসতাম, তিনি বলতেন, তোমাদেরকে স্বাগতম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের জন্য কল্যাণ কামনার নির্দেশ দিয়েছেন।

إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ وَإِنَّ رِجَالًا يَأْتُونَكُمْ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرَضِينَ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا

"নিশ্চয় মানুষেরা তোমাদের অনুসারী, আর নিশ্চয় দ্বীন শিখার জন্য মানুষেরা দুনিয়ার দিগন্ত থেকে তোমাদের নিকট আসবে, যখন তারা তোমাদের নিকট আসবে তোমরা তাদের কল্যাণ কামনা কর।"

হাদীসে তিনি বলেন-

اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهٖ وَ لِرَسُوْلِهٖ وَ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَعَامَّتِهِمْ

"নিশ্চয় দ্বীন হচ্ছে কল্যাণ কামনা করা, আমরা বললামঃ কার জন্য? তিনি বললেনঃ আল্লাহর জন্য, তার কিতাবের জন্য, তার রাসূলের জন্য ও মুসলিমদের ইমামদের জন্য ও তাদের সর্বসাধারণের জন্য।"

❖ **শিক্ষার্থীদের উপদেশ দেয়া ঃ** শিক্ষার্থীদের কুরআনুল কারিমের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা, সময়-সুযোগ বুঝে হাফিযদের মর্যাদার কথা আলোচনা করা, হিফয করার উপকারিতা, তেলাওয়াত করার আদব আলোচনা করা এবং দুনিয়া সংগ্রহ ও তাতে মগ্ন হওয়া থেকে সতর্ক করা আদর্শ শিক্ষক বা শিক্ষিকার এক বিশেষ গুণ।

❖ **আল্লাহর উপর তাওয়াককুল করা ঃ** কুরআনুল কারিমের শিক্ষক বা শিক্ষিকার পক্ষে সমীচীন নয় স্বীয় প্রয়োজন মানুষের নিকট পেশ করা। তিনি সকল প্রয়োজন আল্লাহর নিকট পেশ করবেন এবং সম্পদশালী ও ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের থেকে দূরে থাকবেন। চেষ্টা করবেন যেন মানুষের

প্রয়োজন তার মাঝে সৃষ্টি হয়, মানুষ যেন দ্বীনের জন্য তার মুখাপেক্ষী হয়। হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- "যে এমন ইলম শিখল, যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হয়, অথচ সে তা শিখেছে একমাত্র দুনিয়ার সম্পদ অর্জন করার জন্য, কেয়ামতের দিন সে জান্নাতের ঘ্রাণ পাবে না।"

অতএব, কুরআনুল কারিমের শিক্ষক বা শিক্ষিকাগণ স্বীয় প্রতিদান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করুন, যেমন নবী-রাসূলগণ করতেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন- "আর আমি তার (দ্বীন শিখানোর) উপর তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না, আমার পারিশ্রমিক শুধু সৃষ্টিকুলের রবের নিকট।"[১]

❖ কুরআনুল কারিমের শিক্ষক বা শিক্ষিকার আরো কতিপয় গুণ

দানশীল ও উদার হওয়া, আল্লাহ তাকে প্রদান করলে মানুষকে প্রদান করা, তার উপর সংকীর্ণ করা হলে বিরত থাকা। দুনিয়ার মোহ ও তার সামগ্রীর সাথে সম্পৃক্ত না হওয়া। পিতা-মাতার খিদমত করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখা। সাথীদের কল্যাণ কামনা করা, দৃঢ়তা, একাগ্রতা ও গাম্ভীর্যতাকে প্রাধান্য দেয়া, অধিক হাসি-ঠাট্টা থেকে বিরত থাকা।

❖ কথা বলার প্রয়োজন হলে বলা, অন্যথায় চুপ থাকা। অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে ঘাটাঘাটি না করা। জিহ্বার অনিষ্ট থেকে নাজাতের জন্য শত্রুর মত তাকে ভয় করা, শত্রুকে বন্ধী রাখার মত তাকে বন্ধী রাখা।

❖ নিজের প্রশংসা না করা, নফস থেকে সতর্ক থাকা, গীবত পরিহার করা, কাউকে খাটো না করা, কারো মসিবত দেখে খুশি না হওয়া, কারো উপর সীমালঙ্ঘন না করা, কারো সাথে হিংসা না করা, প্রমাণ ব্যতীত কারো সম্পর্কে খারাপ ধারণা না করা। নিষিদ্ধ বস্তু হতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হিফাজত করা। মুখ ও হাত দ্বারা কাউকে কষ্ট না দেয়া, কারো উপর জুলম না করা, জুলমের শিকার হলে সম্মানজনকভাবে প্রতিকারের ব্যবস্থা করা, অন্যথায় ধৈর্য ধারণ করা। আল্লাহকে সন্তুষ্ট ও শত্রুকে রাগান্বিত করার জন্য গোস্বাকে হজম করা। সত্য যার পক্ষ থেকে প্রকাশ হোক গ্রহণ করতে বিলম্ব না করা।

---

[১] সূরা শুয়ারা :১০৯।

❖ **শিক্ষার্থীদের ভালোবাসা ঃ** শিক্ষার্থীদের ভালোবাসা ও তাদের রুচি-সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখা, স্বীয় নফস ও নিজ সন্তানের ন্যায় তাদের প্রতি গুরুত্বারোপ করা, নিজ সন্তানের দুর্ব্যবহার ও অসদাচরণ সহ্য করার ন্যায় তাদের অসদাচরণ সহ্য করা আদর্শ শিক্ষকের বিশেষ গুণ।

ইবনে আব্বাস রা. বলেন- "আমার নিকট আমার সে শিক্ষার্থী বেশী প্রিয়, যে মানুষদের ডিঙ্গিয়ে আমার নিকট বসে, যদি আমার পক্ষে সম্ভব হত তার চেহারায় কোনো মাছি বসবে না, আমি তাই করতাম।" অপর বর্ণনায় রয়েছে: "তার উপর মাছি বসে, তাও আমাকে কষ্ট দেয়।"

মহিলা বা পুরুষ অল্প বা বেশি সময়ে হেফজ করার উপায়

যারা কুরআনের হাফেজ হতে চান তাদের জন্য চমৎকার নতুন পদ্ধতি নিম্নে দেয়া হলো-

❖ কেউ যদি প্রতিদিন একটি করে আয়াত মুখস্থ করে তাহলে পুরো কুরআন মুখস্থ করতে তার সময় লাগবে সতেরো বছর সাত মাস নয় দিন লাগবে।

❖ প্রতিদিন ২ টি আয়াত মুখস্থ করলে আট বছর ৯ মাস ১৮ দিন লাগবে।

❖ প্রতিদিন ৩টি আয়াত মুখস্থ করলে পাঁচ বছর ১০ মাস ১৩ দিন লাগবে।

❖ প্রতিদিন ৪ টি আয়াত মুখস্থ করলে চার বছর ৪ মাস ২৪ দিন লাগবে।

❖ প্রতিদিন ৫ টি আয়াত মুখস্থ করলে তিন বছর ৬ মাস ৭ দিন লাগবে।

❖ প্রতিদিন ৬টি আয়াত মুখস্থ করলে দুই বছর ১১ মাস ৪ দিন লাগবে।

❖ প্রতিদিন ৭ টি আয়াত মুখস্থ করলে দুই বছর ৬ মাস ৩ দিন লাগবে।

❖ প্রতিদিন ৮ টি আয়াত মুখস্থ করলে দুই বছর ২ মাস ১২ দিন লাগবে।

❖ প্রতিদিন ৯ টি আয়াত মুখস্থ করলে এক বছর ১১ মাস ১২ দিন লাগবে।

❖ প্রতিদিন ১০ টি আয়াত মুখস্থ করলে এক বছর ৯ মাস ৩ দিন লাগবে।

❖ প্রতিদিন ১১টি আয়াত মুখস্থ করলে এক বছর ৮ মাস ৬ দিন লাগবে।

❖ প্রতিদিন ১২ টি আয়াত মুখস্থ করলে এক বছর ৫ মাস ১৫ দিন লাগবে

❖ প্রতিদিন ১৩ টি আয়াত মুখস্থ করলে এক বছর ৪ মাস ৬ দিন লাগবে

❖ প্রতিদিন ১৪ টি আয়াত মুখস্থ করলে এক বছর ৩ মাস লাগবে।

❖ প্রতিদিন ১৫ টি আয়াত মুখস্থ করলে এক বছর ২ মাস ১ দিন লাগবে।

❖ প্রতিদিন ১৬ টি আয়াত মুখস্থ করলে এক বছর ১ মাস ৬ দিন লাগবে।

❖ প্রতিদিন ১৭ টি আয়াত মুখস্থ করলে এক বছর ১০ দিন লাগবে।

❖ প্রতিদিন ১৮ টি আয়াত মুখস্থ করলে এগারো মাস ১৯ দিন লাগবে।

❖ প্রতিদিন ১৯ টি আয়াত মুখস্থ করলে এগারো মাস ১ দিন লাগবে।

❖ প্রতিদিন ২০ টি আয়াত মুখস্থ করলে দশ মাস ৬ দিন লাগবে।

❖ প্রতিদিন ১ পৃষ্ঠা (হাফেজি কুরআন) মুখস্থ করলে এক বছর ৮ মাস ১২ দিন লাগবে।

❖ প্রতিদিন ২ পৃষ্ঠা মুখস্থ করলে ১০ মাস ৬ দিন লাগবে।

যেভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা সহজে হাফেজ বা হাফেজা হবেন

❖ প্রথম কাজ হলো তেলাওয়াত শুদ্ধ করে নেয়া। এটা একা একা পারবেন না। কোনো আলেমের থেকে শিখে নিতে হবে। যদি ছোটকালে শিখে থাকেন এবং এখনো আত্মবিশ্বাস যে আপনার তেলাওয়াত ঠিক আছে, তবে যে কোনো আলেমের কাছে দশ মিনিট বসে বলবেন "দেখেন তো আমি কুরআন দেখে দেখে পড়ছি। আমার পড়া ঠিক আছে কিনা?" যদি বলে ঠিক আছে, তবে হলো।

❖ অনেকে ধারণা করে মুখস্ত করার জন্য দ্রুত বার বার পড়তে হয়। এটা ভুল। খুব শুদ্ধভাবে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে একটা একটা শব্দ পড়তে হবে। একটা শব্দকেই কয়েকবার যতক্ষণ না সেটা শেখা হচ্ছে। এর পর পরের শব্দ। দ্রুত না। বরং শুদ্ধ করে ধীরে তেলাওয়াতের মত।

❖ আপনার সময়ের নব্বই% সময় যাবে পূর্বের মুখস্ত রিভিউ করতে। দশ% সময় নতুন মুখস্ত করার জন্য। এটাই স্বাভাবিক।

❖ মুখস্ত করার সবচেয়ে উত্তম সময় ফজরের পূর্বে। কারো মতে মাগরিবের পরে। তবে মাগরিবের পরে শিক্ষার্থীরা ছাড়া বাকি সবাই ব্যস্ত থাকে। কমপক্ষে ত্রিশ মিনিট পড়লেও আগাতে পারবে। এটা নতুন মুখস্ত করার জন্য।

❖ রিভিউ যখনই সময় পান করতে হবে। জ্যামে আটকিয়ে আছেন? অপেক্ষা করছেন? এই সময়েও রিভিউ করতে পারেন।

❖ প্রতি রাতে তাহাজ্জুদের সময় যতটুকু আপনার আগে মুখস্ত আছে সেখান থেকে এক পারা করে পড়তে হবে। এটা একটা ভিত্তির মত যেটা করলে আপনি আর পূর্বের মুখস্ত ভুলবেন না ইনশাল্লাহ।

❖ প্রথম ৫ পারা মূখস্ত করা একটু কষ্টকর হবে। কিন্তু এটা হয়ে গেলে বাকিটা সহজ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ।

❖ মুখস্ত করার সময় কেউ প্রথম সূরা বাকারা থেকে আরম্ভ করে। কেউ শেষ থেকে একটা একটা সুরা মুখস্ত করে প্রথম দিকে আসতে থাকে। অনেক মাদরাসায় শেষ ৫ পারা মুখস্ত করে এর পর প্রথম থেকে আরম্ভ করে। যেটা আপনার ভালো মনে হয়।

❖ আপনি কুরআন শরীফের যে কপি থেকে মুখস্ত করবেন সারা জীবন ঐ জায়গা পড়ার সময়ে ঐ বইয়ের পৃষ্ঠাগুলো আপনার চোখে ভাসবে। তাই একটা ভালো কপি থেকে মুখস্ত করতে হবে।

হাফেজি কুরআন হয় বিশ পৃষ্ঠায় প্রতি পারা। এরকম একটা কুরআন শরীফের কপি জোগাড় করতে হবে। যত হাফেজ আছে কেউ আয়াতের নম্বর না বলতে পারলেও ঐ পৃষ্ঠা আরম্ভ হয়েছে এই আয়াত থেকে এটা বলতে পারবেন। এটা চোখে ভাসবে। এর জন্য বাংলাদেশে প্রচলিত হলো নূরানী হাফেজী কুরআন।

মহিলা ও পুরুষ হেফজখানার শিক্ষাথীদের শাস্তির বিধান

ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষকবা শিক্ষিকাদের নিকট আমানত। তারা শিক্ষার্থীদের ভদ্র আচরণ, ইলম ও আখলাক শেখাবেন, একান্ত প্রয়োজন হলে উত্তম-মাধ্যম করবেন। এটাই হানাফি, মালিকি, শাফেয়ী ও হাম্বলি ফকিহদের অভিমত।

কারণ নবীজী বলেন- "তোমরা সবাই দায়িত্বশীল, সবাইকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।"

অপর হাদীসে তিনি বলেন- "আল্লাহ্ কোনো বান্দাকে যখন কোনো দায়িত্ব প্রদান করেন, কম হোক বা বেশী হোক, তিনি অবশ্যই তাকে কেয়ামতের দিন সে দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন, সে কি তাদের (অধীনদের) মাঝে আল্লাহর বিধান কায়েম করেছে, না বিনষ্ট করেছে? অবশেষে তার পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে বিশেষভাবে।"

এ হাদীস বলে শিক্ষক বা শিক্ষিকা ও অভিভাবক সবাই দায়িত্বশীল। শিক্ষার্থী বা পরিবারের কোনো সদস্য অবাধ্য হলে প্রথমত মারধর ব্যতীত শোধরানোর অন্যান্য পদ্ধতি গ্রহণ করুন। তাদের সাথে নম্র আচরণ করুন, পর্যায়ক্রমে সহজ থেকে কঠোর হোন।

শাস্তির বিধান সম্পর্কে সৌদি আরবের ফতোয়া বোর্ডের ফতোয়া

শিক্ষার্থীকে প্রহার করা প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের উত্তরে সৌদি আরবের ফতোয়া বোর্ডের প্রধান মুফতি বলেন- "আবু বকর রা. তার এক গোলামকে উট হারানোর কারণে মারধর করেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কিছু বলেননি। শিক্ষক-শিক্ষিকা মনে রাখবেন, মারধর শিক্ষা দান করার এক উপকরণ ও শিক্ষার্থীর বক্রতা সোজা করার এক বৈধপন্থা, ক্রোধ ধমন কিংবা প্রতিশোধ গ্রহণ করা তার উদ্দেশ্যে মারধর করা বৈধ নয়। তাই একান্ত প্রয়োজনে প্রহার করার সময় লক্ষ্য রাখুন যেন ক্ষতি না হয়, শরীরে দাগ না কাটে, হাড্ডি না ভাঙ্গে, অঙ্গহানি না হয় ও ক্ষতের সৃষ্টি না হয়, কারণ নবীজী বলেন-

لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِيْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ

"আল্লাহর হদ ব্যতীত দশটি বেত্রাঘাতের বেশী আঘাত করা যাবে না।"

নবীজী বলেন, "সাত বছর হলে তোমরা তোমাদের সন্তানদের সালাতের নির্দেশ কর এবং দশ বছর হলে তার জন্য প্রহার কর।"

শিক্ষার্থীকে প্রহার করার কয়েকটি শর্ত

❖ পড়া-শুনায় অবহেলা কিংবা অসংলগ্ন আচরণের জন্য শিক্ষক বা শিক্ষিকা প্রথমধাপে শিক্ষার্থীকে প্রহার করবেন না, বরং প্রহার করার পূর্বের ধাপগুলো অনুসরণ করুন। ভুলগুলো স্মরণ করে দিন, বোঝান ও সংশোধন করুন, এতে কাজ না হলে কঠোর ভাষা প্রয়োগ করুন, কিন্তু গালমন্দ ও খারাপ শব্দ প্রয়োগ করবেন না। মুকাদ্দামাহ ইবনে খালদুনে বর্ণিত আছে, বাদশাহ হারুনুর রশিদ স্বীয় সন্তানের শিক্ষক মুহাম্মদ আমীনকে ওসিয়ত করেন, "প্রতিটা মুহূর্ত আপনি তাকে উপকৃত করার চেষ্টা করুন, তবে তাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করবেন না, তাহলে তার ব্রেন মেরে ফেলবেন। আর তাকে অধিক ছাড় দিবেন না, তাহলে সে অলসতাকে বেছে নিবে ও সময়ের অপব্যবহার করবে, যথাসম্ভব তাকে কাছে টেনে ও তার সাথে নম্র আচরণ করে তাকে সঠিক পথে রাখার চেষ্টা করুন, যদি সে এতে শুধরাতে না চায় তাহলে কঠোর হোন ও কঠোরতা করুন।"

❖ প্রহার করার জন্য শিক্ষার্থীর মাঝে আদব ও শিক্ষা কি জিনিস বোঝার জ্ঞান থাকা জরুরি, যারা বুঝে না তাদের মারধর করা বৈধ নয়। শিক্ষার্থীর বয়স ও অপরাধ উভয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে শাস্তি প্রদান করা চাই, যেন

কোনো ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন না হয়। ইবনে হাজেব রহ. শিক্ষক বা শিক্ষিকা সম্পর্কে বলেন, "যে সব শিক্ষার্থীরা শরয়ী কারণ ব্যতীত স্বীয় দায়িত্বে অবহেলা করে, তাদের কারো জন্য শুধু চেহারার বিরক্তি প্রকাশ করা যথেষ্ট, কারো জন্য শক্ত কথা ও ধমকের প্রয়োজন হয়, আবার কাউকে প্রহার করা জরুরি হয়, প্রত্যেকের সাথে তাদের অবস্থা বুঝে ব্যবহার করা উচিত।"

❖ গোস্বার সময় প্রহার না করা, কারণ তখন প্রহার করার উদ্দেশ্য সংশোধন না হয়ে গোস্বা নিবারণ করা হতে পারে।

❖ প্রহার করার সময় প্রহারের প্রকৃতি, পরিমাণ ও জায়গা ঠিক থাকা চাই। প্রকৃতি ঠিক থাকার অর্থ হালকা ও মৃদু প্রহার করা, পরিমাণ ঠিক থাকার অর্থ তিন বারের অধিক আঘাত না করা, জায়গা ঠিক থাকার অর্থ যেসব স্থানে প্রহার করা বৈধ নয় সেখানে প্রহার না করা। যেমন ঃ চেহারা, মাথা, বুক, পেট ও স্পর্শকাতর অঙ্গ।

নবীজী বলেছেন- إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ "যখন তোমাদের কেউ আঘাত করে সে যেন চেহারায় আঘাত না করে।"

কখনো পরিবেশের কারণে শাস্তির ধরণ বিভিন্ন হয়, যেমন কোথাও কান ধরে দাঁড় করানো দোষণীয়, আবার কোথাও দোষণীয় নয়। তাই শাস্তি দেয়ার প্রয়োজন হলে অবশ্যই স্থানকাল পাত্র বিবেচনা করে রুচি সম্মত শাস্তি প্রদান করুন। প্রয়োজনে সহকর্মী, পরিচালক ও অন্যান্যদের সাথে শিক্ষার্থীর অপরাধ ও শিক্ষক বা শিক্ষিকার করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করুন।

হাফেজ ক্বারী আব্দুল হক-এর শিক্ষক বা শিক্ষিকাদের জন্য কয়েক উপদেশ

❖ শিক্ষার্থীদের চেহারা, কান, মাথা ও স্পর্শকাতর কোনো অঙ্গে বেত্রাঘাত করবেন না।

❖ সবক ও সবকের পারা একজন একজন করে শুনবেন। সাতসবক ও আমূখতা প্রয়োজনে একাধিকজনের একত্রে শুনতে পারেন।

❖ সবকের পারা শোনানোর জন্য নতুন সবক বন্ধ রাখবেন না। প্রয়োজনে সর্বোচ্চ একদিন বন্ধ রাখতে পারেন।

❖ ছাত্রদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখবেন না। দেখতে সুন্দর এমন ছাত্রদের থেকে দৃষ্টি হেফাজত করবেন এবং কোনো কু-খেয়াল মনে আসবেন না।

❖ রাগান্বিত অবস্থায় শাস্তি দেবেন না। শিক্ষার্থীকে শাস্তির উপযুক্ত হতে দেবেন না। বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে কর্তৃপক্ষকে জানাবেন।

❖ শিক্ষার্থীর সাথে উত্তম ভাষায় কথা বলবেন। গালিগালাজ পর্যায়ের কোনো শব্দ ব্যবহার করবেন না।

❖ শিক্ষার্থী দ্বারা কোনো ধরনের শারীরিক খেদমত নিবেন না।

❖ বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া ক্লাস চলাকালীন অবস্থায় মোবাইল ব্যবহার করবেন না।

❖ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া শিক্ষক বা শিক্ষিকার মোবাইল থেকে কোনো শিক্ষার্থীকে ফোন করার সুযোগ দিবেন না।

❖ শিক্ষার্থীর অভিভাবকের সাথে আচার ব্যবহার ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে হুশিয়ার থাকবেন। ব্যক্তিগত আদান প্রদান থেকে বিরত থাকবেন।

❖ সুন্নতের পাবন্দি করবেন। শ্রেণিকক্ষের উপযুক্ত পোশাক পরিধান করবেন। শিক্ষার্থীদের তরবিয়তের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিবেন।

❖ ঘুম, গোসল, খানা, নামাজের সময় ও আছরের পরের সময়ে শিক্ষার্থীকে শিক্ষক বা শিক্ষিকার অধিনে রাখবেন।

❖ প্রাতিষ্ঠানিক আইন-কানুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবেন।

❖ সব ধরনের লেনদেন পরিচ্ছন্ন রাখবেন।

❖ শিক্ষার্থীর সকল পড়া শিক্ষক বা শিক্ষিকাই শুনবেন। শিক্ষার্থী দিয়ে শিক্ষার্থীর পড়া শোনাবেন না।

হাফেজ ক্বারী আব্দুল হক-এর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কয়েকটি উপদেশ

❖ দৈনিক যতটুকু মুখস্থ করার ইচ্ছা প্রথমে ততটুকু কমপক্ষে আধা ঘন্টা তেলাওয়াত করবে। এবং কাউকে তা দেখে পড়ে শোনাবে, যাকে নাযারা বলা হয়।

❖ নাযেরার পর ঐ পৃষ্ঠা মাগরিবের পর ভালো ভাবে মুখস্থ করবে।

❖ **মুখস্থ করার নিয়ম ঃ** ভালো কোনো ছাত্রের কাছে বসে গল্পগুজব না করে একটি আয়াত আট বার দেখে পড়বে যেমন- ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ এরপর একটি বার না দেখে একবার দেখে, দশবার হলো এইভাবে আধা পৃষ্ঠা হওয়ার পর দেখবে পার কি না। যদি না পার তাহলে ঐ আধা পৃষ্ঠা ৬ বার পড়বে। এইভাবে পূর্ণ পৃষ্ঠা মুখস্থ করবে।

❖ ক্লাস ছুটির পর পিছনের পড়া শুরু করে দিবে, এমন ভাবে পড়বে যাতে প্রত্যেক পারা প্রতিদিন দুই বা এক বার পড়া হয়।

❖ সবক প্রতিদিন ফজরের পূর্বে শোনাবে, যদি প্রতিদিন তেলাওয়াত করা হয়, তাহলে প্রতিদিন আমুখতা শুনাতে আরাম পাবে, মুখস্থ থাকবে। পূর্বের পড়া কাঁচা রেখে সবক দিবে না।

❖ বাজে, বেফায়দা, ফাজলামি কথাবার্তা বলা থেকে সর্বদা বেঁচে থাকবে, সর্বদা তেলাওয়াত করার আপ্রাণ চেষ্টা করবে। আছরের পর সময়টা কাজে লাগাতে হবে। আছরের পর তিন বা চার পারা পড়বে।

❖ শবিনার দিন যে ভুল গুলো হবে কমপক্ষে বিশ বার জপতে হবে।

❖ প্রতিদিন ঘুমানোর আগে এক পারা দিয়ে চার রাকাত নফল নামাজ পড়বে।

❖ প্রতিদিন সবক কোন ভালো ছাত্রকে শুনানোর পর হুজুরকে শোনাবে।

❖ এক আয়াত মুখস্থ না হওয়া পর্যন্ত অন্য আয়াতে যাবে না। যদি মুখস্থ না হওয়ার আগে অন্য আয়াতে যাও তাহলে মুখস্থ কাঁচা হবে। পরে সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে।

❖ কারো সাথে কোন রকম বন্ধুত্বে জড়াবে না এবং শত্রুতাও সৃষ্টি হতে দেবে না।

❖ যতটা কম পারা যায় বাসার যাবার চেষ্টা করবে। একেবারে না যেতে পারলে খুবই ভালো। কারণ এতে মেধা পরিষ্কার থাকবে।

❖ মোবাইল জিনিসটা নিজের জন্যে হারাম মনে করবে।

❖ হেফয শেষ করার পর কোনো বছরই যেন তারাবি পড়ান থেকে মাহরুম না হও সে খেয়াল রাখবে এবং তারাবি পড়িয়ে টাকা নেবে না।

আল্লাহ তা'য়ালা উক্ত গ্রন্থটি পড়ে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

এ গ্রন্থে তিনটি অংশ আছে-

❖ যোগ্য আলেমা হওয়ার সহজ উপায়

❖ যোগ্য নারী হওয়ার সহজ উপায়

❖ যোগ্য হাফেযা ও হাফেয হওয়ার সহজ উপায়

সকলের মনের চাহিদা পূরণের লক্ষে বহু গ্রন্থ থেকে কয়েকটি গ্রন্থ।

প্রকাশনায়

আল-মুয্যাম্মিল লাইব্রেরী

ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

01813-172768, 01788-323592